অবগাহন

অবগাহন

ঘনশ্যাম চৌধুরী

বুক সোসাইটি
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশিকা : শ্রীশঙ্করী দেবী
১৭২।৩৪ লোয়ার সারকুলার রোড
কলকাতা-১৪

মুদ্রাকর : শ্রীসুলভকুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি-১২, নিউ সি. আই. টি রোড
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥'

—'প্রিয় জিনিস পেয়ে আনন্দ করা যেমন উচিৎ নয়,
আবার অপ্রিয়টা পেয়ে ক্ষুব্ধ হওয়াও উচিৎ নয়।
যিনি স্থিরবুদ্ধি, যাঁর মোহ নেই,
নিজ ধীশক্তিতে তিনি ব্রহ্মে স্থিত থাকেন।'

—*শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা*

সিঁদুর-মাখা আকাশ আর এমন দিলদরিয়া সমুদ্র বোধিসত্ত্বের স্মৃতির দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিলো বারবার। সমুদ্র এখন চোখের সামনে। আর চোখ বুজলেই সেই নদী। যে নদীর নাম ভাগীরথী। কান পাতলে যার ছলাৎ ছলাৎ ছোট ছোট ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। ওদের ঘাট থেকে নদী সোজা আরো পুবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আরো অনেকটা দূরে ভাগীরথী যেন এক অনিবার্য স্বাভাবিক নিয়মে আকাশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। ছোটবেলায় এমনই মনে হতো বোধিসত্ত্বর। এই মনে হওয়াটা বড় হয়েও কি কেটেছে? বলা মুশকিল। বর্ষায় পাড়ভাঙার শব্দ তাঁর বুকের পাঁজরায় গিয়ে ধরাস ধরাস শব্দে আছড়ে পড়তো। বুকের মধ্যে জেগে থাকতো একরাশ শূন্যতা। হাহাকার। এই পৃথিবী, এই বাসস্থান এমনি করে ভেঙে যাচ্ছে! হায় রে! কেউ রুখে দিতে পারলো না ধ্বংসকে। অনেক বাড়ি-ঘর, আম-কাঁঠালের বাগান, শাল-সেগুনের গাছ,—নদী এভাবেই নিয়ে চলে গেলো সব। ওদের চোখের সামনে সর্বক্ষণ শুধু শব্দই জেগে থাকতো। বর্ষার সেই সমূহ গর্জন এখনো পর্যন্ত বোধিসত্ত্বের কানে একনাগারে বাজতেই থাকে। তারপর একটা দিনের শেষ হয়ে যায়। শেষ হয় বছর। ঝোড়ো সময়ের বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী নামে এক যুবকের জন্ম হলো।

'কত মানুষ! জানা অজানা হাজার মানুষকে দেখতে দেখতে এই পর্যন্ত পৌঁছোলাম।' প্লটিনাস বলেছিলেন, 'জীবনের নানা অভিশাপের মধ্যেও সত্যকার যে মানুষ, আর তাঁর বোধির জগৎ কোন শোক বা অনুশোচনা করে না। তবে বাইরের মানুষের ছায়াগুলো অবশ্য এই দুনিয়ার খোলা মঞ্চে অভিনয় করতেই থাকে।' আজকে সীমাহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব খুলে দিয়েছে পেছনের দরজা। পুরনো কথা, পুরনো গান, স্মৃতির এমন অজস্র ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে স্বগত উচ্চারণ করে ; আগামীতে যত প্লাবনই আসুক। এসব মুছে যাবে না মন থেকে। বরং বলা যায়, জমতে থাকবে স্মৃতির পলিমাটি। এ বাঁশির সুর তো রোজই নিঃশব্দে বেজে ওঠে। একাই। কাউকে জানান না দিয়ে, যন্ত্রণা ভাঙতে ভাঙতে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, এই রকম যন্ত্রণায়

এক তীব্র সুখ আছে। আছে বিষণ্ণতাও। তাঁর সত্তার গভীরে তখন তোলপাড় ঢেউ। তাঁর অন্তরকথন বুঝি বা শোনা যায় ; 'সেই সুখ থেকে বিষণ্ণতার দুঃখকে আমি যে কিছুতেই আলাদা করতে পারি না।'

পৌষের সংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে আজকে লক্ষ মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঢেউগুলোকে তটে ভেঙে পড়তে দেখে বোধিসত্ত্বর মনে বারবারই ঘুরেফিরে আসছিলো তাঁর গ্রাম। সেই বর্ষা, আর সর্বনাশী ভাগীরথীর কথা।

এখন সকাল। মোহনায় তীর্থযাত্রীর শরীরে প্রথম রোদ্দুরের রাতুল বিভা। সূর্য এখন তটভূমির বালি আর নোনাজলে পিচকিরি দিয়ে যেন রঙ ঢালছে। লাল রঙ। মানুষ আর মানুষই শুধু সাগরসঙ্গমে। লক্ষ মানুষের প্রতিটি কথার মিলিত শব্দ, দোকান পশরার হৈ হৈ, সাধু-সন্ন্যাসী আর লাউড স্পিকারের চিৎকারের সম্মিলিত গর্জনের সঙ্গে সমুদ্রগর্জন মিলেমিশে গেছে। এরই মাঝখানে বালিতটে পা রেখে বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী দাঁড়িয়েছিলো সম্পূর্ণ একাকী। বটগাছের মতো। সকালের সূর্যকে সামনে রেখে বোধিসত্ত্ব সমুদ্রেব বিরাটত্ব আর সীমাহীনতার পাশাপাশি অযুত মানুষের বিশালতাকে প্রাণভরে দেখছিলো। দূরে সমুদ্রে দেখা যাচ্ছিলো একটা বাতিঘর।

আজই পৌলমীর সঙ্গে বোধিসত্ত্বর দেখা হলো। রক্তিম আকাশ যখন সাগরজলের সঙ্গে মেশে, বালিতটে তখন বেজে ওঠে নীরব সঙ্গীত। সে গান তো শোনা যায় না! সে তো অনুভবের ব্যাপার। তখনই পৌলমী নামক নারীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়, যখন চোখের দেখা আর মনের রিমঝিম বাজনার সঙ্গে পারিপার্শ্ব এসে মেশে। কপিল মুনির আশ্রমের সামনে নোনাজলে পা ছুঁইয়ে সে হাঁটছিলো। ওঁর শাড়ির নীল আঁচল উড়ছিলো। শরীরে জড়ানো গোলাপী শাড়িতে ভোরের সূর্যের লাল আগুন লেগেছে। অহঙ্কারী তখন তাঁর দুই পাহাড় চূড়ো। সেই সুন্দরী নিজের সম্পূর্ণতায় রানীর মতো হাঁটছিলো তখন। বোধিসত্ত্ব দেখলো, তাঁর কপালে সিঁদুর। বোধিসত্ত্বের অন্তর জুড়ে তখন গোবিন্দদাস-- 'পীন পয়োধর জঘন গুরুতর/ভাবে গতি অতি মন্দ/ আরতি অন্তর পন্থ দূরতর/বিহিক বিরচন নিন্দ/ গড়ল মনোরথে চলল সুন্দরী/ বিঘন বিপদ না মান। মিলল ভামিনী কুঞ্জধামিনী/দাস গোবিন্দ ভাণ।।' এ দেখার মহিমাই আলাদা!

ফের দেখা হলো খানিক পরেই। ডাইনিংরুমে, খাওয়ার সময়। সারা ঘর জুড়েই শুধু সে। সপ্রতিভ মহিলা। স্বামীর সঙ্গে খেতে বসেছেন। বোঝা গেল, সুন্দর কথা বলতে পারেন। স্বামীটিকে বকা-ঝকা করে খাওয়াচ্ছেন।

আর দু'পিস টোস্ট নাও। কলাটা রেখে দিলে কেন?

আর খেতে পারবো না।

কিছু ফেলে ওঠা চলবে না। এটা খেয়ে নাও। তারপর কফি।

স্ত্রীর চাপে পড়েই যেন সবই খেয়ে নিলেন স্বামীটি। এবার উঠে পড়লেন। বড্ড ব্যস্ত মানুষ। রুমালে মুখ মুছতে মুছতেই বললেন, পৌলমী, আমি যাচ্ছি। আজ একটু দেরি হয়ে গেল।

ঠিক আছে। কিছু হবে না এর জন্যে।

না না! কালকেই দেখ না, তিনটে সিরিয়াস পেশেন্ট এসে গেলো!

ডাক্তারের কাছে রুগী আসবেই। মরুভূমিতে বসে থাকলেও আসবে।

তা আসবে। আমি চল্লাম। মেলা দেখার ইচ্ছে হলে বেরিয়ো। বাঁচের দিকে গেলে বেশি দূরে যেও না। এই বলেই ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

... তা'হলে তাঁর নাম পৌলমী। বোধিসত্ত্ব ভাবছিলো। এমন ঝকঝকে সুন্দরী মহিলা কলকাতার রাস্তায় তো সে আকছারই দেখে। কই? দাগ কাটে না তো মনে! কিন্তু কোনো কোনো নারী কবিতার জন্ম দিতে পারে। সুর আর ছন্দ পাশাপাশি এসে যায় কখনো। 'আসলে আমি কি চাই, তা কি আমি নিজেই জানি? কোনো প্রেমের কি জন্ম হয়? না কি তা সবসময়ই আছে? অথবা প্রেম অহরহ পাল্টে যায় কি? কবিতা আমার যন্ত্রণার ...'

আরে! আপনি খাচ্ছেন না! —চমক ভাঙলো বোধিসত্ত্বের। আসলে এইরকমই হয় ওঁর। কখন, কোথায় ডুবতে ডুবতে হারিয়ে যায় সে, নিজেই দিশে পায় না। একতারার তার ছেঁড়ে কখনো, বাজতেও থাকে আবার।

কি? খাবার দাবার তো টেবিলে। কিন্তু মনটা অন্য দিকে। দেখছি, খাবারটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বেশ মমতা-মাখা কণ্ঠস্বর। বোধিসত্ত্ব দেখলো, মহিলার ব্রেকফাস্ট সারা। উঠে তাঁর টেবিলের দিকেই আসছেন। ফের তাঁর স্বতগস্বরে গোবিন্দদাস—'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী/অবনী বহিয়া যায়।'.....

নিশ্চয়ই পুণ্যি করতে আসা হয়নি?

বোধিসত্ত্ব স্যাণ্ডুইচে কামড় দিলো এতক্ষণে। সেই নারী তারই টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবার। নীরবতা ভেঙে বোধিসত্ত্ব কথা বললো।

সাগরে স্নান তো করছিই। পুণ্যি নিয়ে তেমন কিছু ভাবিনি। মনে পড়েনি।

তা তো দেখলেই মনে হচ্ছে।

বাঃ। দেখেই বুঝে নিলেন। স্বীকার করতেই হয়, দূরদৃষ্টি আছে!

এর জন্যে দূরদৃষ্টি লাগে না। যে কেউ বলতে পারে। কি ভাবছিলেন এতো?

আমার ভাবাভাবির কোন বিষয় নেই। ভাবাভাবির কোন কারণও নেই, নেই কোন শেষ। থামিয়ে দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।'

শুনে পৌলমী হাসলো। গালে টোল পড়লো। ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে'....।

টোল পড়লো বোধিসত্ত্বর মনে।

নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে এসেছেন?

এটাও দেখেই বোঝা গেলো?

নিশ্চয়ই!

আপনিও যে পুণ্যি করতে এসেছেন, এমন মনে হচ্ছে না।

বোধিসত্ত্বর ইচ্ছে হচ্ছিলো, ওঁর প্রতিটি কথা নিয়ে জোর তর্ক শুরু করে দেবার। কিন্তু প্রতিপক্ষ কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করলো আগে থেকেই।

বয়ে গেছে পুণ্যি করতে! উনি এসেছেন সরকারি কাজে। মেডিকেল টিম নিয়ে। এই ক'দিন রাজ্যের মানুষের ডাক্তারি করবেন। আমাকে নিয়ে ঘোরার সময় কই? পুণ্যি করা তো দূর অস্ত! বেড়ানো? সেও মাটি।

তবুও দু'জনে সাগরমেলায় এসেছেন। খারাপ কি? ভালোই তো!

বিয়ের পর থেকেই বন্দী হয়ে আছি। নেহাৎ জোর করেই বেরোলাম। কত্তাটির মোটেও ইচ্ছে ছিলো না। ছেলেদের সুবিধে কতো! দিব্যি তো আপনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। আর ভেবে যাচ্ছেন। আবার কি যে ভাবেন তাও নাকি জানেন না! যতই বলা হোক না কেন, শহরের মেয়েরা, শিক্ষিত মেয়েরা নাকি অ্যাডভান্স, স্বাধীন। কচু! সংসারের খাঁচায় কয়েদীর মতো থাকি আমরা।

বোধিসত্ত্ব মুচকি হেসে বললো, আরে, বাংলার বধূরা তো সংসারকে জগৎসংসার বানিয়ে একেবারে জগজ্জননী হয়ে যায়।

বাঃ বাঃ! পুণ্যি করতে না এলে কি হবে, মেলার ছোঁয়া তো ভালোই লেগেছে! একেবারে গুরুদেব টাইপ কথা। লাগিয়ে দিন গুরুগিরি ব্যবসা। দারুণ চলবে!

কথাটা শুনে বোধিসত্ত্ব জড়তার খোলস থেকে বেরিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো। পৌলমী তখনো কথা বলছে।

এ-সব কথা হলো রক্ষণশীল মানুষদের একটু মাজা-ঘষা আপ্তবাক্য। যেমন সতীকে স্বামীর চিতায় তোলার আগে বলা হতো, স্বর্গে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গসুখ ভোগ করবে। এইরকম আর কি!

বাঃ! আপনি তো দেখছি স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে বেশ ভাবনাচিন্তা করেন!

হ্যাঁ। ভাবনাটা উটকো নয়। নিজের অবস্থা থেকেই ভাবনা আসে। আমি তো বলতে পারি না, কি ভাবি, তা জানি না, বুঝিও না। যা ভাবি, সেটা জেনে বুঝেই ভাবি।

তাঁর জড়তাবিহীন কথা আর সহজ ভঙ্গি বোধিসত্ত্বর ভালোই লাগছিলো। সে নিজে বড় অন্তর্মুখী। লাজুকও বটে। আসলে সে কথা খুঁজে পায় না সর্বত্র। তাঁর সব কথা কবিতা হয়ে যেতে চায়। সে তো সবখানে বলা যায় না! তা'হলে লোকে পাগল ভাববে। সে সব কথা বড়জোর লিখে রাখা চলে। এখন পৌলমীর প্রাণখোলা কথায়

বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী নিজেকে খানিকটা তবু মেলে ধরতে পারলো। একটা পাখি গাছের ডালে, সবুজ পাতার আড়ালে ছিলো চুপচাপ। উড়তে অথবা ওড়ার চেষ্টা করতেও যখন নাম না জানা এক বিষণ্ণতা তাঁকে আঁকড়ে ধরে জড়তা এনে দেয়, তখন এ-যেন একেবারে নীল আকাশের হাতছানি।

আরে! আবার কি ভাবছেন? এ লোকটা তো আচ্ছা—

না না। আপনি বেশ মিশুকে। তাই—

ও মা গো! এর জন্যে কি উদাস চোখ করে ভেবে যেতে হবে না কি। নির্ঘাত পাগল। যাকগে! তবু তো একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেলো! মিশতে টিশতে পারি।

উজান ঢেউয়ের শীর্ষবিন্দুতে যখন শুধুই সামুদ্রিক ফেনার আচ্ছাদন আসে আর যায়, বোধিসত্ত্বর মন তখন আশ্বিনের মেঘ হয়ে ভেসে যাচ্ছিলো তীরভূমি থেকে আরো অনেক দূরে। মনের পাখায় তাঁর দুপুর রোদের সাদা চিকচিকে আলো। সে বিনীত স্পর্ধায় নিবেদন করে, হে আমার হারানো নদী! আমার যন্ত্রণার ভালো লাগা, উন্নাসিকতা নয়, অববাহিকায় ভেসে ওঠো। জলখণ্ডে। ডাঙা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুমি যেমন বলে যাও, আমি এসেছি হিমবাহ থেকে। যাবো সাগরে। যাবার পথে তোমাদের দিয়ে যাবো কল্লোলিত জলধারা, আর্দ্র বাতাস আর সর্বনাশের ভাঙন। 'আমিও কিছু দেবো।' বোধিসত্ত্বর অনুভূতিতে তীর্থযাত্রীর অবগাহনে পরিচ্ছন্ন সাগরদ্বীপ। যেন বৃষ্টিজলে ধোওয়া সবুজ পৃথিবী। কল্পতরুর মতো সেও যেন প্রার্থীদের জন্যে দরাজহস্ত হতে চায়। বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী এবার ঝাঁপ দিলো সাগরমেলার সেই জনসমুদ্রে।

সামান্য ক'দিনের আয়োজন। তবুও বিরাট এক সংসার। বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্র তাঁদের চলন বলন। হাজার মাইল দূর থেকে কিংবা ঘরের কাছ থেকে— সবাই এসেছে পুণ্যের টানে। বৃদ্ধ, যুবা, সব বয়সেরই দম্পতি, এমনকি চলচ্ছক্তিহীন মানুষও এসেছেন পাপস্খালনের আশায়। কিসের পাপ? বোধিসত্ত্ব বুঝে পায় না। তবুও লোকগুলোর কোন কষ্টবোধ নেই। প্রাণের তাগিদে সবাই পাগল। সে এটা বোঝে, মানুষের কিছু সহজাত তাগিদ আছে। নেতা হবার ইচ্ছে আছে কারোর, অথবা কেউ ধনী হতে চায়, বা কেউ হতে চায় কবি। এই হতে চাওয়ার জন্য জগৎসংসারটাও দিব্যি চলতেই থাকে।

তবে অলস পরগাছা মানুষও কিলবিল করছে এই মেলায়। অজস্র! বকধার্মিক এই সব মানুষ কেউ বা গেরুয়া পরে, কেউ বা পরে কৌপিন। এরা 'বোম্ বোলে' কিংবা 'মা-মা' বলে পিলে চমকানো শব্দে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন ভোলানো কথা বলে এরা সরল সোজা মানুষের কাছ থেকে টু পাইস কামিয়ে নেয়। এও তো এক জীবন! সমাজে অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে এঁদের বেঁচে থাকা। বোধিসত্ত্ব ভাবে. 'এ এক প্রাণের ছদ্মবেশ।'

খালের ওপর কাঠের সেতু পেরিয়ে বোধিসত্ত্ব পাকা রাস্তা ধরে হাঁটছিলো। কত মানুষের কত কথা আর সমুদ্রের নিরন্তর শব্দোচ্চারণে শোনা যাচ্ছে এক অদ্ভুত ঐকতান। এত মানুষ আছে এই দেশে! সে ভাবছিলো, 'এই স্রোতের কতটুকু আমি নিতে পারবো? প্রত্যেকটা মানুষই এক একটা কাহিনী। প্রতি পরিবারই এক একটি ইতিহাস। চলে যাওয়া সময়ের সাক্ষী সাবুদ তো এঁদের সবার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে!

'এগারোবার এলাম সাগরে.......'

কথাটা শুনে সেদিকে তাকালো বোধিসত্ত্ব। ধুতি পাঞ্জাবি পরা একটা লোক। সাধারণ চেহারা। দেখে মনে হচ্ছে স্বচ্ছল জীবন। একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। বোধিসত্ত্বর কানে আসছিলো তাঁদের কথাবার্তার টুকরো-ছিন্ন অংশ।

বুঝলে বাবা, আমার বউ আজ বারো বছর ধরে বিছানায়। হাঁটতে পারে না। অনেক ডাক্তার দেখালাম। বহু পয়সা ঢেলেছি। রোগ সারেনি। একটা ছেলেপুলেও আজ আমার বেঁচে নেই। কঠিন কঠিন অসুখ এসে আমার তিন ছেলেমেয়েকে কেড়ে নিয়েছে।

তাদের অসুখও ডাক্তার সারাতে পারলো না?

না বাবা। পারেনি। কেন যে আমার জীবনটা এমন হলো, এর কোনো ব্যাখ্যাই আমি পাই না। বউ বিছানায় ছটফট করে। আমি কষ্টে মরে যাই। বছর ফুরোলে চলে আসি সাগরে। এত মানুষের সঙ্গ পেয়ে একটু শান্তি পাই। যার জীবনে আনন্দ নেই, এটুকুই তাঁর সুখ। আজ আমার এই বয়েসে এসে কারুর কাছে কিছুই চাইবার নেই। নিবেদন তাঁর কাছে এটুকুই, হে ঠাকুর! ওঁকেও তোমার কাছে টেনে নাও। তাঁর কষ্ট যে আমি সইতে পারি না। ...বারো বছর ধরে স্ত্রী অসুস্থ। কত বয়স হবে এঁর? — পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন! ...বোধিসত্ত্বর ভাবনা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। ... পত্নীর প্রতি অগাধ ভালোবাসায় আগলে রেখেছেন তাঁকে। ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর যন্ত্রণাকে। পৃথিবীতে এখনও মানুষ আছে। সব শেষ হয়ে যায়নি। ..... বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়ে ওঁরা এগিয়ে গেলেন। আরো শ্লথ হয়ে গেল তাঁর গতি। সে দেখলো, সামনে একগাদা মানুষের জটলা।

একটা লাল চাঁদোয়ার নিচে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে ঘিরে বেশ কিছু মানুষ বসে আছে। সকলেই ভিন্ রাজ্যের। বেশিরভাগই মহিলা। মেয়েদের নাকের বড় বড় নথগুলো ঝুলে পড়েছে। ওদের পরণে লাল ঘাঘড়া। তার ওপর কাঁচুলির বেড়। সবার চোখেমুখেই ভক্তি উপছে পড়ছে। সাধুর পরনে গেরুয়া-ছোপানো আলখাল্লা। কপালে মস্ত বড়ো সিঁদুরের টিপ। ডান হাতে বালা। সামনে ছোট জলচৌকির ওপর খোলা একটা বই। সাধু পড়ছেন। মাঝে মাঝে পড়া থামিয়ে শ্রোতাদের একনজর দেখে নিচ্ছেন। বোধিসত্ত্ব দাঁড়িয়ে পড়লো সেই সামিয়ানার নিচে। সাধু পড়ছিলেন—

...শুনোরে সজনো! সাভি কো অন্তরমে ব্রম্ভ (ব্রহ্ম) হ্যায়। কোঈ ভি ছোটা নেহি।

ভাগোয়ান হামারে সাথ হর্ রোজ চল্‌তে হ্যায়। হর কদম্। হাম্‌কো সোচনে হোগা জরুর, কেয়া হামারা করনা হ্যায়। ভোগী ভি হো, আউর যোগী ভি। য্যায়সি! জীবন তো সির্‌ফ চলনে কে লিয়ে।... সকলের পদচিহ্নের ওপর পা ফেলে ফেলে বোধিসত্ত্বও চলতে থাকে। এত মানুষের মধ্যে তাঁর আমিত্বটুকু অহরহই ঘুচে যায়। তাই লোকের ভিড়ে নিজেকেও খুঁজতে হয় তাঁর।

কোন কোন দিন এমন হয়, নিজের ঘরে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সেই কোন ছোটবেলার অনুভূতি জেগে ওঠে তাঁর। 'কে আমি? এলাম কোত্থেকে? যাবোই বা কোথায়?' এই জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায় সে। আবার সেই গ্রাম ভেসে ভেসে চলে আসে ওঁর সামনে। বৃষ্টিধোওয়া গাঢ় সবুজ ফসলী মাঠ। সে ট্রেনে করে গ্রাম থেকে কলকাতা যাচ্ছে। বাড়িঘর গাছপালা সব ট্রেনের জানালা দিয়ে সাঁ-সাঁ করে উল্টোদিকে ছুটছে। ট্রেনের কামরায় এক অন্ধ ভিখারি। মুখে বসন্তের দাগ। বেঁটেখাটো মানুষ। স্পষ্ট মনে পড়ে..... একটা ময়লা ধুতি আর গেঞ্জি গায়ে। ...... দোতারা বাজিয়ে গান গাইছে। গভীর ভরাট গলা। সুরে অপূর্ব সে জাদু—

হে ভগবান, হে ভগবান,
যদি কিছু করো মোরে দান,
হৃদয় ভরিয়া দিও প্রেম
কণ্ঠ ভরিয়া দিও গান।

অস্তিত্বহীনতার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে এই গান আর এই সুর বোধিসত্ত্বের বুকের ভেতরে ছন্দ নিয়ে আসে। অন্ধ ভিখারির সেই গান আজও তাঁকে জেগে থাকতে সাহায্য করে। অক্সিজেন এনে দেয়। অন্ধ, নিঃস্ব মানুষ— সেও হৃদয় ভরে প্রেম পেতে চায়, শোনাতে চায় গান। তা'হলে? এ জীবনের কোন অর্থ কি খুঁজে পাওয়া গেলো? ' সেই অর্থ খুঁজতেই তো আমি ছুটে বেড়াই!' সাগর পাড়ে সমুদ্রলাঞ্ছিত বালিতটে যুবকটি শুধুমাত্র জেগে থাকার বাসনায় একটা প্রতীতিকে খুঁজতে থাকে। দুঃসহ এক যন্ত্রণা তাঁকে আজও ছোটাচ্ছে। কোথায় গন্তব্য? তাঁর জানা নেই। এই যে এখন, সঙ্গমস্থলের মেলায় এত মানুষ! বিচিত্র ভাষা, ভিন্ন রুচি, অন্যতর বোধের সমারোহ—এই সবের মধ্যেও বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী নামে যুবকটি বড্ড একা। তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটে না। তাঁর অন্তরে তাঁরই নৈঃশব্দ্য। কলকাতা থেকে এখানে আসার সময় সে ভেবেছিলো, অনেক লোকের ছোঁয়ায় অবশ্যই তন্দ্রা ছুটে যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়? এই যে বোধিসত্ত্ব এখন গিজগিজ মানুষের মধ্যিখান দিয়ে চলেছে, কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশে যাওয়া যাচ্ছে কোথায়? 'কেন তা পারি না আমি?'

তবুও সেই 'বালক' ভরা প্রাঙ্গণের জমাট শব্দের মাঝ বরাবর হাঁটছিলো। কপিল

মুনির আশ্রম ছুঁয়ে মত্ত সমুদ্রের হাতছানিতে সে সাড়া দিলো। এগিয়ে চললো তটের দিকে। মানুষ আসে যায়। নরনারী। এক স্বপ্নঘোরে ওরা সবাই পাশাপাশি হাঁটে। অবিমিশ্র এক অনুভূতির জন্ম দেয়। সময়ের অববাহিকায় ভেসে যেতে যেতে তাঁর সেই চেনা সুরের কৈশোরক চেতনা এই সমূহ অচেনাকে চোখের সামনে মেলে ধরে। বোধিসত্ত্ব ঘুরে বেড়ায়। সে চলতে থাকে।

চলতে চলতে সন্ধ্যা নামে। বাংলোয় নিজের ঘরে সে যখন ফিরে এলো, সারা শরীর মনে তখন তাঁর দারুণ ক্লান্তির বোঝা। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেওয়া মাত্রই রাজ্যের ঘুম এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরলো। .....ঘুম .....ঘুমের মধ্যেও সে হাজার মানুষের কোলাহল শুনতে পাচ্ছিলো। .....দূরগামী মর্মরধ্বনি। ....ছড়ানো-ছিটানো চিত্রকলা। সারাদিনের দেখা ছবিগুলো অস্পষ্ট, অকল্পনীয় সব আকার নিয়ে অবচেতনার স্বপ্নঘোরে টুকরো টুকরো ভাগে মনের দিগ্‌বলয়ে ফুটে উঠছিলো। আর পৌলমী? হ্যাঁ, পৌলমীও সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ প'রে বারবার ঘুরেফিরে এসে দাঁড়াচ্ছিলো তাঁর স্বপ্নের সাঁকোর ওপর। এই আচ্ছন্নতার মধ্যেও বোধিসত্ত্ব সেই নারীর প্রতি এক অদৃশ্য টান অনুভব করে। কেন এই টান? কে জানে! এ প্রশ্নের কোন উত্তর সে খুঁজে পায় না।

যখন ঘুম ভেঙে গেলো, তখন মাঝরাত। দারুণ অসোয়াস্তি ওর মনে। ঘামছে ও। ও খাট থেকে নেমে এক গ্লাস জল খেলো। বিছানায় ফিরে এসে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আকাশপাতাল চিন্তায় মেতে উঠলো বোধিসত্ত্ব। মেলা প্রাঙ্গণের ঘুমন্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিদ্রাহীন বহু মানুষের চাপা কলগুঞ্জন তাঁর মস্তিষ্কে এসে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিলো। এভাবেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লো বোধিসত্ত্ব। সেই 'বালক'।

আল্লা-হু-আকবর আল্লা-আ-আ-আ-আ! ইল্লাল্লা-আ-আ-আ-আ—

...দূরে মসজিদের রাতশেষের আজানধ্বনি তার কানে এসে বাজতেই ঘুম ভেঙে গেলো। দারুণ ঠাণ্ডা। কম্বলটা ভালো করে মাথা অবধি টেনে বোধিসত্ত্ব চুপচাপ শুয়ে রইলো। এখন নৈঃশব্দ্য নেই। মেলাস্থলের চাপা গুঞ্জন সবসময়ই শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে এই আজানের সুর যেন অতীতের মিশর অথবা পারস্য কিংবা তাশখন্দের কোন মরুপ্রান্তরকে চোখের সামনে নিয়ে এলো। এ-এক দারুণ অনুভূতি। সুখ কাকে বলে? এই তো সুখ! গতকাল প্রথমে পৌলমীকে দেখে ওঁর এক অদ্ভুত মাতাল মাতাল অবস্থা হয়েছিলো। সেও তাঁর সুখেরই স্পর্শ। আজ এখন, এই ভোরে, দূরাগত আজানের সুর ওঁর মনের গভীরের প্রতিটি তন্ত্রীকে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। ভালো লাগার কোন তাপমান যন্ত্র তৈরি হয়নি। না হলে মেপে দেখা যেতো সুখের এই অনুভূতিকে। ......এক সময় ভোরের আকাশ থেকে অস্পষ্ট অন্ধকারকে সরিয়ে পুবের আলোকাভাস সাগরতটে এসে গড়াতে থাকে। উল্টোপিঠে চলে যায় রাত্রি। দিন এলো।

এই তন্দ্রা। সেই সুখ। এমন এক আধো জাগরণের মধ্য দিয়েই দিন এলো। সেই

আচ্ছন্নতার মধ্যেই চলে এলো পৌলমী। আশ্চর্য! সমস্ত তন্দ্রা, ঘুমঘোর ছুটে গেলো বোধিসত্ত্বর।

ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ।

কি হলো ভাবুকমশাই! এখনো ঘুম ভাঙলো না?

গলার শব্দ চিনতে পেরে কম্বল ফেলেফুলে লাফ দিয়ে উঠলো বোধিসত্ত্ব। লাফ দিয়ে দরজা খুলে সে তো অবাক। ......অবাক সে 'বালক' বেলফুলের গন্ধ পেলো একরাশ দমকা হাওয়ার সঙ্গে। কতদিনের চেনা গন্ধ। .....আবার সেই গ্রাম। বেলা বয়ে যাবার পর মেঘমেদুর আকাশের নিচে কত কতদিন সন্ধ্যা নেমেছিলো, তার হিসাব নেই। সঙ্গে বাতাসের সাথে বেলফুলের গন্ধ। ওদের বাড়িতে ফুলের বাগানে গোছা গোছা বেলফুলের গাছ ছিলো। সারাদিন যেমন তেমন, বিকেল পেরোলেই যেন বাতাসকে বন্ধু করে বেলফুলের মাতাল গন্ধ হাজির হতো বোধিসত্ত্বের কাছে। বালক সে, এখনো তাঁর শৈশব ঘুচতে চায় না, সেই আকুল গন্ধ ভেসে এলে। মনের সমস্ত ডালপালা মেলে তাঁর সবুজ পাতাগুলো আকাশের দিকে চেয়ে এখনো যে সূর্যকিরণ খোঁজে।

কালকে সারাদিন কোথায় ছিলেন?

দরজা তো খুলে দিয়েছিলো বোধিসত্ত্ব। পৌলমী ছিলো সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বেলফুলের গন্ধ তাঁকে বহুদূর পেছনে টেনেছিলো। সে নিজের অস্তিত্বে ফিরে আসে। পৌলমীর খোঁপায় গোঁজা ছিলো চারটে বেল ফুল।

একবার খোঁজও করলেন না! বেঁচে আছি, না মরে গেছি!

বোধিসত্ত্ব কুণ্ঠিত। জড়তা সবসময়ই তাঁর সঙ্গী। অনুযোগে জড়তা বাড়লো। লাজুক মুখ করে হেসে বললো, আমি মেলায় হারিয়েই গিয়েছিলাম বলতে পারেন।

হারিয়ে যাওয়াই তো আপনার কাজ! আর, নিশ্চয়ই কেন হারিয়েছিলেন, সেটাও আপনি বুঝতে পারেননি!

নেহাৎ ভুল বলেননি।

বাঃ। ভুলো মনের দোহাই দিয়ে দায় এড়ানো গেলো।

বোধিসত্ত্ব ভাবছিলো, কিসের দায়? এদিকে ফের অনুযোগের সুর।

জানেন, কাল কতবার আপনাকে খুঁজতে এসেছি?

আমি তো মেলায় রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন? আপনি বেরোননি?

কে নিয়ে যাবে বলুন? আমার কর্তাটিতো আর বেড়াতে আসেননি। তিনি এসেছেন চাকরি করতে। তাঁর যে একটা বউ আছে এটাই মনে থাকে না!

বোধিসত্ত্ব চুপ করে রইলো।

ওঃ। আপনাদের কি মজা! ঝাড়া হাত পা। বেরিয়ে পড়লেই হলো। ছেলেরাই

ভাগ্যবান। মেয়েরা তো জন্মেই হাতে-পায়ে শিকল পরে আছে।

তা ঠিকই। তবে শহরের শিক্ষিত মেয়েরা তবু বাইরের জগতে যেতে পারে।

মিথ্যে কথা! ওসব বাঁধা বুলি। এসব শুনে কান পচে গেছে আমার। ওই যে দেখুন! —মেলা প্রান্তরের দিকে তর্জনী তুললো পৌলমী।

বোধিসত্ত্ব দেখলো, এক দেহাতি দম্পতি স্নান সেরে, কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এলো।

দেখছেন তো! বউটার মাথায় তো অ্যাত্তো বড় ঘোমটা। কি বলবেন আপনারা? মেয়েটাকে একেবারে মধ্যযুগে রেখে দিয়েছে! তাই তো? কিন্তু এই মুহূর্তে সে কত সুখী, তা কি বুঝতে পারছেন? আমি কিন্তু পারছি। স্বামীর সঙ্গে সাগরে এসেছে। চান করেছে দু'জনে। এঁদের দু'জনের যেটুকু চাইবার, কপিলমুনির কাছে করজোড়ে সেটুকুই চেয়েছে। মেয়েটার বুক ভরে আছে এখন আনন্দে। কেন জানেন?

বোধিসত্ত্ব সোজাসুজি তাকিয়েছিলো পৌলমীর দিকে। তাঁর বোঝার চেষ্টা চলছিলো ক্রমাগত। সুন্দরী পৌলমী। কিন্তু তাঁর মনে একরাশ দুঃখ, একাকীত্ব। পৌলমী নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলো।

মেয়েটার পাশে তো তাঁর পুরুষটা আছে। তাঁর কামনা-বাসনা যত ক্ষুদ্রই হোক, তবু সে সুখী। যাকগে! কেমন দেখলেন মেলা? মহাকাব্য লেখার রসদ জুটলো?

বলা মুশকিল। তবে এই মুহূর্তে জুটছে।

মানে?

এরকম সুন্দর একটা সকালবেলায়, এক সুন্দরী মহিলা যদি সঙ্গী হয়, মহাকাব্য গড়গড় করে বেরোবে।

খিলখিল হাসিতে প্রায় গড়িয়ে পড়তে চাইছিলো পৌলমী। সাদা-সবুজের তাঁতের শাড়ি পরেছে সে। সদ্য স্নান করে আসা শরীরের মায়াবী গন্ধ ঘর জুড়ে। আর সেই বেলফুলের মাদকতা। .....'আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী। কি বলবো তোমাকে? আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম সুশান্ত। ও কবি। কিন্তু এখন একেবারে পাগল হয়ে গেছে। ওর কবিতাই বলি আমি ; 'আমার কষ্টের কথা তোমাকে/বলবো বলে যখন যাই/ তখন আর আমার কষ্ট থাকে না।'

ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে ডাইনিংরুমে আজও দেখা হলো পৌলমীর স্বামীর সঙ্গে। সরকারের বড় দরের চাকুরে হিসেবে মেপে কথা বলার অভ্যাস। নিজের ওজন বোঝেন। অপরকে সেটা বিনয়ের সঙ্গেই বুঝিয়ে দেন। চাহনিতে তীক্ষ্ণতা আছে। বিচিত্র ধরনের মানুষকে নিয়ে কাজ করেন। বোধিসত্ত্ব আজ ভদ্রলোককে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলো। লোকটার চোখের চাহনিতে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে আছে এক ধরনের তাচ্ছিল্য।

পৌলমীর কাছে শুনলাম আপনার কথা। —তিনি বললেন।

হ্যাঁ। আসলে আমার সম্পর্কে শোনার মতো তেমন কোন কাহিনী নেই। স্রেফ সাদামাটা জীবন। —বোধিসত্ত্ব বললো।

ভদ্রলোক চামচ দিয়ে তুলে স্টু খাচ্ছিলেন। এবার প্লেটটা তুলে পুরো স্টুটা এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। বোধিসত্ত্বের কথা শুনলেন বটে, উত্তর দিলেন না। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

মেলা না তো, একপাল লোককে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো। দুনিয়ার খোট্টা-মোট্টা যে ঘটিতে জল খাচ্ছে, তাই নিয়েই হাগতে যাচ্ছে, আবার সেটা দিয়েই রুটি বেলছে। বোগাস!

পৌলমী বললো, টোস্ট এক পিস রেখে দিলে কেন? খেয়ে নাও। আসবে তো প্রায় সন্ধেয়।

যেন এই কথাটুকুর অপেক্ষাতেই ছিলেন। টোস্টটুকু তিনটে কামড়েই শেষ করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলেন ভাই! এ-কাজে আবার শরীরটা ঠিক না রাখলেও চলে না।

বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারছিলো, খুব সচেতনভাবেই ইনি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মাপা জীবন। বাঁধা রুটিন। কফি খেয়েই উঠে পড়লেন।

চললাম ভাই। প্লিজ, ফিল অ্যাট হোম দেয়ারস নো নীড টু বি ফর্মাল।

এটাও বাঁধা গঁতের কথা। পৌলমী বোঝে। বোধিসত্ত্বও বুঝলো। এঁরা মোটা দাগের সুখী মানুষ তো বটেই। কোন অবস্থাই এঁদের মন থেকে সুখ কেড়ে নিতে পারে না। টাকা এঁদের উপাস্য, স্ত্রী এঁদের সম্পত্তি। শিক্ষা হলো কেরিয়ার তৈরির সিঁড়ি। এই সুখে কোন আনন্দ কোনদিনই খুঁজে পায়নি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী।

আসলে এইরকমই মনে হয় বোধিসত্ত্বর। এটা ঠিক, অনেক কিছু সে বুঝতে পারে যেমন, আবার অনেক কিছুই সে জানে না। অনেকে এত রহস্যময়, কিছুতেই তাঁদের ধরা যায় না। অনেকের বুকের মধ্যে আঙুল ছোঁয়ালেই জলতরঙ্গের শব্দ ওঠে। তবুও সে উচ্চারিত দু'একটা শব্দগুচ্ছ ধরে মানুষগুলোর মনের আনাচে কানাচে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায়।

যখন দু'টি নারী-পুরুষ মুখোমুখি বসে মেতে যায় আবেগে, ঠিক সেই সময় জীবনের রূঢ় সত্যিগুলো মিথ্যে হয়ে স্বপ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। এও তখন সত্যি, সেই মুহূর্তের জন্য। তখন তো কিছু সময়ের জন্য স্বপ্নেরই দাবি ছিলো ওদের! তখন কাঙাল হওয়া চলে। চোখের জলে বুকের ভেতরটা ভিজিয়ে তখন বলা চলে, মাঝখানের সব বাধা মুছে যাক! তাবৎ মানুষজন ভালো হয়ে যাক। এ কথা ভাববার কোন কারণই থাকতে পারে না, যে, এতে কারুর খুব একটা অসুবিধা হবে। সত্যি বলতে কি, মানুষ এটা বুঝতে চায় না, তবুও এতে কারুরই কোন অসুবিধে হয় না।

আবার যখন চুরমার সত্যিকে দেখতে হয়! বোধিসত্ত্ব বোঝে, সেই সত্যিকে দেখে নেবার সাহসও দরকার। স্বপ্নের সৌধ ভেঙে পড়লে, ভগ্নস্তূপে দাঁড়ানো, যাকে বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো, সেও তখনকার জন্য চরম সত্য।

সাগরমেলা ভাঙছে। এদিন বিকেলে পৌলমী বোধিসত্ত্বকে ছাড়েনি। বেলা তিনটে নাগাদ ভাঙা মেলার ভাঙা হাটে ফের বের হলো বোধিসত্ত্ব। একা নয়। পৌলমী পাশে ছিলো। বোধিসত্ত্বর তো নিজেকে খুঁজে বেড়াবার নিঃশব্দ চেষ্টা ছিলো। কিন্তু পৌলমী কি চায়? দু'দিনের পরিচয়ে এক গৃহবধূ এতটা কাছাকাছি আসতে পারে? বোধিসত্ত্বের ভাবনার সুতো ছিঁড়লো পৌলমীর কথায়।

কি করা হয়?

এখনো অথৈ জলে আছি। কিছু করা কি অতই সোজা!

একা ঘুরবার শখ কেন?

দোকলা নেই বলে!

ব্যাপারটা তো সেখানটায় নয়!

তবে কোনখানটায়?

আরে, ধীরে, মশাই ধীরে। ব্যাপারটা একলা-দোকলার নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই বয়সে এরকম ছন্নছাড়া ভাব কেন?

বাবাঃ। এ যে একেবারে ধমক ধামক হয়ে যাচ্ছে!

ছেলেমানুষদের একটু শাসন করতেই হয়।

এ তো পৌরুষে ঘা লাগানো কথা!

লাগুক না।

হঠাৎ এ অত্যাচার কেন?

সত্যি কথাটা জানতে চাইছি।

এর জন্য এত ফন্দি? আসলে সত্যিটা এত বর্ণহীন, যা বলা না বলা একই কথা।

তবে শোনাই যাক, কেন এখানে আসা হয়েছে।

স্রেফ মানুষজনকে দেখতে আসা। যদি কোন হীরে-মুক্তো, নিদেনপক্ষে যদি একটা কালো পাথরও খুঁজে পাওয়া যায়। মহাকাব্য লিখবো যে। এ যুগের কবিরা তো দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ পায় না! মানুষদেবতাকে তাই নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে হয়।

ও সব কাব্যি করে পেট ভরে না। বাপরে বাপ! কবিদের সংখ্যা যে রেটে বাড়ছে, তাতে এদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর মধ্যে আনা দরকার।

বোধিসত্ত্ব হো হো করে হেসে উঠলো।

বাঃ। বেশ বলেছেন তো! তবে কবিরা না থাকলে জীবন থেকে গান যে মুছে

যাবে! জ্যোৎস্না রাতকে কে বলবে, এটা জ্যোৎস্না! আর আপনার মতো সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করবে কারা?

আরে, থামুন থামুন। কবিনিন্দা শুনেই কথার খই ফুটছে! আসলে লেখক-কবিদের আমি হিংসে করি মশাই! হিংসে করি। কি ভাবে যে কথা বুনে বুনে কবিতা আর কাহিনী বানায়, তা আজো আমার মগজে ঢুকলো না।

বোধিসত্ত্ব পৌলমীর চোখে চোখ রেখে এ কথার গভীরতা মাপবার চেষ্টা করলো। কথাটা সত্যি, না ঠাট্টা!

পৌলমী অকপট, অথচ এক অদ্ভুত ভাবালুতায় কথা বলছিলো।

জানেন, যখন কলেজে পড়তাম, তখন কত স্বপ্ন দেখতাম। অনেক দেশ ঘুরবো, সমুদ্র, বন আর পাহাড় চষে বেড়াবো। কিন্তু এমন কপাল, স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো। যাই বলুন, ছেলেরা ইচ্ছে খুশি যা, তাই করতে পারে। মেয়েদের পক্ষে সেটা বড্ড কঠিন।

অনেক মেয়েও পেরেছে। খবরের কাগজেই তো মাঝে মাঝে দেখি, মেয়েরা ব্যবসা করছে। একজিকিউটিভের কাজ করছে। এ-রকম কত আছে!

সেটা একসেপশনাল।

আপনি একসেপশনাল হয়ে উঠুন। লাইম লাইটে আসতে গেলে পুরুষ-নারী দু'পক্ষকেই একসেপশনাল হতে হয়। পাশাপাশি প্রফেশনালও।

না, লাইম লাইটে আমি আসতে চাই না। তেমন কোন বিশেষ গুণ আমার নেই। আমার কথা হলো, মেয়ে হিসেবে, বা ঘরের বউ হিসেবে পুরুষের লেজুড় হওয়াটা বড় অপমানজনক। আমি চাই, আমার নিজের ইচ্ছের ছাপ পড়ুক আমার জীবনে।

কিন্তু ওই যে দেহাতি দম্পতিটিকে দেখালেন, বৌটি কি স্বামীর লেজুড় নয়?

মনে হয় না। আপনারা ছেলেরা, মেয়েদের মনের এই বিশেষ জায়গাটা চট করে ধরতে পারেন না। দেহাতি ওই পুরুষটির এমন অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, যা বউটির পক্ষে অবহেলার বিষয় হবে। ওরা একে অপরের পরিপূরক।

অনেক মেয়ে ঘরকন্না করেই বেশি সুখ পায়। সবাই তো আর দেশ-বিদেশ ঘুরতে চায় না।

সব মেয়েই সংসার করে সুখী হতে চায়। তবে সেখানে স্বামীর সমান সাহায্য আর অনুভূতির আন্তরিকতা থাকতে হবে। ছেলেরা যদি ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে পড়তে পারে, তবে আমরা পারবো না কেন?

পৌলমী ঈষৎ উত্তেজিত— যে যতই নারী স্বাধীনতার কথা বলুক, বউটিকে সবাই তাঁর ব্যক্তিগত দখলিস্বত্ত্ব মনে করে।

কথাটা বোধিসত্ত্বকে নাড়া দেয়। সে ভাবনায় ফিরে দাঁড়ায়। 'নিজের স্বার্থ ছেড়ে

আমরা কি স্ত্রীকে উন্নতি করার সুযোগ করে দিই? হয়তো কেউ কেউ দেয়। দু'একজন বাদে সমস্ত মেয়েকেই নিজেকে সংসারের হাঁড়িকাঠে সঁপে দিতে হয়। স্বামী, সন্তান আর সংসারের জন্য মেয়েরা যে ত্যাগ করে তার বিচারের মাপকাঠি কি? শব্দের কৌশলে প্রেমের গাথাকাব্য অনেক লেখা হয়েছে। তাতে কি দুঃখ ঘুচেছে মেয়েদের! জীবন প্রার্থনা করে যে মুক্তির, সে মুক্তি নারীর জীবন থেকে আর কত দূরে?...

এই যে ভাবুক মশাই! আবার কি ভাবা হচ্ছে?—এখন কথায় ক্ষোভ নেই পৌলমীর। আছে মমতা।

আপনার কথাই ভাবছিলাম।

সইলে হয়!

কেন?

মা-বাবা ছাড়া আমার কথা কেউ ভাবে বলে আমি জানি না।

কর্তার ওপর এত রাগ কেন?

কোথায় রাগ! আমি শুধু যা সত্যি, তাই বললাম। উনি নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। সে তো আমাদেরই জন্য। ভবিষ্যতে আমরা সুখে থাকবো! যে মেয়ে সুখে থাকে, স্বাস্থ্যবতী হয়, তা পুরুষের ব্যবহারের জন্যই।

উত্তর খুঁজে পায় না বোধিসত্ত্ব। স্বগত উচ্চারণে সে কথা বলে। 'আসলে পৌলমী, তোমার দুঃখের কিছুটা ভাগ নেবার চেষ্টা করছি আমি। যদিও দুঃখ-যন্ত্রণা প্রত্যেকের নিজস্ব, তবুও আমরা দোসর খুঁজি। মনের একতারায় আনন্দ অথবা বিষাদ, যে সুরই বাজুক না কেন, তা কাউকে না জানাতে পারলে ভালো লাগে না। কারণ, ভালোবাসার কাঙাল সকলেই।'

দু'জনেই হাঁটছিলো তখন মুখর মৌনতা নিয়ে। বোধিসত্ত্ব ভাবছিলো, 'সাগর ঢেউয়ের অস্থির গর্জনের পাশাপাশি, পৌলমী, তোমার নরম বুকের নিচে জমে থাকা বিষাদের ক্ষীণ শব্দও যে আমার মনে ছাপ ফেলছে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা, কিছুটা আগোছালো টানে, বেলাভূমির বালিয়াড়িগুলো পেরিয়ে বেশ অনেকটা রাস্তা চলে এসেছিলো। চলতি রাস্তার আঘাটাগুলো পেরিয়ে তারা আরো ঢালে-নাবালে চলবে কি? এই এখন, একই সহাবস্থানে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব এক আপাদমাথা নারীর দুঃখবোধের শরিক হতে চাইছিলো। সে কে? যে মেয়ে নারীর মুক্তি চাইছে। তখনই পৌলমী বোধিসত্ত্বের হাত ধরে বললো, চলুন, ফিরে যাই। অনেকটা রাস্তা তো চলে এসেছি।

এই প্রথম পৌলমীর শরীরী স্পর্শ পেলো বোধিসত্ত্ব।

চুপচাপ ফিরে চললো দু'জনে। অনেকটা রাস্তা। নেমে আসা সন্ধ্যার আলো-আঁধারে সাগরের নীল জলে মাঝে মাঝে আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছিলো। ভাঙা মেলা

প্রাঙ্গণ থেকে মাইকে গানের শব্দ ভেসে আসছে। বোধিসত্ত্ব তাকালো পৌলমীর দিকে। পৌলমীর চোখে জল। সে বুঝতে পারছিলো, এই কান্না অনেক দূরের যন্ত্রণা থেকে নিংড়ে নিয়ে আসা। সে উথাল-পাথাল ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে সেই নারীর হাতদুটো ধরে বললো, কি হয়েছে তোমার পৌলমী?

এই প্রথম সে নাম ধরে ডাকলো। কপিল মুনির আশ্রমের কাছে প্রচুর আলো। ওরা দু'জন সেই আলোর মধ্যে চলে এসেছে ততক্ষণে। কোন আখড়ায় তখন ভজন গান হচ্ছে—

...মীরা কি প্রভু গিরিধারী নাগর রাধা কি মনমোহন ...

বাংলোয় ফিরলো বোধিসত্ত্ব। মাঝখানে পড়ে রইলো একটা যুগ। ফের আত্মগত উচ্চারণে ফিরলো সে। ...... পৌলমী, তোমাকে আমি রচনা করে চলেছি এখন।.......ঠিক যেখানে নদী সাগরে এসে মিশেছে, মোহনায়, সেই সাগরের নীল থেকে উঠে এসে তুমি বললে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি? আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ। মোহেঞ্জোদারো আর হরপ্পায়, দূর মেসোপটেমিয়ায়, রোমে, টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসের তীরে, মিশরে, নীলনদের উপত্যকায়..... তারপর এক আলোকবর্ষ পেরিয়ে অজন্তা, ইলোরা, শ্রাবস্তি আর বিদিশায় তুমি যখন বাসবদত্তা বা বসন্তসেনা— তোমার এলোচুলে তখন বিশ্ব-সংসারের রহস্য-আঁধার। হাজার বছর ধরেই তো আমি তোমার হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে পৃথিবীর কিনারা ধরে ছুটেছি। সেই তো তুমি! আর আমি সেই তোমাতেই আছি....!

শেষ হলো সাগরমেলা। এবার ঘরে ফিরতে হবে। ঘর যাঁর যেখানেই হোক— শহরে, শহরতলীতে, দূর গ্রামে, অরণ্যছায়ায় অথবা পাহাড়ে। যেতে তাঁদের হবেই। তাই এখন ফিরতি পথে ঢল নেমেছে। ভাঙা উৎসবের খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে চলমান জনস্রোতের ভাঁটির টান দেখছিলো বোধিসত্ত্ব। কি পেলো তাঁরা? উন্মাদ কবি বন্ধু সুশান্ত সরকারের কবিতা মনে পড়ে গেলো। 'এ পৃথিবীকে তন্ন তন্ন করে খুঁজিনি/তাই পাইনি যা কিছু / কিন্তু যারা খুঁজেছে, তারাও কি পেয়েছে?'

হোগলা পাতায় ছাওয়া দোকান ঘরগুলো নিলাম হচ্ছে। যাঁরা দু'পয়সা কামাতে এসেছিলো, তাঁরা ঝাপ গুটিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধছে। সাধু-সন্ন্যাসী এখনো যাঁরা আছে, এখানে ওখানে জটলা পাকিয়ে দমভর গাঁজা টানছে। বোধিসত্ত্ব ঘরে বসে পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। আলস্য সারা শরীরটাকে মুড়ে রেখেছে একেবারে। নড়তে চড়তে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। মনটাও কোন ভাবনাচিন্তা করতে চাইছে না। এক অদ্ভুত নিস্তেজ জাগরণ এখন তাঁর।

পৌলমী এসে যখন ওর ঘরের দরজায় নক্ করলো, তখন সাড়ে ন'টা বাজে। বোধিসত্ত্ব ধড়ফড় করে উঠে পড়লো। বড্ড আগোছোলা হয়ে বসেছিলো সে।

দরজা খুলেই দেখতে পেলো পৌলমীকে। সবুজ পাড় তাঁতের শাড়ি পরনে। সবে স্নান করেছে। কপালে সিঁদুর। এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো এক অপূর্ব স্নিগ্ধ গন্ধ। সেই সঙ্গে পৌলমীও। বোধিসত্ত্বের বুকের মধ্যে বেজে উঠলো খঞ্জনি। মনের মধ্যে গোবিন্দদাস—'করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই/ অলক তিলক লিখি ভোর/ সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই/আকুল গদ গদ বোল।।'

খবর কি?

বোধিসত্ত্ব নিজের মধ্যে ফিরলো। বললো, খবর তো ভালোই। তারপর?

গেস্ট ঘরে এলে কিভাবে খাতির করতে হয়, সেটুকু না করেই আগে প্রশ্ন! ছেলেমানুষ বললে তো আবার গায়ে লাগে।

বসুন। — বোধিসত্ত্বর মনটা এলোমেলো হয়ে যায়। পৌলমী একটা চেয়ারে বসে পড়লো। সে আজ আরো সপ্রতিভ। বোধিসত্ত্বর দু'দিনের সংসার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলো সে। দেয়ালে ঝোলা ব্যাগ ঝুলছে। তার মধ্যে কয়েকটা বই। টেবিলে ছড়ানো ছেটানো টুথপেস্ট, ব্রাশ, পেন, একটা লেখার প্যাড, তাতে গোটা দশেক লাইন লেখা। একটা দলাপাকানো তোয়ালে, জলের গ্লাস আর কয়েকটা বাংলা-ইংরেজি ম্যাগাজিনও রয়েছে টেবিলে।

কি দেখছেন?

দেখছি, একটা টেবিলে মোটামুটি সারা বিশ্ব হাজির।

দু'দিনের থাকাথাকি। তার আবার গোছগাছ!

কেউ কেউ একদিনের সংসার গুছিয়ে রাখে।

কেউ কেউ এক মাসের সংসারও গোছায় না।

বাপরে বাপ! এত ঝগড়া করতে পারেন!

যাকগে! তারপর?

আজ চলে যাচ্ছি। বলতে এলাম।

আজই?

হ্যাঁ। সরকারি কাজকর্ম শেষ। আমার কর্তা ফিরবেন। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমাকেও—। আপনি কবে যাচ্ছেন?

এখনো কিছু ঠিক করিনি।

কেন? যা খুঁজছেন, তা কি পাওয়া গেলো না? নাকি জোগাড় করতে আরো সময় লাগবে?

জানি না। একদিনেও অনেক কিছু জানা যায়। আবার কখনো বছর পেরিয়ে যায়, কিছুই বুঝতে পারি না। সবচেয়ে বড় কথা, আমি নিজেকেও কি বুঝতে পারি! এ-এক রহস্য বলে মনে হয় আমার কাছে। তা যাক!— বোধিসত্ত্ব হেসে বলে, ও-

সব পাগলামি হাস্যকর লাগবে।

তাই বুঝি। কি করে বুঝলেন?

না, তা নয়। আমার ব্যাপারটা এইরকমই। চলতি জীবনে এ সব ব্যাপার অদ্ভুত নয় কি?

চলতি জীবনে কোটি কোটি মানুষ যা করছে, সব কি ঠিক করছে? তাঁদের কাজে পরস্পরবিরোধিতা নেই?

কথাটা শুনে বোধিসত্ত্ব অবাক হয়েই পৌলমীর দিকে তাকালো।

আপনি এসব ভাবেন না কি? আশ্চর্য। রাস্তাঘাটে, সংসারে এমনকি রাজনীতিতেও যে সব মানুষকে দেখি, তাঁদের আচার-আচরণ, পরস্পরবিরোধিতা দেখে হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে।

ঠিক তাই তো হচ্ছে। কত লোককে দেখছি নারীকল্যাণের জন্য সভা-সমিতিতে বড় বড় কথা বলে। ব্যক্তিগত আলাপে দেখেছি, তাঁদের মনগুলো সব কূপমন্ডুকতায় ঠাসা। এ তো আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

যাক্। ভারী ভারী কথা থাক। এত সবের মধ্যেও সব কিছু মিলে কেমন লাগলো সাগরমেলা?

আমাদের আবার ভালো লাগা মন্দ লাগা! কার কি এসে যায় তাতে! কিছু ভাবতে গেলেই চারদিক অন্ধকার লাগে।

এতো দীর্ঘশ্বাসের ছায়া কেন কথায় কথায়? যদি এই মেলায় আপনার একটুও কিছু ভালো লেগে থাকে, সেটা শুনলে আমার অন্তত ভালো লাগবে।

পৌলমী ওর কাজল কালো চোখদুটো তুলে বোধিসত্ত্বের দিকে তাকালো। বললো, হ্যাঁ। এই মেলায় এক কবির দেখা পেলাম। ভালো লাগলো।

বোধিসত্ত্ব নির্বাক। কিন্তু মন কথা বলে উঠলো।... 'কিন্তু তোমার একাকীত্বের আর যন্ত্রণার ভাগ নিতে গিয়ে আমার যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না। তবুও দু'দিনের আলাপ। এত সাঙ্ঘাতিক টান কেন?'

চলে যাচ্ছি। কই! ঠিকানা জানতে চাইলেন না?

বোধিসত্ত্ব ভাবছিলো, 'পৌলমী, তোমাকে তো বলতেই চেয়েছিলাম, ঠিকানাটা দাও। কিন্তু—'

কি হলো। এত ভাবনা কিসের?

বোধিসত্ত্বর মনের মধ্যে ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে যায়। এ কালবৈশাখীকে সে বাগে আনতে পারে না। পথিক জীবনে কত মানুষ আসে। আবার চলেও যায়। জীবন যদি হয় নদীর মতো, তবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কই? হে মহাকাল! উত্তরের অপেক্ষায় আছি। উত্তর দিতে পারো...!

কই! আমার কথার উত্তর দিলেন না?

বোধিসত্ত্ব নিজেকে ফিরিয়ে এনে নিজের মধ্যে রাখে। দেখে, পৌলমী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর বড় বড় কাজল চোখে ভরদুপুরের বটগাছের ছায়া। বোধিসত্ত্বর মন সেই বট ছায়াতেই আশ্রয় খুঁজতে গেলো। পৌলমী তাঁর সকল সম্পূর্ণতা নিয়ে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে তখনো। বোধিসত্ত্বর সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতির জারক রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে ভেসে যাচ্ছিলো দেহ-মন।

বোধিসত্ত্ব টেবিল থেকে লেখার প্যাড আর কলমটা নিয়ে এগিয়ে দিলো পৌলমীর দিকে। পৌলমীর কাঞ্চনরঙের আঙুলগুলো নড়ে চড়ে উঠলো। চমৎকার হাতের লেখা। নাকি পৌলমীর যা দেখে, তাই বোধিসত্ত্বর ভালো লাগে! তা'হলে কে কাকে বশীকরণের মন্ত্রপূত জল ছিটিয়েছে?

একা কিংবা যূথবদ্ধ পথিকের দল—ওরা একে একে মেলাপ্রাঙ্গণ খালি করে চলে গেলো।

এইভাবেই যে কাহিনীর শুরু হলো, তা নয়। এ কাহিনী শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন। বোধিসত্ত্ব এটা অন্তত বুঝেছে, যে, মিথুন মহিমায় মানুষের গাঁদি বন্দরে, শহরে আর গ্রামের হাটতলায় কিলবিল করছে। প্রত্যেকটা মানুষই পরস্পর লড়াই করে যাচ্ছে। কে কাকে টপকে আগে যাবে তার প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কি আগে যেতে পারে? বোধিসত্ত্ব তো ডুবো পাহাড়ের আশপাশে থাকা বাতিঘর থেকে স্থলভাগের মানুষগুলোকে দেখছেই। তার মধ্যে অনেকের স্পষ্ট মুখগুলো তো সে দেখেছে। ওঁরাই তো ভরসা। 'ওঁরা বেঁচে থাক। আমার প্রার্থনা এটুকুই।' এই তাঁর স্বগত কথন।

দুই

'আকাশের চাঁদ বড় ভারি হয়ে উঠছে
নদীতে নেই কোন সমুদ্রের হাতছানি
সমস্ত নোঙর আজ ভেঙে গেছে
আর আমি কুসুমের চিন্তা মাথায় রেখে
পাথরের দিকে হাত বাড়িয়েছি
তোমারই মতো করে উজার করে দিয়েছি
আমার যা কিছু।
আমার সামনে বিচলিত অন্ধকার
আমার সামনে প্রগতির তিরস্কার
আমার সামনে গোলাপ, গোলাপের সারি
ক্রমশ ভেঙে পড়ছে।'

— সুশান্ত সরকার

'ভেবেছিলাম মহাকাব্য লিখবো। তাই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই। ইতিহাস খুঁজি।' বোধিসত্ত্বর কলম থেমে যায়। 'আমি যা লিখতে চাই, সে শুধু ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়'।

রাত গভীর। আজন্ম দিনযাপনে বোধিসত্ত্বর বুকের মধ্যে যদিও ভাগীরথীর ছোটছোট ঢেউগুলো খেলা করে, তবুও সে আজ বুকের মধ্যে অন্যরকম শব্দের খোঁজ পেলো। শব্দটা বহু দূর থেকে আসছিলো। সে কি নদীর পাড়ভাঙার শব্দ? বুকের মধ্যে সে তো মাঝে মাঝেই পৃথিবী ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পায়।—ঝপাস্! ঝপাস! হৃদপিণ্ডটা কাঁপে। কিন্তু এখন তো শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে! বোধিসত্ত্ব এবার কান খাড়া করে। কারা যেন দৌড়োচ্ছে! আশ্চর্য! এতো রাতে— কি হলো?

...উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রিটে পুরনো এই তিনতলা বাড়িটায় অনেকদিন ধরেই ওরা আছে। বাবা, মা আর ছোট এক ভাই। এই ওদের সংসার। গতকাল সকালে বোধিসত্ত্ব সাগরদ্বীপ থেকে বাড়ি ফিরেছে। ভ্রমণ তো মানুষকে খোলা আকাশ আর তুমুল বাতাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কিন্তু সাগরমেলা থেকে ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে একরাশ বিষণ্ণতা। তবুও বিষণ্ণতার ঘোর কাটিয়ে মনটাকে থিতু করেছে ও আজ। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়ির। যখন নৈঃশব্দ্য প্রগাঢ় হয়ে উঠলো, বোধিসত্ত্ব তখনই কলম নিয়ে বসেছিলো। এখন রাত প্রায় একটা।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা যে শব্দটা ওঁকে অবাক করেছিলো, যে শব্দের সঙ্গে ওঁর আজন্মলালিত নদীপাড় ভাড়ার শব্দকে গুলিয়ে ফেলেছিলো, সেই শব্দ এখন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। বাবা-মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। এ ঘরটায় বোধিসত্ত্ব

আর ওর ভাই শুদ্ধসত্ত্ব ঘুমোয়। ঘরের ডানদিকের কোণে জানালা ঘেঁষে বোধিসত্ত্ব একটা টেবিল রেখেছে। এখানটাতে বসেই টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে সে পড়াশোনা বা লেখালেখি করে। ভাইও ঘুমিয়ে পড়েছে। জমাটবাঁধা একগুচ্ছ শব্দ আরো কাছে এগিয়ে এলো। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ও জানালার ছিটকিনি খুলে একটা পাল্লা ফাঁক করলো। সাবধানেই করলো। দিনগুলো ভালো যাচ্ছে না। সালটা উনিশশো পচাঁত্তরের শুরু। রক্ত গড়ানো সব দিন মাস আর বছরের সমস্ত তিথিগুলো তখনো পেরিয়ে যাচ্ছিলো। এর শেষ কবে হবে?

ওদের বাড়ির দুটো বাড়ির পরে রাস্তার মোড়। মোড়ে একটা চায়ের দোকান, মুড়ি তেলেভাজার দোকান একটা, একটা মিষ্টির দোকান, আর দু'টো মুদির দোকান। এর পরেই বিরাট বস্তি এলাকা। দিনেরবেলায় মোড়টা জমজমাট হয়ে থাকে। বোধিসত্ত্বও সকাল-সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ন্যাপলার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা মারে। ও জানালার পাল্লাটা একটু ফাঁক করতেই চোখ চলে গেলো বস্তির সামনেটায়। সেখানে একগাদা লোক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কাদের লক্ষ্য করে অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছে! কতগুলো ছেলে রাস্তার মোড়ে বন্ধ চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে।

স্ট্রিটলাইটের আলোয় ওদের হাতের অস্ত্রগুলো ঝলসে উঠছিলো। দু'টো ছেলে মাথার ওপরে সাঁই সাঁই করে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। চার পাঁচজনের একটা দল কাঁচা কাঁচা খিস্তি করতে করতে বস্তির গলির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

শালা বিপ্লবীর বাচ্চাদের টেনে বার কর! শুয়োরের বাচ্চারা বিপ্লব করবে! খানকির ছেলেদের হাত-পা কেটে আলাদা করে দোবো! অ্যাই শুয়োরের বাচ্চারা। বেরো! না হলে মাগ-ভাতার শুদ্ধু সব্বাই মরবি!

বোধিসত্ত্বর সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। এরা কি মানুষ!

দুটো চোঙা প্যান্ট পরা ছেলে। হাতে রিভলভার নিয়ে রাস্তাটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেরোসিন ঢাল! শুয়োরের বাচ্চাদের ঘর থেকে বের করে না দিলে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দে!

কাদের ঘরের দরজায় লাথি পড়ছে। দুম্-দাম্ আওয়াজ হচ্ছে।

শ্লা, কোন বাবা তোদের বাঁচায় আজ দেখবো।

বোধিসত্ত্বর সারা শরীর জমে বরফ হয়ে গেছে। কোনো সাড় নেই। এক্ষুনি লাশ হয়ে যাবে কতকগুলো তাজা ছেলে! বড় বড় বাড়িগুলোর দোতলা তিনতলা চারতলার জানালাগুলো সামান্য খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়।

কে!— কারুর ছোঁয়া পেয়ে বোধিসত্ত্ব চমকে উঠলো। ঘুরে দেখে ভাই শুদ্ধসত্ত্ব ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

দাদা। কি হবে! ওরা আজও খুন করবে। কি হবে দাদা!

বোধিসত্ত্ব ভাইকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো জানলার পাশে। 'কি বলবো আমি ভাইকে? আমিই কি জানি এর শেষ কোথায়? আমরাই কি বাঁচবো? জানি না।'

হল্লা আরো বেড়ে গেলো। ওরা বস্তির ভেতর থেকে দুটো ছেলেকে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে বের করে নিয়ে এলো। রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের সামনে এনে ছুঁড়ে ফেলা হলো ওঁদের।

আমার দাদাকে তোমরা মেরো না! আমার দাদাকে তোমরা মেরো না গো! আমার দাদা কিছু করেনি! মেরো না গো! মেরো না! আমার দাদাকে বাঁচাও! ও হরিদা! কাল্লুকাকা! ঝন্টুদা! আমার দাদাকে বাঁচাও তোমরা!

চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরোচ্ছিলো মেয়েটা। আলুথালু হয়ে গেছে পরনের শাড়ি।

অ্যাই মাগী। কোথায় যাচ্ছিস? একটা লাথ মারবো না হারামজাদী, যেখান থেকে বেরিয়েছিস, ফিন শালী সেখানে ঢুকে যাবি! দাদার জন্য পীড়িত। দাদা যখন লালঝাণ্ডা লিয়ে লেবারদের ঘরে বিষমন্তর দিতো, কোথায় ছিলে? চল্ বে! তোর দাদার রক্ত দিয়ে পোস্টার লিখবো রে শালী!

একটা কালোমতো ছেলে মেয়েটার দু'টো হাত মুচড়ে ধরে বস্তির গলির ভেতর ঠেলে নিয়ে গেলো। সেখানে আর নজর যাচ্ছিলো না বোধিসত্ত্বর। মেয়েটার চিৎকার ভেসে আসছিলো.....বাঁচাও! আমার দাদাকে বাঁচাও! আমার দাদাকে বাঁচাও! ও ঝন্টুদা.....।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শুদ্ধসত্ত্ব।

দাদা!

কি?

ও তো আমাদের মানিক। ওই যে ল্যাম্পপোস্টের সামনে ফেলে যে ছেলেটাকে মারছে। ও আমার সাথে পড়তো। ক্লাসের সেকেন্ড বয়। ওর বাবা জুটমিলে কাজ করতে করতে মারা গেছিলো। দাদা, মানিককে ওরা মেরে ফেলবে দাদা!

আয় কমুউনিস্টের বাচ্চা। যে হাতে পোস্টার লিখিস, সে হাতটা আগে লিয়ে লি! ...বন্দে-এ-এ-এ-মাতরম! ...ততক্ষণে তলোয়ারের কোপ পড়েছে মানিকের ডান হাতে। আ-আ-আ-আ! বাঁচাও! ...আর্ত চিৎকার করে মানিক আছড়ে পড়লো শান বাঁধানো রাস্তায়।

ছুরি আর তলোয়ারধরা দু'তিনটে হাত মানিককে তখন এলোপাথারি কোপাতে শুরু করেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে যাচ্ছে রাস্তার পাশে বাড়ির দরজায়, দেওয়ালে। —বুম্-বুম্-বুম-বুম! ...কান ফাটানো বোমার শব্দ। বন্দে-এ-এ-এ-এ মাতরম! এশিয়ার মুক্তি সূর্য ...বুম-বুম! মুড়ি মুড়কির মতো বোমাবাজি শুরু হয়ে গেলো। বস্তির ভেতরে

শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছেলেটাকে ততক্ষণে মারতে মারতে আধমরা করে মাঝরাস্তায় শুইয়ে ফেলেছে ওরা। যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মতো দাপরাচ্ছে ছেলেটা। ছেলেটার শরীরের ওপরই একটা বোমা ছুঁড়ে মারলো একজন।...বুম্...! ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেলো রাস্তাটা। পশুরা চিৎকার জুড়লো—বন্দে-এ-এ-এ মাতরম্। যুগ যুগ জিও! যুগ যুগ জিও!

বোধিসত্ত্বর মাথা কোন কাজ করছে না। বরফ জমাট চিন্তা থেকে নিজেকে সে কিছুতেই আলাদা করতে পারছে না।

'আমি কী করবো? কীই বা করতে পারি আমি? এই তুমুল ধ্বংসের মধ্যে আমি হারিয়ে যাবো। রোজ একই খবর—আরো খুন। আরো অত্যাচার। জেলখানায় গুলি, রক্তের নদী, সারি সারি লাশ। অবস্থা নাকি নিয়ন্ত্রণে! কার নিয়ন্ত্রণে? মানুষের? নাকি একগাদা জানোয়ারের? কি করবো আমি? বোধিসত্ত্ব, কিছু করো! চুপ করে আছো বোধিসত্ত্ব? তোমার কি ভয় করে? —না! ভয় আমি পাই না। কিন্তু আমি কি সত্যিই কিছু করতে পারি? আমি কি মানিকের জীবন বাঁচাতে পারতাম? খুনিরা শুনবে আমার কথা। কতগুলো মাতাল, উন্মাদ অপরাধীকে দিয়ে তাজা তাজা ছেলেগুলোকে খুন করানো হচ্ছে। আমি কি বুঝি না! সব বুঝি। না, আমি পারতাম না!' বোধিসত্ত্বর মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো। অসহায় এ যুগের তারুণ্য। কেউ মরে। কেউ বেঁচে থেকেও মরে আছে। ' হে ভগবান! হায়রে! তুমিও শয়তানদের দলে নাম লেখালে! তা হলে কোন ভালোত্বের জন্য এই পৃথিবীটা এখনো আছে? অস্তিত্ববিহীন অপদার্থ ঈশ্বর, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও!'

...... আমার দাদাকে ওরা মেরে ফেললো গো বাবা! ও বাবা গো! ওগো তোমরা কিছু করতে পারলে না! ও বাবা গো!.......

মানুষের হল্লা ছাপিয়ে মেয়েটির বুকফাটা কান্না বোধিসত্ত্বর পাঁজরে গিয়ে ধাক্কা মারছিলো। ধোঁয়া সরে গেছে। রক্তনদীর ওপর শুয়ে আছে দুই যুবক। কি বীভৎস! রক্তমাখা দলা পাকানো দু'টো মাংসপিন্ড। ও! সহ্য করা যায় না।

পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে এক ঝটকায় জানলার কাছ থেকে সরে এলো বোধিসত্ত্ব। লাইট জ্বালালো। দেখলো, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ভাই শুদ্ধসত্ত্ব। চোখ-মুখ জুড়ে আতঙ্ক। বোধিসত্ত্ব আলনা থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে গলিয়ে নিলো।

কোথায় যাচ্ছিস দাদা?

নিচে। রাস্তায়।

দাদা, যাস না। এক্ষুনি পুলিস আসবে। উল্টোপাল্টা লোককে ধরে নিয়ে যাবে। ঝামেলা বাড়বে।

তা হ'লে কি করি! ওঃ। অসহ্য! তিনতলার ঘরে বসে বসে শুধু দেখেই যাবো,

আমার ভাইয়ের বয়সী ছেলেগুলো রাস্তায় পড়ে পড়ে খুন হবে। জানি না। কিচ্ছু জানি না, শেষমেষ কী হবে!

দরজার ছিটকিনি খুলে বোধিসত্ত্ব ঘরের বাইরে এলো। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই মা ছুটে এলো পাশের ঘর থেকে। 'এরা সবাই জেগে আছে।'

কোথায় যাচ্ছিস বুধ?—মায়ের গলায় উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বোধিসত্ত্ব ঘুরে দাঁড়ালো। মা-বাবা-ভাই সবাই জেগে আছে। এ রকম প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রত্যেক মা-বাবা-ভাই-বোন, আরো অনেকে জেগে আছে। তবুও মানিক খুন হয়ে গেলো। মানিকের বোন আছাড়ি পিছাড়ি আর্তনাদে ফাটিয়ে দিচ্ছে পাড়া। আমরা কি জেগে আছি? বোধিসত্ত্ব, তুমি কি বলতে পারো, তুমি জেগে আছো? তোমার পৌরুষ, তোমার বিবেকবোধ, তোমার মনুষ্যত্ব জেগে আছে?—না, না, না! আমি জেগে নেই। আমি বেঁচেও নেই। আমি অপদার্থ। অক্ষম ফসিলমাত্র। সত্তরের দশকের বাইরেটাই শুধু ঘন কালো অন্ধকার মাখানো নয়, ভেতরটাও। তাজা তাজা লাশগুলো রাস্তায়, পুকুরের জলে, নদীতে আর জেলখানায় পড়ে আছে। আর মানুষের মনের মধ্যেও সে লাশগুলো পচছে! পচন লেগেছে বোধিসত্ত্ব। তুমিও পচছো। অস্বীকার করতে পারো না তুমি, তোমার এবং তোমাদের সকলের সবকিছু মরে গেছে।

হ্যাঁ, মরেই গেছে।

...... ঘুরে দাঁড়াতে পারো? ..... আমি কি ঘুরে দাঁড়াতে পারি? ঈশ্বর তো মরে গেছে। লাশ হয়ে রোজ মর্গে চলে যাচ্ছে ঈশ্বর। নখদন্তহীন অক্ষম ভগবান! তুমি কিছু করতে পারো না! শয়তানের হাত থেকে রাতের চাঁদ আর দিনের সূর্য কে কেড়ে নেবে? তেমন মানুষ কোথায়?

.... তা যদি কেউ পারে, তো মানুষই পারবে.......।

.......নতুবা এমনই মাঝরাতে মানিকরা খুন হয়ে যাবে। নষ্ট চাঁদের আলোয় ওদের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তধারা পীচঢালা রাস্তায় মাটি আর ধুলোর সঙ্গে মিশে কালো হয়ে যাবে। নষ্ট সূর্যের বিষমাখা উত্তাপ ক্ষতবিক্ষত লাশগুলোকে বীভৎস করে তুলবে।....

তাই মায়ের চোখে-মুখে উদ্বেগ দেখে বোধিসত্ত্বর হাসি পেলো। তা'হলে মানিকদের মতো খুন হয়ে যাওয়া ছেলেগুলোর বাবা-মায়ের অবস্থা কী হতে পারে? ভয় পাবে কে? উৎকণ্ঠার রক্তরঙ কার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়া উচিৎ ছিলো? হে আকাশ বাতাস-নদী, ক্রোধের জন্ম দাও। আগুন এনে দাও যুবকের চোখে। বোধিসত্ত্ব কয়েকমুহূর্ত চোখ বুজে রইলো। 'দাও হস্তে তুলি, তোমার অমোঘ শরগুলি/ তোমার অক্ষয় তূণ, অস্ত্রে দীক্ষা দেহো, রণগুরু।'

মা, চিন্তা কোরো না। অনেক লোক রাস্তায় নেমে পড়েছে। যাই। মেয়েটা কাঁদতে

কাঁদতে গলা ভেঙে ফেললো। জানোয়ারগুলো পালিয়েছে। দেখি, যদি কিছু করা যায়।

বোধিসত্ত্বর গলার স্বরে এমন কিছু ছিলো, যে ওঁর মা আর বাধা দিতে পারলো না।

সাবধান বুধ! দেখেশুনে যাস।

তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে এলো বোধিসত্ত্ব। বাড়ির গেট খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

লম্বা লম্বা পা ফেলে বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী রাস্তার মোড়ে রক্ত গড়ানো সেই পথে গিয়ে পৌছলো। ছন্নছাড়া ভিড়। শোক আতঙ্ক আর রাগ—বস্তিবাসী মানুষগুলোর মধ্যে এই তিনের বিমিশ্র প্রতিক্রিয়ার আগুন ক্রমশঃ একটা আকার নিচ্ছিলো। ওঁকে দেখে অনেকেই দৌড়ে এলো।

বুধদা, বুধদা! মানিককে ওরা খুন করে ফেলেছে বুধদা। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো দু'টো ছেলে।

মানিক আর কোনদিন আবৃত্তি করতে পারবে না বুধদা! এ কি হলো বুধদা?

এতক্ষণে খুব ভালো করে মানিক বোসকে মনে পড়লো বোধিসত্ত্বর। গত বছর পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে সে নিজেরই লেখা কবিতা পড়েছিলো। ভরাট, আর দরাজ গলা ছিলো মানিকের। সেই কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না। বোধিসত্ত্বর গাল বেয়ে কখন যে জলের ধারা নেমেছে, সে নিজেও জানে না। চোখভরা টলটলে জল ওঁর দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিয়েছিলো।

... কাতারে কাতারে মানুষ এবার রাস্তায় নেমে আসছে। ...ওঁদের বুঝি চট্‌কা ভাঙতে শুরু করেছে। ....কলরোল বাড়ছিলো। 'আমরা আর সহ্য করবো না। খুনিদের শাস্তি চাই।' সমুদ্রের ক্রমাগত ভেঙে পড়া অশান্ত ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলো বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী।

........মঞ্চের পেছনটা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বিশাল স্কেচ। পাশে লেখা

'ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আছি সেই শ্যামবঙ্গদেশে
যেথা জয়দেব কবি কোন্ বর্ষাদিনে
দেখেছিলো দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর॥'

লাউডস্পিকারের স্ট্যান্ডটা বাঁ হাতে ধরে সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ সতেরো বছরের যুবক মানিক বসু বিশ্বকবিকে নিবেদন করছিলো নিজেরই লেখা কবিতার বিনম্র ভালোবাসা। সজীব, সবুজ, আর ঐশ্বর্যময় সে ভাষা ;

'তোমার কাব্যে দামাল হই,

দারুণ শব্দে ভাঙলো ঘুম।'
মাঝ-সাগরে ভেলা ভাসালাম,
বুকের মধ্যে বাজলো ধুম।'
ভুবনজোড়া কবিঠাকুর,
তোমার গানে ভাটিয়ালি,
শ্যামল বাংলা, বৈষ্ণব সুর,
মৃদু সমীরণ, ক্রোধ গর্জন,
জেগে আছি তাই,
প্রণাম তোমায় রবিঠাকুর।'

........বোধিসত্ত্ব দেখছিলো, সেই কিশোর যুবা মানিক, তার সমস্ত অবয়ব নিয়ে আকাশকে ছুঁয়ে ফেললো। ও সমুদ্র গর্জন শুনতে পাচ্ছিলো। তার মাঝখান থেকে উঠে আসছিলো মানিকের কণ্ঠস্বর। কোলাহলের মধ্যে কে কাঁদে? ওরে আমার মানিক রে! তুই কোথায় গেলি রে! আমার সোনার ছেলেটারে মেরে ফেললো গো! অকালবৃদ্ধা বিধবা মানিকের মাকে ধরে ধরে রাস্তায় নিয়ে এসেছে বস্তির মেয়েরা। রুগ্না মহিলার গলা দিয়ে শব্দ বেরোতে চায় না। পুত্রশোক! সে কি ভাষায় প্রকাশের অপেক্ষা রাখে!

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিলো বোধিসত্ত্ব। মৃত্যু-রক্ত আর কোলাহল সব মিলেমিশে গেছে। চোখ ভরা টলটলে জলে ঝাপসা লাগছিলো সবকিছু। অস্পষ্ট হয়ে গেছে এই দুনিয়াটা।

বোধিসত্ত্ব!

চোখের জল মুছে ঘাড় ফেরালো বোধিসত্ত্ব।

মাস্টারমশাই!

হ্যাঁ, একটা কিছু তো করা দরকার!

কি করবো?

বোধিসত্ত্ব দেখলো. তাঁর স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখজোড়া দাহ। শোকের আবেগ নেই। ভারী গলায় বললেন, শোন বোধিসত্ত্ব, প্রথমে তোমার জানা দরকার, মানিক কেন খুন হলো। তোমাকে দূরে থাকলে চলবে না।

কেন?

তুমি কি জানো, মানিকের বাবা বাউড়িয়ায় একটা জুট মিলে কাজ করতেন?

শুনেছি।

একদিন নাইট ডিউটি দেওয়ার সময় মেশিনে হাত ঢুকে গিয়ে ওঁর পুরো বডিটাই বিশ ফুট ওপরে উঠে ঝুলে পড়ে। ওঁকে নামাতেই ঘণ্টা পাঁচেক সময় লেগে গিয়েছিলো। যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁর প্রাণটা বলতে গেলে একটা সরু সুতোয়

ঝুলেছিলো। স্যালাইন লাগানোর আগেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ওই চার-পাঁচ ঘণ্টা দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন?

সাঙ্ঘাতিক! যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে প্রাণশক্তিই ফুরিয়ে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত নিস্তেজ হয়ে ঝুলেছিলেন।

ভয়ানক ব্যাপার!

আরো ভয়ানক যেটা, সেটা হলো, কারখানার দুটো ট্রেড ইউনিয়ন—সি আই টি ইউ, আর আই এন টি ইউ সি—দু'পক্ষেরই অভিযোগ ছিলো, কর্তৃপক্ষ ললিত বোসকে উদ্ধার করতে অকারণ সময় নষ্ট করেছে।

কেন?

মালিকপক্ষ চাইছিলোই, ললিত বোস, অর্থাৎ মানিকের বাবা মারা যাক।

সাঙ্ঘাতিক ঘটনা! কিন্তু কেন?

ওই কারখানায় সি আই টি ইউ শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিলেন ললিতবাবু। সবচেয়ে বড় কথা যেটা, ললিতবাবু ইউনিয়ন সেক্রেটারি হবার পর বাউড়িয়া-নলপুর-চেঙ্গাইল-ফুলেশ্বর—এ সব এলাকায় চটকল শ্রমিকরা যেন বাড়তি শক্তি পেয়ে গিয়েছিলো। ছোট ছোট ইউনিয়নগুলোও সি আই টি ইউ-র সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই শুরু করেছিলো।

কি নিয়ে লড়াই হচ্ছিলো?

মাইনে বাড়ানোর দাবি ছিলো। এত কম মাইনে যে ভাবাই যায় না। গাধার মতো খাটুনি, তুলনায় সংসারের সকলকে পেট ভরে খাওয়াবার মতো পয়সা পেতো না শ্রমিকরা। চল্লিশ বছর বয়স হতে না হতেই চটকল মজদুররা বুড়ো হয়ে যেতো। পিঠ বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে অনেকের! তাছাড়া ছাঁটাইয়ের ভয় তো ছিলোই। এখনো আছে।

বোধিসত্ত্ব ভাবছিলো, আমি তো এ-সব জানিই। জন্তু-জানোয়ারের মতো থাবে এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ। এই অবস্থা ভাঙতে কত ছেলেই তো রাস্তায় নেমেছিলো। কিন্তু টাটকা রক্তের নদীতে ভেসে গেলো ওরা।

......ওরা আমার মানিককে মেরে ফেললো গো-ও-ও-ও-ও! ওরে আমার মানিক রে-এ-এ-এ-এ!.....

পুত্রশোকে প্রাণটাই বুঝি বেরিয়ে যাবে মানিকের মায়ের। ভাঙা গলা দিয়ে ঘর-ঘর শব্দ বেরিয়ে আসছে তাঁর। বস্তির চারদিক লোকে গিজগিজ করছে। দামাল হয়ে উঠছে মানুষ।

বোধিসত্ত্ব!

হ্যাঁ মাস্টারমশাই, বলুন।

শোক-দুঃখে ভেসে গেলে কিছু হবে না। আমাদের এমন কিছু করতে হবে, যাতে এই পরিস্থিতি রুখে দেওয়া যায়। মানিককে ওরা কেন খুন করলো, কেন এমন কয়েকশো মানিক পশ্চিমবঙ্গে খুন হয়ে গেছে, তোমার পরিষ্কার বোঝা দরকার।

হ্যাঁ, বলুন।

কর্মরত অবস্থায় কারখানায় মৃত্যু, এই গ্রাউন্ডে ক্ষতিপূরণ, আর প্রফিডেন্ট ফান্ডের টাকা এ সব মিলে ললিত বোসের বিধবা স্ত্রী পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন মালিকের কাছ থেকে। মানিক লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান ছেলে। শ্রমিক ইউনিয়নের সাহায্য নিয়ে সে আইনগত সমস্ত জটিল কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলেছিলো। মালিকপক্ষ হাজার ফ্যাঁকড়া তুলেও শেষ পর্যন্ত টাকা না দিয়ে পারেনি।

শান্তশিষ্ট ছেলেটার মনের মধ্যে তো তা হলে দারুণ তেজ ছিলো বলতে হবে!

হ্যাঁ। ওর যে বিপদ আসছে, বোধিসত্ত্ব, বুঝলে, এটা আমরা একদম বুঝতে পারিনি। এ যে আমাদের কত বড় ভুল আর কত বড় অন্যায়, তা আর বলার নয়।

কঠিন হৃদয় ওঁদের হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই রেবতী চ্যাটার্জির গলা ধরে আসছিলো। চোখের জল জোর করে আটকাতে চেষ্টা করছিলেন। পারলেন না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে স্থির করে ফের শুরু করলেন।

শ্রমিকনেতা ললিত বোসের ছেলে মানিক বোসের এই জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে গত সপ্তাহে কারখানা গেটে ইউনিয়নগুলো যৌথভাবে সভা করে। ললিতবাবু ইউনিয়ন সম্পাদক হয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা আর আচার-আচরণ দিয়ে শ্রমিকদের ঐক্য মজবুত করে ফেলেছিলেন। ফলে বিবেকহীন মালিকপক্ষকে জোর ধাক্কা দেওয়া গিয়েছিলো। তেমনি মৃত বাবার প্রাপ্য আদায় করতে গিয়ে নওজোয়ান মানিক বসু এমন বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা নিলো, যে, সেও কারখানায় জনপ্রিয় হয়ে পড়লো।

মানিক তো আর জুট মিলের শ্রমিক ছিলো না?

না। তা সত্ত্বেও ওর জনপ্রিয়তার কারণ, ও ছিলো ওর বাবারই মতো। সবাইকে নিয়ে চলতে জানে।

বোধিসত্ত্ব তাঁর গভীরে ডুব দিয়ে সেই শান্ত নম্র তেজী ছেলেটাকে উপলব্ধির মধ্যে আনার চেষ্ট করছিলো। মানিকের সাথে ওঁর কোন আলাপ ছিলো না। রাস্তায় পথ চলতি বহুবার দেখেছে। কথা হয়নি কখনো। ছেলেটার বুকের ভেতর এত আগুন ছিলো তা তো তাঁর জানা ছিলো না! আজ সে রাস্তায় রক্তের নদীর ওপর শুয়ে আছে। শুধুমাত্র সেইদিনটার কথাই স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। যা মনের গভীরে গিয়ে লাগে, একবার শুনলে বোধিসত্ত্ব তা আর ভোলে না। রবীন্দ্রস্মরণ অনুষ্ঠানে সেদিন ওঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি......'ভুবনজোড়া কবিঠাকুর/ তোমার গানে ভাটিয়ালি/শ্যামল বাংলা, বৈষ্ণব সুর/ মৃদু সমীরণ, ক্রোধ গর্জন/ জেগে আছি তাই....'

হৈ-হট্টগোল বেড়ে গেলো।

পুলিস আসছে রে! এতক্ষণে শুয়োরের বাচ্চাদের ঘুম ভেঙেছে। লোকজনের রাগ ফেটে পড়লো।

পুলিসের দুটো জিপ এই রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। বোধিসত্ত্বর চোখ সেদিকে চলে গেছে। ভিড় ঠেলে জিপ দু'টো আর এগোতে পারছিলো না।

রক্তে স্নান হয়ে যাওয়া দু'টি মৃতদেহ ঘিরে কয়েকশো মানুষ। অন্ধকার দিন আর রাতগুলো ওদের ভয় আর আতঙ্কের চাদরে মুড়ে রেখেছিলো। মানিকের মৃত্যু ওদের সমস্ত আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিয়েছে। 'ক্রোধে', 'গর্জনে' যে মানিক বোস জেগে ছিলো, সেই জাগানিয়া গান সে উত্তর কলকাতার এই বস্তির মানুষের মধ্যেই শুধু নয়, কোঠাবাড়ির নারীপুরুষের মধ্যেও ছড়িয়ে গেলো। জনরোষ ফেটে পড়লো। রাস্তায় ক্রমশই ভিড় বাড়ছিলো।

খুনিদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অ্যারেস্ট করতে হবে।

এতক্ষণ লাগলো থানা থেকে আসতে? একঘণ্টা আগে পুলিসকে টেলিফোন করা হয়েছে।

থানায় বসে কী করছিলেন এতক্ষণ?

খুনিদের চা-টা খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে বাবুরা বেড়াতে এয়েচেন রে!

কে! কে বললো রে! কথাটা কে বললো রে! জিপ থেকে লাফ দিয়ে নামলো পুলিস অফিসারটা। কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যাবো! পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে এলো এতগুলো লোকের মধ্যে। রেবতী চ্যাটার্জির কানে গিয়েছে কথাটা। তিনি বোধিসত্ত্বর কাছ থেকে সরে গিয়ে ধীর পায়ে ভিড়ের মাঝখানে চলে এলেন। রাগে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা সবাই বলেছি! চলুন থানায়! বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে খুন করে ফেললো গুন্ডারা। তখন আপনাদের বীরত্ব কোথায় ছিলো?

জনতা এবার গর্জে উঠলো।

হ্যাঁ, আমরা সবাই বলছি! পুলিস আর খুনিদের সঙ্গে দোস্তি আছে। চলুন, নিয়ে চলুন আমাদের থানায়! চলুন, পিটিয়ে ক'জনের হাড়গোড় ভাঙতে পারেন দেখি!'

আতঙ্ক-মুক্তির বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে হঠকারী কণ্ঠস্বরও ছিলো।

শালাদের জিপে আগুন লাগিয়ে দে!

হতভম্ব পুলিসগুলো থমকে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে দেখে রেবতীবাবু আর দেরি করলেন না। ন্যাপলার চায়ের দোকানের বেঞ্চিটায় উঠে দাঁড়ালেন।

বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারছিলো, এই ভিড়ের মধ্যে রেবতীবাবুর দলের অনেকেই আছে। বেশ কিছু ছেলে নিমেষের মধ্যে রেবতীবাবুকে ঘিরে দাঁড়ালো। তার মধ্যে ওঁর বন্ধু সজলকেও দেখলো সে। রেবতীবাবু ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন।

শুনুন সবাই! আমি প্রত্যেককে একটা কথা পরিষ্কার করে বলছি! কেউ মাথা গরম করে বাজে কথা বলবেন না! বাজে কাজ করবেন না। আমাদের পাড়ার দুটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেকে খুন করেছে গুন্ডারা। খুনিদের প্রত্যেককে আমরা চিনি। যারা খুন করিয়েছে, তাদেরও জানি। মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসলে আসল খুনিরা আড়ালে চলে যাবে। সব ফেলে পুলিস আপনাদেরই টার্গেট করবে। তাই আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কোন ফালতু কথা নয়, উল্টোপাল্টা কাজও নয়!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে, কাটা কাটা কথায় রেবতী চ্যাটার্জি অসহিষ্ণু জনতাকে থামিয়ে দিলেন। এবার তিনি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন।

আমাদের দাবি, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে খুনিদের অ্যারেস্ট করতে হবে। খুনিদের আমরা চিনি। পুলিসও চেনে। পুলিসের যদি এখন চিনতে কষ্ট হয়, আমরা ওদের নামধাম ঠিকানা পিতৃমাতৃ পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি। কী! আমার সঙ্গে আপনারা একমত?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। একমত। আমরা পাড়ায় পুলিস পোস্টিংও চাই।

হ্যাঁ। পাড়ায় পুলিস পাহারা বসাতে হবে। গুন্ডাদের সঙ্গে পুলিসের খাতির কিসের অত? আমরা জানতে চাই! গুন্ডাদের অ্যারেস্ট করতে হবে। চোলাই মদের ঠেক ভেঙে দিতে হবে। জুয়ার আড্ডা তুলে দিতে হবে। ওগুলোই খুনিদের ঘাঁটি।

অনেক মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর এই ছোট রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো।

খুনিদের অ্যারেস্ট করতে হবে! গুন্ডা-পুলিস আঁতাত চলবে না, চলবে না!

মদের ঠেক ভেঙে দাও!

জুয়ার আড্ডা গুঁড়িয়ে দাও!

পুলিস অফিসারটা এবার মানিকের মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গেলো। জনতা চুপচাপ। এবার রেবতী চ্যাটার্জি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

বন্ধুগণ! আমাদের দাবি না মিটলে আমরা পুলিসকে এখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেবো না! আমরা সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। আর নয়।

আমরা জানতে চাই, আমাদের দাবিগুলো মানা হবে কি না!

আমাদের দাবি!

মানতে হবে!

খুন খারাপি!

বন্ধ কর!

আমাদের দাবি!

মানতে হবে!

খুনখারাপি

বন্ধ কর!

বন্ধুগণ! উচ্চপদস্থ অফিসাররা না এলে আমরা এ রাস্তা থেকে সরবো না। মা-বোনেরা এগিয়ে আসুন! আমাদের মানিক আর ওর বন্ধুর মৃতদেহ আগলে বসে থাকবো আমরা। কালকে এখানকার দোকানপাট, বাজার সব বন্ধ থাকবে। আমরা রাতভর দিনভর রাস্তায় বসে থাকবো।

বেশ কিছুক্ষণ আগেও বোধিসত্ত্ব তিনতলার ঘরে বসে অসহায়ভাবে গুমরে মরছিলো। 'আমি কিছু করতে পারছি না। কিচ্ছু করার নেই আমার।' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, অনেক কিছুই সে করতে পারে। অনেক কিছুই তাঁর করার আছে। হাজার মানুষ এখন রাস্তায়। মানুষই পারে। বোধিসত্ত্বর বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সেই বালক, যে বালক সবুজ শ্যামচ্ছায়া ঘেরা বাংলার গ্রামে, ভাগীরথী বিধৌত জনপদের মাঠে-ঘাটে, বাঁশবাগানে, পুকুরপাড়ে ঘন জঙ্গলের পথে ছুটে বেড়াতো, তার হাতে থাকতো কল্পনার যাদু তরবারি। স্বপ্নের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে সেই রাজপুত্র দূরের পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। যে পাহাড় পেরোলেই ঐশ্বর্যময় এক নগর। ছুটছে বোধিসত্ত্ব। সেই বালক। ছুটছে রাজপুত্র। মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটেছে তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়া। হাতে খোলা তরবারি। কোমরে ধারালো ছুরি। ....প্রাচীন বটগাছটার নিচেই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলো রাজপুত্র। ঘুম ভাঙলো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথায়।

হ্যাঁগা ব্যাঙ্গমা! কে ঘুমায় গাছের নিচে?

ও তো হৃদয়পুরের রাজকুমার।

এখানে কেন?

পথ হারিয়েছে যে!

তা হলে কি উপায়?

ঠিকই তো আছে সব।

কেন ঠিক আছে?

ওই যে পুব পাহাড় পেরোলে যে সুবর্ণনগরী, ওখানকার সব মানুষ তো ঘুমিয়ে আছে।

কেন গো?

ভীষণ একটা দৈত্য সুবর্ণনগরীতে ঢুকে পড়েছে। তছনছ করে দিয়েছে সব কিছু। ভালো ভালো লোকের বুকের রক্ত শুষে খেয়ে তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়।

দৈত্যটা কি চায়?

শয়তানের রাজত্ব।

কেন?

দৈত্য কারুর সুখ দেখতে পারে না। পারে না কারুর হাসি মুখ দেখতে। তাই সে চায় শয়তানের রাজত্ব।

এ কি আশ্চর্য কথা ব্যাঙ্গমা! সুন্দর হাসিমুখ তার ভালো লাগে না।

ব্যাঙ্গমি, অবাক হবার কিছু নেই। দৈত্য মরবে। পক্ষীরাজে ভর করে পুব পাহাড় পেরিয়ে রাজপুত্র সুবর্ণনগরীতে গেলেই ভয় পেয়ে যাবে দৈত্য।

দৈত্য ভয় পাবে?

হ্যাঁ, ভয় পাবে। সত্য এবং সুন্দর ছাড়া শয়তানের দোসররা আর কাউকে ভয় করে না। রাজপুত্রের হাতেই আছে সেই তরবারি, যার ছোঁয়ায় সুবর্ণনগরীর মানুষের ঘুম ভেঙে যাবে। আর মানুষ যদি একবার জেগে ওঠে, বুঝলে ব্যাঙ্গমি, তা হলে পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যাবে। শয়তানদের প্রাণভোমরাকে টিপে মেরে ফেলবে মানুষ।

তবে তাই হোক। রাজপুত্রকে তুমি রাস্তা দেখিয়ে দাও ব্যাঙ্গমা। সুবর্ণনগরী জেগে উঠুক।

তাই হবে।

ব্যাঙ্গমার কাছে দিক নির্দেশ পেয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্রের যাত্রা শুরু হলো।

.......রাজপুত্র। সেই বালক। যে বালক ভাগীরথী তীরে পাখপাখালির কলগুঞ্জন মুখর তার গ্রামের বনবাদারে ধুলো ওড়া রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। বোধিসত্ত্ব ঘুরেফিরে সেই কৈশোর যুগে চলে যায়। ' সেই সব মানুষ, আর এইসব মানুষকে নিয়ে আমি কাহিনী লিখবো। মানিককে নিয়ে। মাস্টারমশাইকে নিয়ে। আর এই যে আজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে যাঁরা, যাঁরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের কথা আমাকে লিখতে হবে।'

রাত্রির অন্ধকার কেটে যাচ্ছিলো। ভোরের দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে শেষ রাতের ঘন আঁধার। বীভৎস মরণের গন্ধ নিয়ে যে রাত কলকাতার এই গলির মধ্যে মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো, সেই রাতেরই মধ্যযামে জীবনের পতাকা বয়ে নিয়ে এলো এখানকারই মানুষজন।

তিন

'জিহ্বা মে ভদ্রং বাঙ্‌মহো মনো
মন্যুঃ স্বরাড ভামঃ। মোদাঃ প্রমোদা
অঙ্গুলিরঙ্গানি মিত্রং মে সহঃ॥
বাহু মে বলমিন্দ্রিয়ং হস্তৌ মে
কর্ম বীর্যম্। আত্মা ক্ষত্রমুরো মম॥'

—আমার জিহ্বা কল্যাণরূপ হোক, বাগ্ ইন্দ্রিয় পূজ্য হোক, মন ক্রোধরূপ হোক। ক্রোধ অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করুক। আমার অঙ্গুলিগুলি আনন্দরূপ হোক, অঙ্গ হর্ষযুক্ত হোক এবং আমার মিত্র শত্রুনাশক হোক। আমার বাহুদ্বয় বলযুক্ত হোক, ইন্দ্রিয় কার্যক্ষম হোক, হস্তদ্বয় সৎকর্মকুশল সামর্থ্যযুক্ত হোক, আমার অন্তরাত্মা ও হৃদয় দুর্বলের ত্রাণকারক হোক।'

—যজুর্বেদ

'আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী। কবিও নই, বিপ্লবী যোদ্ধাও নই। যথার্থ প্রেমিক হয়ে উঠতে পারিনি এখনো। পৌলমীর প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝে সাঙঘাতিক পিপাসার্ত হয়ে উঠি। তাঁকে রচনা করার চেষ্টা করি স্বপ্নে, জাগরণে। কিন্তু যখন মানিকের মা আর তার বোনের বুকফাটা কান্না এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, বিশ্বাস করুন! বিপ্লবী যোদ্ধা হবার মতো বুকের পাটা নেই আমার, তবুও আমি দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। রেবতীবাবু বলেন, আমাকে নাকি কিছু কাজ করতে হবে। কি করতে হবে ভাবতে ভাবতেই এখনো দিন আর রাতগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে আমার।'

আধো-অন্ধকার এই যুগের চলে যাওয়া দিন আর রাতগুলো আমার যন্ত্রণাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। এই যন্ত্রণা ভুলে থাকি কি করে! কোথায়ই বা যাবো! এইসব হাজারো চিন্তা নিয়ে আমি আছি। আমি থাকি। কখনো কখনো আমি তলিয়ে যেতে থাকি চেতনার সীমানা পেরিয়ে বহুদূরে। সেখানে কে যায়, কে আসে, তারা কারা? সেইসব মুখগুলো আধো আধো দেখতে পাই। ক্রমশঃ তা স্পষ্ট রূপ নেয়। শুনতে পাই রেলগাড়ির ঘর্ঘর শব্দ। একটা স্টিম ইঞ্জিন একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে বনবাদার, মাঠ পেরিয়ে একটা নদীর সাঁকোর ওপর দিয়ে ছুটেছে। আমিও ছুটি। কেন ছুটি জানি না। যুগবাহিত এ যন্ত্রণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সাঁকোর ওপর চলমান রেলগাড়ি! গুম-গুম শব্দ কানে এসে লাগে। একসময় স্পষ্ট হয়ে আসে সবুজ-সবুজ গ্রামটা। রেল স্টেশনে

যাত্রীদের ওঠানামা থামে একসময়। মাটি কাঁপিয়ে ট্রেন চলে যায়। প্লাটফর্মে আমি দাঁড়িয়ে থাকি একা। একেবারে একা। ফের বুকের ভেতরে যন্ত্রণা বাড়ে। দপ্‌দপানি শুনতে পাই। চারদিকে তাকাই। সবই কেমন চেনা চেনা লাগছে! কোথায় এলাম? বহুদূরে ট্রেনটা রেললাইনের বাঁক ধরে কাত হয়ে ঘুরে যাচ্ছে। গাড়ির হুঁইসিল শোনা গেলো— ভোঁ-ও-ও-ও-ও!

চিরচেনা শব্দ। আমার বুকের ভেতরে সেই শব্দ আকাশ হয়ে গিয়ে বাজতে লাগলো— ভোঁ-ও-ও-ও-ও!

.... আমার বাল্যের, কৈশোরের সেই ভূমিতে পা রাখলাম। সেই পাকা রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। রাস্তার দু'পাশে চেনা চেনা বাড়িঘর। বাঁশঝাড়, চালতাবাগান, গোটা কয়েক সেগুন গাছ, খেজুর আর তালগাছের আগোছালো দাঁড়িয়ে থাকা। এভাবেই একসময় পৌঁছে গেলাম নদীর ঘাটে। যে নদীর নাম ভাগীরথী। নদীর চরেই এই গ্রাম। তাই নাম তার চর সুলতানপুর। দিনের শেষে চর সুলতানপুরের আকাশে ঘন কুয়াশা নেমে আসছিলো। সেই কুয়াশার রহস্যময়তার মধ্যে আমি, বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী, একাকী এক বালক হারিয়ে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি .....

......নদীর বুক থেকে লাল রঙের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে পশ্চিমের বাঁকে সূর্য চলে গেছে। পাখিরা তখন ফিরে আসছিলো ঘরে। বিস্তর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিলো। সেই ডাকাডাকির মধ্যেও ছিলো নানা ভঙ্গি নানা সুর। বেলাশেষে নীড়ে ফিরে এসে তখন তাদের উচ্ছ্বাস জেগেছে। শেষ পর্যন্ত শীতের কুয়াশা আকাশ ঘিরে জাল বিছিয়ে সমস্ত আলো আড়াল করে পৃথিবীকে রহস্যে ঘিরে দিলো। তারপরেও পাখিদের কলরব, কথাবার্তা থামলো না। কারণ ওরা ঘোর সংসারী, তাই কথা ওদের বলতে হয়। এদিকে কুয়াশাও ঘন হচ্ছিলো। তার সঙ্গে হাত মেলালো অন্ধকার। কেননা, আকাশে চাঁদ ছিলো না। ছিলো কৃষ্ণপক্ষ। তারাদের ভিড় ছিলো অজস্র। ভাগীরথীর বুকে জেলে নৌকাগুলোর ছইয়ের ভেতর একে একে লণ্ঠনগুলো জ্বলে উঠছিলো। এক-দুই তিন করে অনেক আলো জ্বললো। মৃদু ঢেউয়ে নৌকাগুলো দুলছিলো। তাই দুলছিলো আলোগুলোও। সবকিছুতেই প্রাণ ছিলো, কুয়াশা হওয়া সত্ত্বেও।

ভাগীরথীর দু'পারে বহু গ্রাম। নদীর তীরে ঘর। তাই মাছ ধরেই এদের দিন চলে যায়। ভালো মাছ উঠলে হাসি মুখ। মাছ ভালো না উঠলে ভারী চিন্তা হয় নদীপাড়ের জেলেদের। এপারে চর সুলতানপুর, মেদগাছি, মালোপাড়া, গোঁসাইডাঙ্গা এমনি আরো কত গ্রাম। ওপারে মেথিডাঙ্গা, শান্তিপুর, সিংহেরগড়, রসুলপুর ইত্যাদি। আজ সন্ধে থেকেই ঘন কুয়াশা গ্রামগুলোর মাথায় চেপে বসেছে। নদীর ওপর কুয়াশা আরো গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। তাই নৌকোগুলোতে জ্বলতে থাকা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো

অস্পষ্টতায় ভাসতে থাকে, দুলতে থাকে। অন্ধকার মানেই অস্পষ্টতা, রহস্যময়তা. না জানা, না বোঝা কোন ব্যাপার-স্যাপার। অন্ধকার মানেই ভয়, গা ছম ছম করা অশরীরী কোন ছায়ামূর্তির হাঁটাচলা। অন্ধকার মানেই অঘটন ঘটানোর উপযুক্ত সময়। সেই জন্য সন্ধে পড়ে যেতে যেতেই যত কুয়াশার বেড়াজাল শক্ত হতে থাকলো, ততই নদীপাড় থেকে প্রাণের স্পন্দন যেন কমে এলো।

তখনই মেথিডাঙ্গা থেকে একটা নৌকোয় মাঝিকে নিয়ে মোট তিনজন মানুষ রওনা দিলো অন্ধকারের দিকে। জলে বৈঠা পড়তে লাগলো ছপাং ছপাং। নৌকা পাড় থেকে তিরিশ হাত দূরে গিয়েই কুয়াশার দারুণ বেষ্টনীতে ধরা দিয়ে হারিয়ে গেলো। জলে বৈঠার শব্দটা পূর্বমুখী, অর্থাৎ ওপারের দিকে এগোচ্ছিলো।

ছপাং-ছপাং-ছপাং-ছপাং। নদীটা ক্রমশঃ কুয়াশা আর অন্ধকারের দ্বিমুখী বলয়গ্রাসের গহ্বরে ঢুকে পড়লো। যেন এক প্রাণহীন জগৎ। নিস্তব্ধতা বুঝি বা সর্বনাশেরই ইঙ্গিত! কিসের সর্বনাশ! কার সর্বনাশ? না হলে সব কিছু হঠাৎ এভাবে থেমে যাবে কেন? সত্যি কথা বলতে কি, নৌকোর মধ্যে বসে থাকা লোকগুলো কেউ কোন কথা বলছে না। শুধুমাত্র মাঝির সারা শরীর আর হাত দু'টো অবিরাম চলছে। বৈঠা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শব্দ হচ্ছে ছপাং। এখন কিন্তু নদীর মধ্যেকার জেলে নৌকাগুলোতে কেরোসিন লণ্ঠনের আলোগুলো দেখা যাচ্ছিলো না। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই নৌকোটা চলে এসেছে মাঝ নদীতে।

ছোট নৌকো। জলে তুমুল স্রোত ছিলো না। একজনই দাঁড় বেয়ে নৌকোটাকে কুয়াশার মধ্য দিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছিলো। অভিজ্ঞ মাঝি। অনায়াস ভঙ্গিতে দাঁড় বাইছিলো। তবুও মাঝির চোখ মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন। এই শীতেও ঘামছিলো। সে কি দাঁড় বাইবার পরিশ্রমে? না কি সাঙ্ঘাতিক উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কায়? এখানকার নদীর চরিত্র সে বোঝে। তাই দাঁড় বাইতে ওকে ভাবতে হচ্ছিলো না। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন সে নৌকোটাকে ডাইনে-বাঁয়ে উত্তরে-পূর্বে করে জায়গামতো নিয়ে যাচ্ছিলো। অন্য দুই আরোহীর মুখ গম্ভীর। চোয়াল কঠিন। এত অন্ধকারেও এরা কোন আলো জ্বালাবার প্রয়োজন বোধ করছিলো না। কেন? অন্ধকারেও নিজেদের .আড়াল করার কী কারণ থাকতে পারে? বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর আরোহীদের মধ্যে একজন কথা বললো।

কিরে গগন, ঠিক যাচ্ছিস তো?

হু।

বেচাল যদি হয়, তোর লাশ নদীতেই ভাসবে।

মাঝির নাম গগন। এ কথার সে কোন উত্তর দিলো না। এই গাঢ় অন্ধকারে তার

চোখ দুটো একবার দপ করে জ্বলে উঠে ফের নিভে গেলো। অসহায়ের মতো সে নৌকো বাইতে লাগলো। আরো খানিকটা এগোবার পর সামনেই মানুষের কথাবার্তা কানে এলো। এবার নৌকোর আরোহী দু'জন ঝট করে উঠে পড়লো। একজন বললো, দ্যাখ, পরেশ দাসের নৌকোটা কোন দিকে আছে।

হ। দ্যাখতাছি।

কাউকে ডাকাডাকি করবি না। চুপচাপ দেখতে থাক।

প্রথম আরোহী কি মনে করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর দুটো হাত চোঙের মতো করে মুখের সামনে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

পরেশ মাঝি! কোন দিকে আছো হে-এ-এ-এ!

এক ডাকেই কাজ হলো। নদীর উত্তর-পশ্চিম কোন থেকে পরেশ দাসের গলা পাওয়া গেলো।

কেডা ডাকো হে-এ-এ-এ। আমি এহানডায় আছি!

গগন মাঝির নৌকো উত্তর-পশ্চিমে ছুটলো। বেশিদূর যেতে হলো না। কুয়াশার মধ্যে পরেশ দাসের নৌকোর লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলো আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে এলো। দেখা গেলো, নৌকোয় পরেশ একা বসে আছে দাঁড় ধরে। নদীর বুকে মাছ ধরার জাল বিছিয়ে দিয়ে আপনমনে একহাতে দাঁড় ধরে রেখে সে বসে বসে বিড়ি টানছে। গগন মাঝির নৌকো পরেশ দাসের নৌকোর গায়ে গিয়ে ঠেকলো। নৌকোর দুই আরোহীকে দেখে পরেশ দাস অবাক।

আরে মজুমদার মশয়! আরে চক্রবর্ত্তী মশয়! আপনেরা? এই ভর সন্ধ্যায় গাঙের মাইঝখানে? কিসের লেগ্‌গা?

শোন পরেশ, তোমার সাথে জরুরী দরকার আছে। সেই জন্য এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতে নৌকো ঠেঙিয়ে তোমার কাছে এলাম।

তা আজ্ঞা করেন আপনেরা। আমার মতো জাউল্যার পোলার লগে আপনেগো কী কাম, আমি বুইঝ্যাই উঠতে পারতাসি না।

তুমি একটু আমাদের সঙ্গে এসো।

অ্যাহন কি কইরা যামু! জাল পাইত্যা দিছি। অ্যাহন ত নড়নের উপায় নাই।

পনেরো মিনিটের ব্যাপার। তোমার নৌকোয় গগন বসছে। চল।

মহা মুশকিলে ফ্যালাইলেন তো আমারে!

কোন মুশকিল নেই। খুব জরুরী না হলে কি তোমাকে ডাকতে আসতাম?

পরেশ দাসের গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। লেখাপড়া জানে। মালোপাড়া, চর সুলতানপুর, মদগাছি এলাকায় এক ডাকে সবাই পরেশকে চেনে। শ্যামবর্ণ এই পেশীবহুল

বিশালদেহী মানুষটার মনটা বড় কোমল। আবার অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াতেও ওস্তাদ পরেশ গগনকে চেনে। তবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। গগনের বাড়ি ওপারে। পরেশ গগনে দিকে তাকালো। গগন মাঝি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরেশ দা বললো, আইচ্ছা। চলেন দেহি। কি আপনেগো কথা। হুনি তো!

পরেশ চলে এলো গগনের নৌকোয়। গগন উঠলো গিয়ে পরেশের নৌকোয় পরেশই সেই নৌকার দাঁড় বেয়ে নিয়ে চললো পারের দিকে। কুয়াশা আর অন্ধকারে গহ্বরে যেই মুহূর্তে নৌকা অদৃশ্য হয়ে গেলো, গগন মাঝি তক্ষুণি ক্ষিপ্র হয়ে উঠলো জালের দড়ি থেকে সে পরেশের নৌকোটাকে আলাদা করে নিয়ে স্রোতের অনুকূলে সেটা ভাসিয়ে দিলো। ভাগীরথীর স্রোত তীব্র নয়। সে নিজস্ব গতিতেই বয়ে যাচ্ছে নৌকাও চললো। গগন এবার বৈঠা হাতে নিলো। তারপরই অস্বাভাবিক দ্রুততা বৈঠা বাইতে লাগলো। নিচে জল আর ওপরে কুয়াশা কেটে কেটে নৌকা চললে তীরের গতিতে। গগন পরেশ দাসের লণ্ঠনটাও নিভিয়ে দিয়েছিলো। পরেশের পেতে দেওয়া মাছ ধরার জাল নদীতে শুধুশুধুই ভাসতে লাগলো। পরেশ কত যত্ন করে জাল পেতেছিলো! এখন তা অবহেলায় ভাসছে। জালে ক'টা মাছ উঠলো কি উঠলো না, খোঁজ নেওয়ারও কেউ রইলো না। মালিকানাহীন পরিত্যক্ত জালগুলো পিতৃহীন অনাথ শিশুর মতো অসহায়ভাবে নদীজলের মধ্যে পড়ে রইলো। পরেশের নৌকোট নিয়ে গগন মাঝি যেন পৃথিবীর শেষ সীমায় চলে গেলো, যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। দুঃখ-ব্যথার, হাসি-কান্নার পৃথিবীর ওপারে, সেখানকার ঠিকানাবিহীন গন্তব্যে এইমাত্র চলে গেলো তাঁরা, যাঁরা খানিকক্ষণ আগেই এই নদীর বুকে শশরীরে দাঁড়িয়ে ছিলো। রাতের দিকে এগিয়ে চললো সন্ধ্যার আঁচল। মধ্যরাত হলো। আকাশে চাঁদ দেখা দিলো। কুয়াশার মধ্য দিয়ে সেই চাঁদের পান্ডুর আলো রাতের রহস্যকে যেন বাড়িয়ে দিলো। নদী ও নদীপাড়ের কোন কিছুই আর স্পষ্ট হয়ে উঠলো না।

সৃষ্টিধর দাসের মেয়ে অঞ্জলি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলো। চর সুলতানপুর গ্রামের মুখে এসে নদী হঠাৎ করে দক্ষিণমুখি ঘুরে গেছে। এখানে ভাগীরথী খুব চওড়া নদী এখানে ধনুকের মতো বাঁকা। স্রোতও বেশি। ভাগীরথী সোজা ছুটে এসে চর সুলতানপুরের বাঁকে সমানে ধাক্কা মেরে মেরে মাটি আলগা করে ধসিয়ে দিচ্ছে পাড় ভাঙছে রোজ। অঞ্জলি দাসপাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলে নদীর পাড়ে বাঁশবাগানের কাছে। বাঁকেব মুখে বাঁশবাগান এখন ঝুলছে। চর সুলতানপুরের উত্তরে, এখন যেখান দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, সেখানে আরেকটা গ্রাম ছিলো। গত সালের বন্যার পর থেকে ভাঙতে ভাঙতে সেই গ্রাম সবটাই তলিয়ে

গেছে নদীতে। সেই গ্রামের নাম ছিলো মঙ্গলা। মঙ্গলার মানুষজন সব চলে গেছে রেল লাইনের ধারে, না হয় পি ডব্লিউ ডি-র পাকা রাস্তার পাশে। এদিকে মঙ্গলাকে শেষ করে সর্বনাশী নদী চর সুলতানপুরে ছোবল মেরেছে। এর মধ্যেই দশ বিঘার একটা কলাবাগান খেয়ে নিয়ে নদী এখন বাঁশবাগানের তলাকার মাটি ক্ষইয়ে দিতে শুরু করেছে। বাঁশঝাড়ের শেকড় মাটির অনেকটা নিচে পর্যন্ত কামড়ে রাখে। তাই স্রোতের ধাক্কা খেতে খেতেও এখনো পর্যন্ত ওটা টিকে আছে। অঞ্জলি ঝুলন্ত বাঁশবাগানটা দেখেই শঙ্কিত হয়ে পড়ছিলো। ও অস্ফুটে বলেই ফেললো, ভগমান! এমনি কইরা গাঙ ভাঙলে আমাগো বাড়িও একদিন ভাইঙ্গা যাইবো! কি হইবো তাইলে! কই যামু আমরা!

এদিকে নদী ছল-ছল-কুল-কুল করতে করতে বয়ে যাচ্ছে। তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। নদীর চলা তো নয়, যেন গান। চলার গান। দুপুর রোদের রূপালি চেকনাই মৃদু ঢেউয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে এগিয়ে চলে। জলের ঝাপটায় লাফিয়ে ওঠা জলকণাতে সূর্যের সাতরঙ মুহূর্তের জন্য চলকে ওঠে। বাহারী সেই রঙের ঠাস বুনন গাঙভরা জলকাঁথায় সেলাই হতে তাকে, গাঁথা হতে থাকে। সূর্য মাথার ওপর থেকে একসময় পশ্চিমে গড়াতে শুরু করে। অঞ্জলি নদীর পাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। অঞ্জলির কি যে হয়েছে! ক'দিন ধরেই ও চুপচাপ। কিছু ভালো লাগে না। তাই ফাঁক পেলেই চলে আসে নদীর ধারে। বিশাল নদীর এই নিঃশব্দ চলার গান ওকে টানে। দিবারাত্র। নিশির মতো। আগে তো অঞ্জলির এমন হতো না! তবে এখন কেন এমন হয়?

দেখতে দেখতে অঞ্জলি বড় হয়ে গেলো। ক'দিন আগেও সে ছিলো একটুখানি এক মেয়ে। খুব রোগা চেহারা ছিলো ওর। বেশ কালো লাগতো। সরু সরু পা দুটো ফ্রকের নিচে ল্যাকপ্যাক করে চলতো। এখন অঞ্জলি বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে। এখন আর ওকে অত কালো লাগে না। বেশ চেকনাই হয়েছে এখন ওর গায়ের রঙ। ও এখন শাড়ি প'রে টিপকলে জল আনতে যায়। ঝমর ঝমর হাঁটে। ঠমক ঠমক ঠাটে। শরীরে বান এসেছে অঞ্জলির। জলভরা কলসী কাঁকে নিয়ে সে যখন বাড়ির দিকে যায়, যোয়ান ছেলেগুলো হা করে তো দেখেই, বুড়োরাও তেরচা চোখে চট করে দেখে হঠাৎ নির্বিকার হয়ে যায়। চুলের ঢল নেমেছে মেয়েটার মাথা থেকে। কাঁচা অঙ্গের লাবণ্য ছড়ায় সৃষ্টিধরের মেয়ে অঞ্জলি দাস।

এই তো ক'দিন আগের কথা। অঞ্জলি ভাবে, সে এত কথা সেদিন বললো কী করে! আশ্চর্য হয়ে যাবার কথা বৈকি! রোজকার মতো সেদিন বিকেলে টিপকল থেকে কলসী করে জল নিয়ে ও বাড়ি যাচ্ছিলো। মুখুজ্যেপাড়ায় রমাকান্ত মুখুজ্যের ছেলে বিলাস রাস্তায় ধরেছিল ওকে। সেদিনকার কথা মনে পড়লে অঞ্জলি আজও শিউড়ে

ওঠে। ও ভোলেনি। সবটাই ঘুরে ফিরে মনে আসে ওর। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো বিলাস বলেছিলো, দাঁড়া অঞ্জলি, তোর সঙ্গে কথা আছে।

কি কথা?

দাঁড়া! তবে তো শুনবি! বলে বিলাস ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। বিলাস ভালো ফুটবল খেলে। বেশ তাগড়াই চেহারা। অঞ্জলির সামনে একেবারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

পরশু দিন হাইস্কুলের মাঠে আমাদের ফুটবল ম্যাচ আছে। যাবি?

ক্যান যামু?

যাবি। আমি খেলবো, দেখবি।

যামু না।

কেন যাবি না?

ওইসব বল খেলা আমার ভালো লাগে না।

ঠিক আছে। যাস না তা হলে। কালকে সন্ধ্যাবেলা কলপাড়ে আসিস। তোর সঙ্গে ক'টা কথা আছে।

আমি আইতে পারুম না। সরেন। আমি বাড়ি যামু। বলেই বিলাসের পাশ কাটিয়ে অঞ্জলি বাড়ির দিকে দৌড় দিয়েছিলো। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো অঞ্জলি। ভীষণ ভয়। দাওয়ায় কলসী নামিয়ে রেখে ও পৌষের শীতেও হাঁফাচ্ছিলো। ওর ভরা বুক দু'টো হাপড়ের মতো ওঠানামা করছিলো।

সেদিন থেকেই অঞ্জলি একটু একটু ক'রে বদলে যেতে শুরু করলো। ওর ছটফটানি কমে গেলো। এ যে এক সর্বনাশের ইঙ্গিত। যা তুষের আগুনের মতো ওর বুকের ভেতরটায় জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। অঞ্জলি এখনও গাঙপাড়ে বাঁশবাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ পৌষের দুপুর এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। সূর্যের তেজ নেই। দিন ছোট। আর একটু পরেই শীতের বিকেল চলে আসবে কাঁপুনি দিয়ে। নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কনকনে বাতাস বুকের পাঁজরায় গিয়ে ধাক্কা মারবে। কাঁপন ধরিয়ে দেবে সারা শরীরময়। বেলা পড়ে যাচ্ছে। অঞ্জলির খেয়াল নেই। চরাচরের সব কিছু যেন ভুলে গেছে ও। ওর মনের মধ্যে এখন হাজারো কথা উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো। ভরা গাঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অঞ্জলি বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দূরে রেললাইনে একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে। ট্রেনের বাঁশির শব্দটা কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে ভেসে এসে নদীর পাড়ে অঞ্জলির কানে বড্ড করুণ সুর শুনিয়ে গেলো।

স্টেশন বাজারে মাছ বিক্রি করে মানিক। রেলের বাঁশির শব্দে অঞ্জলির মনে পড়লো মানিকের কথা। মানিক এখন নিজেই নৌকা নিয়ে ভরা গাঙে মাছ ধরতে যায়।

মানিকদের বাড়ি অঞ্জলিদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরো দু'টো বাড়ির পরেই। যখন নদীতে উথাল পাথাল ঢেউ ওঠে, অঞ্জলির মনটা ফাঁপড় ফাঁপড় করে তখন। মানিক গেছে গাঙে, মাছ ধরতে। এখন হয়তো ওর নৌকোটা খেলনার মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠছে নামছে। অঞ্জলির মনটা তখন খা-খা করে ওঠে। এইসব নানা চিন্তা অঞ্জলিকে আজকাল ভারী জ্বালায়। বিরক্ত করে মারে। অঞ্জলি শুনেছে, মানিক এখন ভালোই রোজগার করে। অঞ্জলি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে, দাঁড় বাইবার সময় মানিকের হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। মুখটা কেমন কঠিন হয়ে যায়। বিকেলে পশ্চিমে নদীর জলকে লাল রঙে গুলে দিয়ে সূর্য যখন পাটে যায়, মানিকরা তখন ভেতর নদী থেকে পারে চলে আসে। রূপোর মতো চকচকে পুঁটি, বোয়াল, ফলি, ভোলা, পাঙাশ কিংবা দু'চারটে ইলিশ নৌকোর গলুইয়ে দেখা যায়। মানিক গলুই থেকে মাছগুলো ডাঙ্গায় তোলে। তারপর বেতের ঝুড়িতে রাখে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে মানিক মাথায় চুবড়ি নিয়ে রেল স্টেশনের মাছবাজারের দিকে হাঁটা দেয়। ওর বাবা নৌকোয় গোছগাছ করে। অঞ্জলি চর সুলতানপুরের ঘাটের সামনে বড় অশ্বত্থগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দু'একদিন দেখেছে এইসব কিছু। এইসব নানা কথা বর্ষার দিনভর টিপ-টিপ বৃষ্টির মতো অঞ্জলিকে অস্থির করে রাখে।

অস্থির করেছে ওকে বিলাসও। শুধু অস্থির নয়, বিলাস ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বিলাস ভারী অসভ্য। কেমন করে যেন তাকায়। গিলে খেতে চায় যেন ওকে। বিলাসকে রাস্তায় দেখলেই অঞ্জলির অসোয়াস্তি হয়। তাড়াতাড়ি করে শাড়ির আঁচলে ও ওর বুক পিঠ ঢেকে ফেলে। তবে তাকদ আছে বিলাসের। দারুণ ফুটবল খেলে। কলাগাছের গোড়ার মতো ওর থাইগুলো। একাই সারা মাঠ দাপিয়ে খেলে। অঞ্জলি ওর ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন স্কুলমাঠে ফুটবল খেলা দেখেছিলো। ও একটা ডাকাইত। পাজি। রাইস্কস! দুই চোহে দ্যাখতে পারিনা অরে! অস্ফুটে এই কথা বলতে বলতে অঞ্জলি চোখমুখ কোঁচকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে। আবার হাসিও দেখা যায়। কি এক আনন্দে ওর ভরা শরীরটা দুলে ওঠে। নদীর মতো ঢেউ খেলে যায়।

অঞ্জলি যখন এইসব কথা ভাবছে, ঠিক তক্ষুণি বাঁশবাগানের একটা বাঁশ ঝাড় নিয়ে বিরাট এক মাটির চাঙড়, পাড় থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো। খুব ধীরে ধীরে চাঙড়টা কাত হতে আরম্ভ করলো। একসময় প্রচণ্ড শব্দ করে নদীতে ভেঙে পড়লো সেটা। বহু উঁচু পর্যন্ত জল ছিটকে উঠলো। অঞ্জলি কেঁপে উঠলো সেই শব্দে। এক অজানা আশঙ্কায় ওর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেলো। হঠাৎই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলো। আকাশের দিকে তাকালো অঞ্জলি। এক টুকরো কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে। হয়তো বা অল্প সময়ের জন্য। বহুদিন ধরে ছুটে আসা নদীর স্রোতের

ধাক্কা রুখে যাচ্ছিলো বাঁশবাগানটা। আজ অঞ্জলির সামনেই তার ভাঙন শুরু হলো। চর সুলতানপুরের আকাশে তখন সেই একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করে ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। ছায়াচ্ছন্ন নদীতে, ঠিক যেখানটায় একটু আগে পাড় ভেঙে পড়লো, ঠিক সেইখানটায় নদীজল সাঙ্ঘাতিকভাবে পাক দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কাদাগোলা ভারী জলে ঘূর্ণি লেগেছে। একের পর এক ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে জলে। অসম্ভব উথাল পাথাল চলতে লাগলো সেখানটায়। ভয়ানক ভবিষ্যতের চিন্তায় অঞ্জলি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো। ও মনে মনে বলছিলো, খাইবো। গাঙ এইবার আমাগো গেরামডারেও খাইবো।

পার থেকে ওঠা জলঘূর্ণিগুলো ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে মাঝনদীতে চলে যাচ্ছে। ঘোর লাগা মানুষের মতো অঞ্জলি দেখছিলো সব। হঠাৎ—

ওইডা কী?

অস্ফুটে চিৎকার করে উঠলো অঞ্জলি। একটা মানুষের শরীর স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এসে ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেলো। পড়ে গিয়েই ওলোট-পালট খেতে শুরু করেছে শরীরটা। একবার মাথাটা উঠছে। একবার পায়ের দিকটা উঠছে। কখনো চিৎ, কখনো উপুড়। অঞ্জলি মুখটা দেখার চেষ্টা করলো। ঘূর্ণির মাথায় চলে এসেছে ওই লাশটার সামনের দিক। ও এক পলকেই মুখ দেখে নিয়েছে। একি সর্বনাশ! অঞ্জলি চিনতে পেরেছে।

অঞ্জলি দৌড়োতে শুরু করেছে। বাঁশবাগান পেরিয়ে রাস্তা ধরে ছুটলো অঞ্জলি। পাগলের মতো। ওর শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছিলো। বিশ্বাসদের বাড়ি পেরিয়ে শেতলা মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটলো অঞ্জলি। উল্টো রাস্তা দিয়ে মানিক আসছিলো মাছ ধরার জাল আর দড়িদড়া নিয়ে। অঞ্জলিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখে মানিকও অবাক।

কি রে অঞ্জলি! কি হইছে? দৌড়াস ক্যান? কি হইছে?

অঞ্জলি বিস্রস্তবাসা। বুকের আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। চোখ উদ্‌ভ্রান্ত। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। কি একটা যেন বলতে চেষ্টা করলো অঞ্জলি। কিন্তু মুখ দিয়ে কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া কিছুই বের হলো না। ভারসাম্য হারিয়ে ও পড়ে যাচ্ছিলো। হাতের দড়িদড়া, জাল ফেলে দিয়ে মানিক দ্রুত ওকে ধরে ফেললো। অঞ্জলির শরীরটাকে দুহাতে জাপটে ধরে কেঁপে উঠলো মানিক। মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্বস্তিতে পেয়ে বসলো ওকে। অঞ্জলি ওর সুন্দর চোখ দুটো সামান্য তুলে চাইলো মানিকের দিকে। মানিক আবার কাঁপলো। তবুও অস্বস্তি কাটিয়ে মানিক কথা বললো

কি হইছে রে? তুই ভয় পাইছস?

গাঙের জলে আমাগো পরেশ দাদার মড়া শরীলডা ভাসতাছে গো মানিকদা! এখনই যাও। লোকজন ডাকো! আমার বাবারে ডাকো। আমি আর পারতাছি না গো! আমি আর পারতাছি না!

কথাটা শুনে মানিক চমকে উঠলো। বললো, কস কিরে অঞ্জু! পরেশদার মড়া! ঠিক দ্যাখছস তো!

ভগমান, আমার য্যান ভুল হয়। আমি য্যান ভুল দেহি। তোমরা যাও। গাঙপাড়ে যাও!

মানিক অঞ্জলিকে ছেড়ে দিলো। কী করবে সে! ভেবে পাচ্ছিলো না। অঞ্জলি হাউ হাউ করে কাঁদছে। ওর কান্না শুনে জেলেপাড়ার দু'একটা ঘর থেকে লোকজনও বেরিয়ে এসেছে। —এই দুফর বেলায় মাইয়াডা কান্দে ক্যান? বলতে বলতে সৃষ্টিধর দাসও ছুটে এলো রাস্তায়।

খবরটা শুনলো সবাই। গ্রামকে গ্রাম ছড়াতে লাগলো খবরটা। চর সুলতানপুরের জাউল্যার ব্যাটা পরেইশ্যারে কাইল রাত্রি থিকা খুঁইজ্যা পাওয়া যাইতাসিলো না। আইজ দুপরে অর লাশ নাহি ভাইস্যা উঠসে গেরামের বাঁশবাগানের কাছে গাঙের মইধ্যে। গ্রামকে গ্রাম শোরগোল উঠলো। চর সুলতানপুর, মেদগাছি, মালোপাড়া, মেথিডাঙা, সব জায়গায় খবরটা যেন ইথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে দৌড়োতে লাগলো। আমাগো পরেইশ্যারে ক্যারা য্যান খুন করসে! মাথাডারে দুই ফাঁক কইরা ফ্যালাইসে। পরেশ ওদের বড় আপনার জন। এই খবরে ওরা থমকে গেলো। ভাগীরথীর পাড়ে এইসব জেলে গ্রামগুলোর গরিব জেলেদের কাছে বড় দুঃসংবাদ এটা। ওদের অস্তিত্বের এক বড় খুঁটি নড়বড়ে হয়ে গেলো। পরেশ দাস নাই। পরেশ দাস নাই ক্যান?

...পরেশ কথা বলছিলো নদীর সঙ্গে। নদীতে ওর মুখটা ডুবে ছিলো। ভাগীরথী, রাক্ষুসী। কত লোকের চাষের জমি, বসত বাড়ি খেয়ে নিয়েছে, কে তার হিসাব রাখবে! কিন্তু আর এক দিকে ভাগীরথী অন্নদাত্রী, মা। এই ভাগীরথীর বুকে নৌকা নিয়ে মাছ ধরে এই সব গ্রামের শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। বাপ-ছেলে-নাতি অনেকেরই দিনমান চলে যায় নৌকায়। কত পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভাগীরথী। সেই নদীর বুকে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পরেশ। মনের সমস্ত কথা শেষ করে দিতে চাইছে জাউল্যার ব্যাটা। ও নদীর সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলছে সর্বনাশী মায়ের সঙ্গে। না কি ও পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে মায়ের কোলে! যেই মা স্তন্যপানে আর উষ্ণ করতলের নিবিড় স্পর্শে শিশুটিকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলো। অস্ফুট আধো আধো বুলি

আর মন ভোলানো খিল খিল হাসিতে যে মায়ের বুক আনন্দে ভরে যেতো, শিহরণ জাগতো। সেই মায়ের কোলেই বুঝি পরেশ শুয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে। হয়তো বা আধো আধো বুলিতে বোঝাতে চাইছে তার দুঃখ-সুখের কথা। যে মায়ের কোলে তৈরি হতো শিশুর ছোট্ট বাসা। নীড়। আশ্রয়। পরেশ ফিরে যাচ্ছে সেই আশ্রয়ে। ...মা! কাইল রাত্তির থিকা আমি কত কথা শুনতাছি। তার কোন শব্দ নাই। কিন্তু হগ্‌গলই বুজতে পারি। কেমুন য্যান সব স্বপ্ন স্বপ্ন লাগতাছে আমার। আমার সারা শরীলে মরণের গন্ধ। এই পৌষ মাসের বিকালে খেজুর গাছের গোড়ায় দাঁড়াইলে রসের গন্ধে ম' ম' করে। গ্যান্ধা ফুল, নাইলে গন্ধরাজ ফুলের কড়া গন্ধ তো এই শীতকালেই পাইতাম। এখন তো সেই গন্ধ আমি পাই না! আমার কাছে কেউ নাই মা। আমি একা। হগ্‌গলে গ্যালো গিয়া আমারে ফ্যালাইয়া থুইয়া। আমি কি তোমার কাছে আছি? না কি নাই? কিসুই যে বুজতে পারতাসি না মা! ক্যান এমুন হইলো? আমার মাথাডায় সাড় নাই।। মাথাডা ফালা হয়য়্যা গ্যাসে। মরণডা কেমুন কইরা মাথায় আইয়া আছড়াইয়া পড়লো। কেমুন কইরা? আন্ধার ছিলো। কুয়াশা ছিলো। টিপটিপ কইরা ওশ পড়তাসিলো গায়ে। অরা আমারে ডাইক্যা নিয়া গ্যাল। আমি তো খারাপ কিসু করি নাই! জাউল্যাগ তো বছর ভইরাই দুর্দিন। ঠিকমতো পোলাপানগুলারে ভাতও দিতে পারে না। ভাল মাছগুলান তো বড়লোকেরা খায়। জাউল্যার পোলা-মাইয়ারা তো হেই পচা-ধচা হুটকা মাছগুলান খাইয়া অসুহে ভুইগ্যা খ্যাংরা কাঠি হয়য়্যা যায়। জাউল্যাগ পোলাপানের লাইগ্যা আমার দুঃখ হইতো মা। তাই অরা আমারে নৌকা থিকা ডাইক্যা নিয়া গেলো। মা, অ্যাখন তো আমি শুধু তোমারই লগে কথা কইতাসি। শুধু তোমার লগে। ......

কোনো কোনো সময় থাকে ভারী দুর্ভাগ্যে ভরা। গতকাল রাত্রিটা ছিলো তাই। নদীর দক্ষিণপাড় যখন ভাঙছিলো, উত্তরে মেথিডাঙায় চরা পড়ে ডাঙা যাচ্ছিলো বেড়ে। সেই ডাঙায় গ্রীষ্মকালে তরমুজ, ফুটি আর কাঁকুরের ক্ষেতে প্রচুর ফলন। এখন শীতকালে উচ্ছে, পালঙ আর মুলোর চাষ হয়েছে অনেক। সর্ষেক্ষেতগুলোয় ফুল ধরেছে। হলুদে হলুদ চতুর্দিক। কিন্তু এদিকে বছরখানেক হলো ভাগীরথী গতিপথ বদলেছে। মেদগাছি আর মেথিডাঙ্গার মধ্যে এক বিরাট চর জেগে উঠেছে। পূর্ব দিকে মুখ করে নদী সাগরমুখি ছুটেছে। ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ায় স্রোতও গেছে বেড়ে। মাঝখানে চরে ধাক্কা খেয়ে নদী ফুঁসতে ফুঁসতে বাঁ দিকে মেথিডাঙার সদ্য গজিয়ে ওঠা চরে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে। এবার ভাঙছে মেথিডাঙা। আর ভাগীরথীর মাঝখানে শক্তপোক্ত হয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছে নতুন করে ডাঙা অঞ্চল। তাই মেথিডাঙার আজ ভারী দুর্দিন। মেথিডাঙার তাঁতীপাড়ার বসতিগুলো এরই মধ্যে উঠে গেছে পাকা রাস্তার

পাশে। মেথিডাঙা ক্রমশঃ জনহীন হয়ে পড়েছে। মেথিডাঙার বড় দুর্ভাগ্য এইজন্য, গত রাতে মেথিডাঙা চরের এই উচ্ছেক্ষেতের পাশে পরেশ দাসকে নিয়ে নেমেছিলো আরো দুজন মানুষ। তারা ছিলো ভদ্রলোকের মতো দেখতে। ঘন কুয়াশায় চেনা যাচ্ছিলো না কাউকেই। দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারের মধ্যে আরো পাঁচজন ষন্ডা চেহারার লোক চলে এলো। ওরা ঘিরে ধরলো পরেশকে। এসব দেখে হকচকিয়ে গেলো পরেশ। ও বিপদের গন্ধ পেলো। অন্ধকারে পরেশ কারুরই মুখ দেখতে পাচ্ছিলো না। তবে ও দেখার চেষ্টা করছিলো। বুঝে নেবার চেষ্টা করছিলো। ও শুধু বললো, চক্কবর্ত্তী মশয়, কী কামের কথা আছে কইলেন? কন, হুনি।

মজুমদার আর চক্রবর্তী, দু'জন তখন চলে গেছে পেছনে। অন্ধকারে। ওরা ঘটনার সুতো ধরে রইলো শুধু। যমদূতের মতো সেই পাঁচ ষন্ডা চেহারার লোক ঘিরে ধরলো পরেশকে। একটা ঝাঁঝালো অসহিষ্ণু গলা পাওয়া গেলো।

জরুরী কথাগুলো আমরাই বলবো।

আপনেরা কারা? আপনেগো তো আমি চিনি না!

চেনার দরকার নেই। গোপাল রাজবংশীর সঙ্গে তোর কতদিন ধরে সাঁট চলছে?

আমার লগে কারুর কোন সাঁট নাই।

অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা! পরশুদিন রাণাঘাট স্টেশনে দুপুরবেলা তুই ওর সঙ্গে কথা বলিসনি! শকুনের চোখ আমাদের। সব দেখতে পাই।

রাস্তায় দেহা হইছে। কথা কইছি। দোষডা কিসের?

ওসব নকরাবাজি ছাড়। বল্ শালা, গোপাল এখন কোথায় থাকে?

ওইসব জাননের আমার কাম নাই।

তুই সব জানিস! বল্ বল্! গোপাল কোথায় থাকে? না হলে তোকে ছেঁচে ফেলবো! শশালা..........

এবার পরেশ রুখে উঠলো। খপদ্দার, গাইল পারবি না!

সঙ্গে সঙ্গে পরেশের বাঁ কান ঘেঁষে সাঙ্ঘাতিক একটা ঘুসি আছড়ে পড়লো। সেই অন্ধকারে পরেশের চোখের সামনে আরো অন্ধকার নেমে এলো। ডান কাত হয়ে সে মেথিভাঙা চরের উচ্ছেক্ষেতের বুকে পড়ে গেলো। ওর কান দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগলো। তরল আগুনের মতো গরম সেই রক্ত।

শালা জেলের বাচ্চা! জেলের বাচ্চার মতো থাকবি। মুখ তুলে কথা! লিডার হয়েছিস খানকির ছেলে! দল মারাচ্ছিস! ছোটোলোকের বাচ্চা ছোটলোকের মতো থাকবি! বল্, গোপাল রাজবংশী এখন কোথায় থাকে?

এই বলে পরেশের চুলের মুঠি ধরে একজন ওকে দাঁড় করিয়ে দিলো। পরেশ

শক্তিমান ছেলে। প্রথম আঘাতের ধাক্কা ও সামলে নিয়েছিলো।

বল। বল শ্‌শলা! গোপাল রাজবংশী কোথায় আছে!

আমি জানি না।

চুকলিখোরের বাচ্চা! জান না তো ওর সঙ্গে অত পীরিত মারাচ্ছিলে কেন? জান না ও মিসার আসামী! গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে!

পরেশ দাস চুপ করে রইলো। পরেশ ভীতু ছেলে ছিলো না কোনোদিনই। কিন্তু আজ বড় বেকায়দায় পড়ে গেছে। জাউল্যার ব্যাটা পরেশ। নদীর তীরে, স্টেশন বাজারে, মাছের আড়তে পরেশ দাস সব সময় জেলেদের বিপদের সময় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর ভয়ে আড়তের মহাজনরা জেলেদের ঠকাতে পারে না। কমার্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে পরেশ কালনা কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। মাসখানেক ক্লাসও করেছিলো। কিন্তু সেইসময়ই কালনায় খুনোখুনি শুরু হয়ে গেলো। উনিশশো একাত্তর সালের দোসরা জুলাই কালনা স্টেশনের টিকিট মাস্টারের ঘরে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হলো একজন বড় বামপন্থী নেতাকে। তারপর একদিন ছাত্র ইউনিয়নের অফিসঘরে ওর ডাক পড়লো। পরেশ ইউনিয়ন রুমে ঢুকে দেখলো, যে ক'জন ঘরে আছে, একমাত্র জি এস বাদে কেউ কলেজের ছাত্র নয়। প্রত্যেকেরই গুন্ডা গুন্ডা চেহারা। দেওয়ালের মাথায় মহাত্মা গান্ধীর ছবি। নিচে চেয়ারে বসে আছে জি এস।

তোর বাড়ি চর সুলতানপুরে?

হুঁ।

গোপাল রাজবংশীকে চিনিস?

না।

যাকগে। শুনে রাখ। তুই কাল থেকে আর কলেজে আসবি না। খবর আছে, তুই ইনফর্মার। চর সুলতানপুরের সব শালা হারামি। কাউকেই বিশ্বাস করি না। আর যদি তোকে কালনায় দেখি, জানিস তো? কালনা স্টেশনে তোদের লিডার মহাদেব ব্যানার্জিকে কেটে কুচি কুচি করা হয়েছে। তোকেও তাই করা হবে। যা!

মহাদেববাবু ওদের লিডার ছিলো কিনা পরেশ জানে না। তবে সেদিন থেকে ও আর কলেজে যায়নি। কলেজে না গেলেও পরেশ ওর বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি আর বিবেক দিয়ে নদীপাড়ের জেলেদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আড়তের মহাজনরা জেলেদের থেকে প্রতি কেজিতে দু'শো গ্রাম মাছ বেশি নিয়ে নিতো। আবার ট্রাকে আসা চালানি মাছ ওজনে কম দিতো। জেলেরা লাভ আর দেখতো না। এইসব ঠকবাজি সব পরেশ ধরিয়ে দিয়েছিলো। পরেশ নদীপাড়ের সব জেলেদের কাছে কবে যে 'পরেশদাদা' হয়ে উঠেছিলো, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু যাদের হাতের মুঠি আলগা হয়ে

যাচ্ছিলো, তারা আর দেরি করলো না। রাতের অন্ধকারে ওরা পরেশকে ফাঁদে আটকে দিলো।

বামন হয়ে চাঁদে হাত! আড়তে গিয়ে লিডারগিরি! বল শালা গোপাল কোথায় আছে! তুই সব জানিস! নইলে তোর মা'কে—

মায়ের নামে অশ্রাব্য গালাগাল কানে যাওয়া মাত্র জাউল্যার ব্যাটা পরেশের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। ওর কানের পর্দা ফেটে গিয়েছিলো। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিলো। এবার ওর মাথা আগুন হয়ে উঠলো। সামনের লোকটার পেটে লাথি চালিয়ে দিলো পরেশ। বাঁ পাশের লোকটাকে দু'হাত জোড়া করে সপাটে আঘাত করলো। সিংহের মতো শক্তি পরেশের। দু'জনই পড়ে গেছে মাটিতে। অপ্রত্যাশিতভাবে ফাঁদে পড়া শিকারের হাতে মার খেয়ে ক্ষিপ্ত আততায়ীরা এবার মরণ কামড় দিলো। তৃতীয় জনের হাতে ছিলো একটা লোহার রড। সে পরেশের পেছন থেকে সরাসরি সেটা পরেশের মাথায় বসিয়ে দিলো। পরিষ্কার দু'ভাগ হয়ে গেলো পরেশ দাসের মাথা। মিনিটখানেক দাপাদাপি করে মেথিডাঙ্গার চরে উচ্ছেক্ষেতের মধ্যে মরে গেলো পরেশ। বড্ড তাড়াতাড়ি পরেশ দাস মরে গেলো। আততায়ীরা হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ওর দেহটা টেনে এনে নদীতে ফেলে দিলো।

...পরেশ দাস মুখ ডুবিয়ে সেই নদীর সঙ্গে এইসব কথাই বলছিলো। উপুড় হয়ে থাকা পরেশের শরীরটা এখন পাড়ে এসে ঠেকেছে। মৃদু ঢেউয়ে শরীরটা দুলছিলো। ততক্ষণে চর সুলতানপুরে ভাগীরথীর তীর ধরে কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে ওদের পরেশদাদাকে দেখবার জন্য।

চার

'ক্রিটো জিজ্ঞেস করলেন, হে সক্রেতিস, কিভাবে তোমাকে কবরস্থ করবো? সক্রেতিস বললেন, যেভাবে খুশি। কিন্তু তার আগে আসল আমি কে, ধরতে হবে। বৎস ক্রিটো, আনন্দ কর এই ভেবে যে, তুমি আমার দেহটাকেই শুধু সমাধিস্থ করছো। আমাকে নয়। এবং সেটাকে নিয়ে যা প্রচলিত প্রথা, এবং যা তুমি ভালো বুঝবে, তাই করবে।'

কি রে! তোর তীর্থযাত্রার নীট ফল কি হলো, বুধ?

ন্যাপলার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে চায়ের গ্লাসে চুমুক মেরে বোধিসত্ত্বকে প্রশ্ন ছুঁড়লো সজল।

ঘুরলাম। মেলা দেখলাম। এই পর্যন্তই। বেশ খানিকটা ধোঁয়াশা পকেটে পুরে নিয়ে এসেছি।

কেন রে! দেখার কিছু খুঁজে পেলি না? কয়েক লাখ পাগল তো প্রত্যেক বছর ওই জব্বর ঠাণ্ডায় ওপারের কড়ি জোগাড় করতে যায়। তুই সেখানে বৈচিত্র্য পেলি না! এটা একটা কথা হলো?

আরে বাবা, বৈচিত্র্য সব জায়গাতেই আছে।

লেখক মানুষ কি দেখলো না দেখলো, সব কি তোকে বলে দেবে? তবে লিখবে কী! রেখে ঢেকে না রাখলে মার্কেটে নয়া মাল ছাড়বে কি করে?—মন্তব্যটা গোরার।

হুঁ, গোরা আমাদের ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসার ছকে ফেলে সাহিত্যের বিচার করতে বসে গেছে। বিকাশরঞ্জন ফোড়ন কাটে।

বোধিসত্ত্ব হাসে মিটিমিটি। সেই হাসিতে একটা বিষণ্ণতা লেগেই থাকে। তবুও বোধিসত্ত্ব শেষ পর্যন্ত মন্তব্য রাখলো একটা। বললো, গোরা হয়তো সিরিয়াসলি ব্যাপারটা বলেনি। তবে কথাটা ফ্যালনা নয়। লেখালিখির জগতে ফরমায়েশি সাহিত্য কথাটাও চালু আছে। সে সব লেখকরা হিসেব কষেই লেখেন। খবরের কাগজ কোম্পানির ফরমাইশ মতো, যা মার্কেটে চলবে ভালো, এমন বিষয়টিষয় বেছে নেন।

তুই যাই বলিস না কেন বুধ, সেইসব লেখকদেরই বাজারে নাম-ডাক বেশি। তাঁদের লেখা পড়তে আমারও খুব ভাল্লাগে। আর যদি বলিস ভাই, সত্যি কথা বলি। ওই তোদের বিপ্লবী মার্কা আঁতেলদের লেখা গল্পই বল, আর কবিতাই বল, আমি কিস্স্যু বুঝি না।

কথাটা বললো বিকাশ। বিকাশরঞ্জন রায়চৌধুরী। সে বনেদী বড়লোক পরিবারের ছেলে। অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স নিয়ে জয়পুরিয়া কলেজ থেকে বি-কম পাশ করার

সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি পেয়ে গেছে ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে। এই ব্যাঙ্ক পরে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো।

তুই বুঝবি কি করে? একটা চাকরি জোগাড় করতে তো আর তোর জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়নি! পিতৃদেবের এক টেলিফোনেই পুত্রের চাকরি। জীবনযন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলে তবেই ওসব লেখা মগজে গিয়ে পৌঁছোয়। নচেৎ নয়।

বোধিসত্ত্ব দীপুর দিকে তাকালো। এই হচ্ছে দীপঙ্কর ব্যানার্জি। পাথর-চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে চেহারা। দীপু উদোম তর্ক চালিয়ে যায় সবরকমের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে। প্রখর উজ্জ্বল তাঁর চোখ। মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল, ডারউইন, ব্রেখ্ট, চার্বাক সর্বত্র তাঁর আনাগোনা। ফ্রয়েড কিংবা ইয়ুংয়ের বিশ্লেষণে সে পথচলতি লোকজনের চরিত্র বিচার করতে বসে যায়। ইতিহাস নিয়ে এম এ পড়েছে। অনেকের দরজায় গেছে। চাকরি জোটেনি আজও ওর। এ ব্যাপারে ওর মন্তব্য, ও সব স্যুটেড-বুটেড কুকুরছানাগুলোর লেজ নাড়া স্বভাব বুঝে ফেলি বলেই কেউ আমাকে চাকরি দেয় না।

গোরা। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ফেল করে গোরাচাঁদ কুন্ডু দ্বিতীয়বার আর স্কুলমুখো হয়নি। দু'একবছর চাকরির চেষ্টা করতেই ও বুঝে গিয়েছিলো, কেউ তাকে চাকরি দেবে না। ওর উপলব্ধির কথা বোধিসত্ত্বর কাছে কখনো গোপন করতো না। এই টালমাটাল সময়ে, যখন তরুণ যুবকদের মৃত্যুর মিছিল চলছে, তখন বাস্তববাদী গোঁরাচাদ বুঝে নিয়েছিলো, কী তার করা উচিৎ। কীই বা সে করতে পারে। সে বলেওছিলো একদিন, বুঝলি বুধ, নেতারা আমাদের হাতে বোমা ধরিয়ে দিয়ে মস্তান বানাতে চাইছে। যেদিন কুমোরটুলি পার্কে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বক্তৃতা দিয়ে গেলো, সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সবাইই কংগ্রেস করতো। আর, এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখলাম ছেলেগুলো কোন যাদুমন্ত্রে নকশালপন্থী হয়ে গেলো। কোথা থেকে গাদা গাদা টাকা আসতে লাগলো। একদিন রাত বারোটা নাগাদ কংগ্রেসেরই সেইসব ছেলেরা সি পি এম-এর পার্টি অফিস ভেঙে ছত্রখান করে দিয়ে এলো। শ্লোগান দিলো, নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ। হাতে তাদের বোমা পাইপগান। সি পি এম-এর ছেলেরা সব পালিয়ে গেলো পাড়া থেকে। কয়েকদিনের মধ্যেই সি পি এম-এর লোকাল নেতা দিলীপদাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে, খুন করে, শরীরটা টুকরো টুকরো করে ফেললো। বাক্সবন্দী টুকরো দেহটা পাওয়া গেলো রাণাঘাট স্টেশনে, ট্রেনের মধ্যে।

গোরা বলেছিলো, বুঝলি বুধ, আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। ওরা সব আমার বন্ধু ছিলো। সাতদিনের মধ্যে নকশালপন্থী রাজনীতি করবে, এমন কোন চিন্তাভাবনা ওদের মধ্যে ছিলোই না। আমার মনে হলো, উঁচু থেকে কেউ না কেউ এদের দিয়ে

খুনখারাপি, বোমাবাজি করিয়ে নিচ্ছে। যারা ভালো ছেলে ছিলো, তারা সব মস্তান হয়ে গেলো। কতগুলো দাগী আসামীও দেখলাম, এই দলে ভিড়ে গেল। পাড়াটা চলে গেলো সেইসব মস্তানদের হাতে। আমি যা বুঝলাম তা বুঝলাম। সাবধানে ওদের সঙ্গ ত্যাগ করলাম।

বোধিসত্ত্ব আরো পরে গোরার কথাগুলো মিলিয়ে নিয়েছিলো। সেদিন গোরা কথাগুলো ভুল বলেনি। ওর অনুমান মোটের ওপর ঠিকই ছিলো।

গোরা এখন নিজের চেষ্টায় রেডিমেড জামা-কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। থাকে লালবাগান বস্তিতে। দীপঙ্কর, গোরা, বোধিসত্ত্ব, সজল, বিকাশ—এরা একই সময়ে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়তো। তখন থেকেই বন্ধুত্ব। এদের মধ্যে গোরাই একমাত্র স্কুলের গন্ডি পেরোয়নি। দীপঙ্কর ইতিহাসে, আর বোধিসত্ত্ব বাংলায় এম এ। বিকাশরঞ্জন বি কম, আর সজল বি এ পাশ করে গেছে। দীপুর কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলো বিকাশ।

নে, নে! তোর অনেক বাতেলা শুনলাম। তোরা তো সব স্যাডিস্ট। আনন্দ খুঁজে নিতে হয়, বুঝলি! হা-হুতাশ করে দিন কাটাবো কেন?

আসলে কি জানিস! তোর মতো লারেলাপ্পা সিনেমা দেখে, রঙচঙে জামা-প্যান্ট পরে এঁরা আনন্দ পায় না। —মন্তব্য ছুঁড়লো সজল।

কি আর করা যাবে! বিকাশ ধর্মেন্দ্র, দিলীপকুমার, হেমা মালিনী, বৈজন্তীমালা, অমিতাভ বচ্চনদের নিয়েই থাক। ফাঁক পেলে ধর্মতলায় গিয়ে ইংরিজি সিনেমায় লাইন লাগাক।

প্রশ্নটা এখানেই! অর্থনীতির কথা তাই বারে বারে এসে যায়। বিকাশ আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল। তাই ও সুখ কিনে নিতে পারে। সংসারের বার্ডন নেই, তাই মস্তিতে আছে।

দীপঙ্কর এই কথা বলেই চুপ করে গেলো। সবার চোখই দীপুর দিকে। ওর কাছ থেকে ওদের আরো কিছু শোনার ইচ্ছে। কিন্তু দীপু চুপ।

দীপু, চুপ করে গেলি কেন?

আর নতুন কিছু বলার নেই। পুরনো কথা আর বাজারে চলে না।

বোধিসত্ত্ব দীপুর পিঠে চাঁটি মেরে বললো, হেঁয়ালি ছাড় তো! তুই মুখ না খুললে আড্ডা জমবে না।

দীপঙ্কর বোধিসত্ত্বর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো। বললো, ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি রে! এগোতে পারছি না। পেছোতেও পারছি না।

হলো কি তোর?

কিছু হয়নি। তবে এখন মনে হচ্ছে, তোর সঙ্গে সাগরমেলায় গেলেই বুঝি ভালো করতাম। দু'চারটে দিন কেটে যেতো অন্যভাবে। দু'দিন ধরে কিছুই ভালো লাগছে না।

কি আর বলবে বোধিসত্ত্ব! ওর নিজেরই তো এরকম হয়। চলতি সমাজের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই যন্ত্রণা একান্তই তাদের নিজেদের। কেউ তার ভাগীদার নয়। যেখানে একাকী চিন্তার বৃত্তগুলো অনবরত জড়িয়ে ধরতে চাইছে যুবককে। সেই নৈঃশব্দ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে প্রাণ জেরবার হয়ে যাচ্ছে। সেটা কাকেই বা বোঝানো যায়? কাউকেই না! পাড়ায় দু'দুটো কচি ছেলে খুন হয়ে গেলো। কোন অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ কি পারে এখন চুপ করে থাকতে? না কি হজম করা যায় এত বড় ঘটনা! বোধিসত্ত্ব স্বগত চিন্তার অতলে ডুব দিলো।

'আমি জানি দীপু, এই খুনের ঘটনা তোর বুকের মধ্যে হাহাকার হয়ে আছড়ে পড়ছে। ছেকলে হাত-পা বাঁধা জন্তুর মতো গুমরে মরা ছাড়া কোন কিছু করতে পারছিস না তুই।—'

তোদের এসব হেঁয়ালি আমার একদম ভাল্লাগে না। গোরা এই টানা নীরবতা ভেঙে দিলো। তোদের এসব কথাবার্তা আমার মাথায় একদম ঢোকে না। তোরা কি একটু খোলামেলা হতে পারিস না!

বিকাশরঞ্জন কোন কিছুর গভীরে যেতে নারাজ। গোরার কথাটা টেনে নিয়ে সে টিপ্পনি কাটলো। গোরাকে নিয়ে মজা করার প্রবণতা আছে বিকাশের মধ্যে। — কে বললো, আমরা খোলামেলা নই? তোর ব্যবসার ভালো খবর কি তুই অন্য ব্যবসায়ীকে খুলে বলবি? তোর মুখে তো একটাই কথা, 'বাজার মন্দা যাচ্ছে রে।'

কি জানি! তোদের অনেক কথা আমার মাথায় ঢোকে না। শালা, বড়বাজারে গিয়ে মাড়োয়ারী মহাজনদের সঙ্গে দরাদরি, তারপর বস্তির ওইটুকু ঘরে ভ্যাপসা গরমে কাপড় কাটা, সেলাই করা—এই তো অবস্থা! মাথা আর খুলবে কি করে?

তোর মাথা পরিষ্কারই আছে। এ বাজারে নিজের মুরোদে মোটামুটি ব্যবসা করে সংসার চালিয়ে নিচ্ছিস। এটাই অনেক।

না রে। তবু মাঝে মধ্যে মনে হয়, পড়াশোনা করাই ভালো ছিলো। তোরা তো আছিস বেশ। তোদের এত ভারী ভারী কথায় যোগ দিতে পারছি না।

পড়াশোনা করে হলোটাই বা কি? চাকরি নেই। অনেক জানলাম, অনেক বুঝলাম, কিন্তু সমস্যা মেটানোর সাধ্যি নেই।— এই উক্তি সজলের।

বোধিসত্ত্ব একজন বয়স্ক, বোদ্ধা মানুষের মতো বললো, দু'চারটে বই পড়ে আমরা আদতে ভারী পণ্ডিত হয়ে গেছি কি? তাই সাধারণ কাজে অসম্মান! অসাধারণ কাজ

দেবার লোকও নেই। আমরা সব সাইড পার্ট করনেওয়ালা অভিনেতা। নায়ক হবার ইচ্ছে আছে। মুরোদ নেই। জিততে চাই। এদিকে লড়াইয়ের আগেই হেরে ভূত হয়ে বসে আছি।

মোট কথা, গোরা ব্যবসা-ট্যাবসা করে ভালোই আছে, এটা বোঝা গেলো। আমাদের মতো তো আর মুখে হাতি ঘোড়া মারছে না! বাড়িতে ঢুকলেই তো আমাদের সেই একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন।

তা হলে! বহুৎ বাতেলা তো হলো! আর এক খেপ চা হয়ে যাক! তারপর বাড়ি। অফিস যেতে হবে।—বিকাশ তাড়া লাগালো।

ফাইনান্স করবে কে?

গোরা।

কেন?

কেন নয়? আজ সকালের মেন ক্যারেকটারই হলো গোরাচাঁদ কুণ্ডু।

কেন বাওয়া, গোরার ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করছো? আমরা তো সব স্যাডিস্ট! তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস! আমাদের মন খারাপ কাটাবে বিকাশ।

ন্যাপলাদা! পাঁচটা হাফ চা। বিকাশের অ্যাকাউন্টে।

শেষ পর্যন্ত আমি মুরগী হলাম!

মুরগী কি রে! একগাদা স্যাডিস্টকে চা খাইয়ে তুই পুণ্যি করছিস। আলোর পথ দেখাচ্ছিস।

বরং আমরা সবাই মিলে গান গাই—'ও আলোর পথ যাত্রী'......

এ গান গাস না। কোন মস্তান শুনে তার নেতাকে গিয়ে বলবে। নেতা এসে বলবে, শালা তুমি সি পি এম। বিপ্লব মারাচ্ছো! কাল থেকে পাড়ায় ঢুকবে না! —পটাং করে এই কথাটা বলে দিলো গোরা।

কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলো সজল। বোধিসত্ত্ব দেখলো, সজলের মুখ থমথম করছে। সি পি আই (এম) পার্টি করতো বলে নকশাল হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের সেই মস্তানগুলো সজলকে পাড়াছাড়া করেছিলো। সেটা উনিশশো একাত্তর সালের কথা। অনেকদিন পাড়ার বাইরে ছিলো সজল। ক'দিন আগে পাড়ায় ফিরেছে।

এই ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। এই ভেবেই বোধিসত্ত্ব হাঁক পাড়লো, ন্যাপলাদা! চা রেডি!

হ্যাঁ রেডি!

ঘরমুখো হতে হয় শেষ পর্যন্ত। দীপুর বাড়ি বোধিসত্ত্বের বাড়ির দিকে। ওরা হাঁটছিলো একসঙ্গে। বোধিসত্ত্ব চাইছিলো, দীপু কিছু বলুক। দীপুর মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতেই পারছিলো বোধিসত্ত্ব। কিন্তু দীপঙ্কর চুপ করেই রইলো। ওরা হাঁটছিলো। অজস্র ভাবনা তখন ওদের মনে।

'আমরা এক অশান্ত সময়ের শেষ প্রান্ত ধরে হেঁটে চলেছি। সাতষট্টি থেকে পঁচাত্তর সাল। পশ্চিমবাংলা টালমাটাল। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন ধারা এলো সাতষট্টিতে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এলো। কিন্তু নতুনকে মেনে নিতে পারলো না পুরনো শাসক কংগ্রেস। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদীর উত্থানের যুগ চলছিলো খাদ্য আন্দোলনের সময় থেকেই। জনতার জীবনে গভীরতর স্পর্শ ছিলো এই দলটির। রেবতীবাবু সেদিন বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে একটা কথা ওঁকে নাড়া দিয়েছিলো। উনি বলেছিলেন, বুঝলে বুধ, তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, সাতষট্টির মার্চ মাস থেকে শুরু করে বাহাত্তর সালের মার্চ মাস, এই পাঁচটা বছর পশ্চিমবাংলায় যেন ঝড় বয়ে গেছে। এখন, এই পঁচাত্তর সালে এসে এই রাজ্যে হয়তো দুরন্ত কালবৈশাখী বইছে না রাজনীতিতে। তবুও ঝড় থেমে নেই। এখনো মানিক বোসের মতো তাজা ছেলেকে মরতে হচ্ছে। সাতষট্টির মার্চ থেকে অজয় মুখার্জির ন'মাসের সরকার, ওই বছরেরই নভেম্বর মাস থেকে প্রফুল্ল ঘোষের তিন মাসের সরকার, ঊনসত্তরে এসে অজয় মুখার্জির তেরো মাসের সরকার ভেঙে দেওয়ার পর একাত্তর সালের ভোটে কী দেখলাম বলো তো?

কী?

এই ভোটেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছিলো।

তা ঠিক। সি পি আই এম জোট বোধহয় একশো তেরোটা আসন পেয়েছিলো।

তারমধ্যে সি পি আই এম একাই একশো পাঁচটা। তা হলে লক্ষ্য করে দেখো, শাসক কংগ্রেস কিন্তু এই দলটাকে ঠেকাতেই বারে বারে সরকারগুলো ভেঙেছে গড়েছে।

আপনি বলছেন বটে স্যার, কিন্তু ভোটে জিতে আসা কোন সরকারকে ভেঙে দেওয়া যায় কি? তা হলে আর গণতন্ত্র রইলো কোথায়? আমার তো মনে হয়, যুক্তফ্রন্টের মধ্যেকার দলগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেই সরকারগুলো ভেঙেছে।

সাদা চোখে তাই মনে হয়। কিন্তু রাজনীতি সরল পথে এগোয় না। বিশেষ করে যখন একটা শাসকগোষ্ঠীর শেষ সময় ঘনিয়ে আসে। যাকগে। এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে ডিটেলে আলোচনা করবো। চালু প্রসঙ্গটুকু শেষ করে নিই। হ্যাঁ। সাতষট্টি থেকে শুরু করে যে দলটাকে ঠেকানোর এত চেষ্টা চললো, একাত্তরে

সে-ই সেই হয়ে গেলো বৃহত্তম দল। দেখো, তখনো সি পি আই-এম কে ঠেকাতে অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী আর বিজয় সিং নাহারকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে একটা খিচুড়ি সরকার করা হলো।

কিন্তু সেই সরকারও তো টিকলো না!

ঠিকই বলেছো। একাত্তর সালের নির্বাচনের পর অজয় মুখার্জির মুখ্যমন্ত্রীত্বের সরকার তিন মাসের বেশি টেকেনি। এই সময়েই দিল্লি থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করে পাঠানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের, আদর্শবান নকশালপন্থীদের এবং বিশেষ করে সি পি আই-এম কে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়েই এই কাজটা করা হলো।

জেলের মধ্যে, না হ'লে জেলের বাইরে সে-সময় নকশালদেরও তো শেষ করে দেওয়া হয়েছে। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় নকশালদের ওপর নিষ্ঠুরতার মাত্রাও ছিলো সাঙ্ঘাতিক।

হ্যাঁ তা ঠিক। তবে কতগুলো জিনিস পরিষ্কার থাকা দরকার রাজনীতিকদের কাছে। বামপন্থী রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে মার্কসবাদের ওপর ভিত্তি করে, এটা মনে রাখতে হবে। এই আদর্শের লক্ষ্য হলো শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা। তার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি।

কেন! আর কোন দল কি শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলে না?

বলে। কিন্তু তার থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না। সমাজ পরিবর্তন শুধু বক্তৃতা দিয়ে, আর গরিব মানুষের জন্য চোখের জলে বুক ভাসালে হয় না। তার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী আর সুসংবদ্ধ দল থাকা দরকার। এছাড়াও চাই দেশের প্রকৃত অবস্থার যথাযথ বিশ্লেষণ। এর একটাও নকশালপন্থীরা করে উঠতে তো পারেইনি, উপরন্তু বিপ্লবের নাম করে ছেলেমানুষের মতো আচরণ করেছে। এ-জাতীয় আচরণ, আর কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ দল না থাকায় তখন শাসকগোষ্ঠী নকশালপন্থীদের মধ্যে যত পেরেছে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়েছে। দলের মধ্যে গুন্ডা বদমাইশ, পুলিসের লোক---এদের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র হয়ে যাওয়ায় নকশালরা পারস্পরিক সন্দেহ এবং খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

কিন্তু এতে আদর্শবান ছেলেগুলোর মৃত্যু আর আত্মত্যাগকে তো অস্বীকার করা যায় না!

অবশ্যই যায় না। অস্বীকার করা হচ্ছেও না। কিন্তু এই লক্ষ্যহীন ছেলেমানুষী আর আবেগের বিরুদ্ধে আমাদের বলতেই হবে। হিরোইজ্‌ম দিয়ে বিপ্লব হয় না। সমাজও

পাল্টানো যায় না। বরং বলা যায়, নকশালরা উদ্ভট আচরণ করে পশ্চিমবাংলার গ্রামের জমির আন্দোলনকে কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছিলো।

কি করে আপনি এটা বলেন! গ্রামে গ্রামে জোতদারদের বিরুদ্ধে ওঁরা লড়াই করেছে। জোতদারদের মেরেছে। নিজেরাও মরেছে।

হ্যাঁ বুধ। যুক্তি ছাড়া তুমি আমার কথা মেনে নেবে না। তা আমি জানি। তাই পছন্দও করি তোমাকে। মারা এবং মরা, এই ব্যাপারটাই কোন সুচিন্তিত বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে বলে আমরা মনে করি না।

বোধিসত্ত্বর কান এড়িয়ে যায়নি যে, তাঁর এককালের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই যে সব কথা বলছেন, সেগুলো তাঁর একার মতামত নয়। সম্মিলিত মতামত। মানিক বোস যে-রাতে খুন হয়, রেবতী চ্যাটার্জি সে-রাতে এগিয়ে এসে উত্তেজিত মানুষগুলোকে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেননি। পুরো অবস্থাটাকেই তিনি নিজের মুঠোয় ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর আশপাশ ঘিরেছিলো যে সব বয়স্ক এবং যুবকরা, তাঁদের আচরণের মধ্যে ছিলো গোছানো চিন্তা। সেদিন সজলও ছিলো। যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মতো মানসিকতা দেখেছিলো বোধিসত্ত্ব সেদিন ওঁদের মধ্যে।

......'যে অশান্ত সময়ের শেষ সীমানা বরাবর আমরা হাঁটছি, সেই সময়কে রুখে দিতে কি ভেতরে ভেতরে কাজ চলছে?' বোধিসত্ত্বর তৃতীয় নেত্র যেন কথা কয়ে উঠলো। 'বোধিসত্ত্ব, তুমি দেখো। তুমি গ্রহণ করো। তোমাকে এই ইতিহাস লিখতে হবে। তুমি যা অনুভব করছো, তা ঠিকই।'

.......দুই যুবক যখন এই রাস্তা ধরে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে, তখন ওঁদের মনের মধ্যে চলছিলো এমনই সহস্র কথা-কওয়া।

বোধিসত্ত্বদের বাড়ির দরজার সামনে এসে দীপু দাঁড়িয়ে পড়লো। দাঁড়ালো বোধিসত্ত্বও।

কিছু বলবি?

বুধ, একটা খবর আছে।

কি?

দীপু কথাটা বলতে গিয়ে বলতে পারছে না। ওর চোখ ছলছল করছে। দুঃখভার উথলে উঠতে চাইছে। ফুলে ফুলে উঠছে সে।

বোধিসত্ত্ব অবাক। কি হলো বুঝতে পারছিলো না। এই সময়, যে সময় প্রতি কথায় আতঙ্ক ডেকে আনে, নিয়ে আসে মরণ সংবাদ।

কি হয়েছে, বল!

পিনাকীকেও খুন করে ফেলেছে রে বুধ।—দীপুর দু'গাল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে তখন। সে মাথা নিচু করে হন হন করে হাঁটা দিলো বাড়ির দিকে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

স্তম্ভিত বোধিসত্ত্ব কয়েক মুহূর্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো। দীপু চলে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব দেখছিলো এক ভাঙাচোরা যুবককে। দীপু যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। ওঁর মনটা—হায়রে! এ যন্ত্রণা কাকে বোঝাবে দীপু? দীপুকে যদি কেউ এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, তবে সে বোধিসত্ত্বই। পিনাকী নেই! পিনাকী নেই! পিনাকী খুন হয়ে গেছে। হে ভগবান! বোধিসত্ত্বও ভেঙে পড়বে নাকি!

......কি রে বুধ! কি হলো তোর?

......না, না। কিচ্ছু হয়নি।

......বললেই হলো। তোকে কেমন যেন লাগছে। বেশ হাঁপাচ্ছিস!

ডুব সাঁতারে কে কতটা যেতে পারে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে এই নিয়ে বাজি চলতো কতদিন। যে জিতবে, তাঁর প্রাপ্য হবে হরি ঠাকুরের দোকানের গরম গরম তেলেভাজা। যে যে কটা খেতে পারবে, ততগুলোই খাওয়াতে হবে।

এমনি এক চৈত্রের দুপুরে কাশীমিত্র ঘাট থেকে গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলো পিনাকী আর বোধিসত্ত্ব। তখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ার দু'জনেরই। তখনও এমন চিন্তার ঢেউ একরাশ ধোঁয়াশা হয়ে আছড়ে পড়তো না মনের মধ্যে। অনাবিল আনন্দ ছিলো তখন। সাঁতার কাটতে তখন অফুরন্ত দম। প্রায় একশো হাত দূরে গিয়ে ভেসে উঠেছিলো দু'জনেই। বোধিসত্ত্বই এগিয়ে ছিলো। এরপর সাঁতরে পাড়ে এসেই বোধিসত্ত্ব দম হারিয়ে ফেলেছিলো। পিনাকীর দমের খামতি ছিলো না। পাড়ে উঠে বসে সে বোধিসত্ত্বের পিঠে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে দিয়েছিলো। চোখ বুজলেই সে দিনের ছবি ভেসে ওঠে বোধিসত্ত্বর। অভিভাবকের মতো ভঙ্গিতে সেদিন সে ওঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, তেলেভাজা নয়, আজ বিকেলে তোর পাওনা রইলো একপোয়া গরম দুধ। বলেই হো-হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলো পিনাকী। দীপু ছিলো পিনাকীর চ্যালা। পিনাকী নামক প্রাণবান যুবকের ছায়ার নিচে যাঁরা এই সমাজের উলঙ্গদশা দেখতে বা বুঝতে পেরেছিলো, দীপু তাদের মধ্যে একজন। বোধিসত্ত্বও তার বাইরে নয়। তবুও ফারাক ছিলো দু'জনের মধ্যে।

বোধিসত্ত্ব ভুলবে কি করে? পিনাকী সাঁতারে নেমে সামনে-ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতো না। গোঁয়ারের মতো এগতো। জেতাটাই ছিলো তাঁর আসল কথা। বিপদ-বাধা থোরাই কেয়ার। হা-হা করে হাসতো পিনাকী। বোধিসত্ত্ব তা পারে না। তবে এটা ঠিক, পিনাকীর সঙ্গে থাকলে বোধিসত্ত্বর মুখচোরা ভাব অনেকটাই কেটে যেতো। গভীর টান ছিলো

ওঁর ওপর। যখন ছন্নছাড়া জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিলো ওদের। সামনে তাকালেই অন্ধকার। ছায়াবিহীন সেই পৃথিবীতে, যেখানে প্রিয় কোন মানুষ থাকে না, সেখানে পিনাকী সিন্‌হা অদ্ভুত রঙিন এক বার্তা বয়ে নিয়ে আসতো। তা ছিলো ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধের মতো। তাঁকে কি ভোলা যায়!

দু'জনের ভাবনায় ফারাক ছিলো। বোধিসত্ত্ব ধীরস্থির। পিনাকী উদ্দাম। দ্রুততা ছিলো পিনাকীর চিন্তায়। দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে সে প্রায়ই সহজ সত্যিটাকে হারিয়ে ফেলতো। বোধিসত্ত্ব কিন্তু সবটা না বুঝে কোন কিছু মানতে রাজি নয়। তাই সে আজও রেবতী মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সমানে তর্ক করে। তবে এটাও ঠিক যে, রেবতীবাবু স্যার প্রত্যেকটা বিষয় তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। পিনাকীর মধ্যে কিন্তু তাড়াহুড়ো ছিলো। পিনাকীর যুক্তি সব ধারালো প্রশ্নে টুকরো টুকরো করে দিতো বোধিসত্ত্ব। খুব রেগে যেতো পিনাকী। সেও অল্পক্ষণের জন্যে। কেননা, দারুণ আন্তরিকতা আর উদার মন ছিলো তাঁর। সেই ঔদার্যে একেবারে ভেসে যেতো বোধিসত্ত্ব। এ-কথা সে কি করে অস্বীকার করবে?

তখন পার্ট-টু পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্ট বেরোয়নি। সেই তখনই বোধিসত্ত্ব পিনাকীর মুখে অন্যরকমের কথা শুনতে পেলো।

কি হবে পড়াশুনো করে!

কি হবে মানে?

দেশের কোটি কোটি মানুষ পেট পুরে খেতে পায় না। লেখাপড়া জানে না। সে-দেশে পড়াশুনো করে চাকরি নেওয়া স্বার্থপরের মতো আচরণ হয়ে যাবে। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা তো আমাদের গরিব মানুষদের তাচ্ছিল্য করতেই শেখাবে।

তা আমরা যদি লেখাপড়া ছেড়ে দিই, তবে তাঁদের দুঃখ ঘুচে যাবে?

ঘোচাবার চেষ্টা করতে হবে। বসে থাকলে চলবে না।

দেশের কাজ করতে গেলেও পড়াশোনা লাগে। জানতে হয়। হুজুগে ভালো কাজ হয় না।

যাঁরা কিছু পেলো না, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজটা আগে দরকার। তাঁরা জেগে উঠলেই বিপ্লবের আগুন জ্বলবে। দেশের ভোল পাল্টে যাবে।

তা না হয় যাবে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে কি শুধু মুখের কথাতেই জাগানো যাবে!

মুখের কথাতেই হবে কেন? তোকে একদিন আমাদের বৈঠকে নিয়ে যাবো। কোনো খবর তো রাখিস না! দেশ জুড়ে বারুদের স্তূপ জমেছে।

ভেতরে ভেতরে বারুদের পলতেটা যে আগুনের এত কাছে চলে এসেছিলো, বোধিসত্ত্ব সত্যিই তা খেয়াল করেনি। তাই পিনাকীর কথাগুলো ওর কাছে বড় নতুন লেগেছিলো সেদিন। সারা দেশ জুড়ে কী এমন হচ্ছে? অন্তর্মুখি বোধিসত্ত্ব তা আঁচ করতে পারেনি প্রথমে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলো পাড়ায় ফিসফাস আলোচনা। ওঁর বন্ধুবান্ধব, ছাত্র আর পাড়ার বেশকিছু ছেলের মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ। অনেকেই অনেক কথা বললো তাঁকে। ঝাঁপ দিতে বললো এই ঢেউয়ের বুকে। কিন্তু বোধিসত্ত্বর সামনে সেই একই জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সে যুক্তি চায়। শুধুমাত্র আবেগ আয় হুজুগ নয়। পিনাকীরা বললো, বুধ, তুই একটা ভীতুর ডিম। তোর দ্বারা কিসস্যু হবে না।

বোধিসত্ত্ব দেখতো, পিনাকীর কাছে নতুন নতুন ছেলে আসছে। ওদের চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর। এক অন্য দীপ্তি। এমন স্বপ্ন কে দেখাচ্ছে? কারা দেখাচ্ছে? পিনাকী ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছিলো। ওঁর সঙ্গে রিভলবারও থাকতো। কিন্তু বোধিসত্ত্বর মনে একই প্রশ্ন চিৎকার করে উঠতো—কার্যত কী করতে চাইছো? খোলাখুলি বলতে পারো তোমরা? প্রশ্নের উত্তর চাই আমার! যুগসঙ্কটকে বুঝতেই হবে! বোধিসত্ত্বর মনের ভেতর থেকে প্রশ্নের ঝড় উঠলো। তাই মাত্র একদিনই সে গিয়েছিলো পিনাকীদের গোপন বৈঠকে। অনেক ভারী ভারী কথা, অনেক তত্ত্ব আলোচনা, কিছুতেই তার মন ভরেনি সেদিন। বোধিসত্ত্ব কিছুতেই ওদের কাজকর্মকে মেনে নিতে পারেনি। মন সায়ই দিলো না। তাই প্রশ্ন উপছে উঠলো।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ পেট পুরে খেতে পায় না। শিক্ষা নেই। পানীয় জল, বাসস্থান, পরবার ন্যূনতম কাপড়ের জোগান নেই। এই দুর্দশা দেখতেই পাচ্ছি, বুঝতেও পারি। কিন্তু কিভাবে সমস্যা মিটবে?

ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দেবো।

কিভাবে দেবেন?

জোতদার-জমিদারদের বাড়তি জমি কেড়ে নেবো।

ওরা তো আর আপনাদের ছেড়ে দেবে না! গভ্‌মেন্ট, পুলিস, সব ওদেরই হাতে।

ওদের আইন পাল্টে নতুন আইন করবো আমরা।

ওদের আইন পাল্টাবেন কি করে?

এটা যুদ্ধ। লড়ে কেড়ে নিতে হবে।

লড়তে গিয়ে হেরেও তো যেতে পারেন!

পিছু হঠতে পারি। তবে হেরে যেতে পারি না।

কনফিডেন্টলি বলছেন তো এই কথা?

নিশ্চয়ই! তবে লড়াই অনেকদিন চলতেই পারে। এটা জেনেই রাস্তায় নেমেছি

আমরা! তাই তো আমাদের শ্লোগান, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আছে তো আপনাদের?

প্রস্তুতির অপেক্ষা করে না বিপ্লব। পরিস্থিতিই বিপ্লবের রাস্তা করে দেয়। পরিস্থিতিই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিয়ে যাবে। তিথি-নক্ষত্র দেখে বিপ্লব শুরু বা শেষ করা যায় না। অস্ত্র থাকলেই কি বিপ্লব করা যাবে? যদি না তেমন সামাজিক অবস্থা থাকে!

সে-রকম সামাজিক অবস্থা আছে কি?

আমরা তাই মনে করছি।

কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

কোনটা?

শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে লড়াই চালিয়ে বিপ্লব করবেন আপনারা। পরিবর্তন আনবেন। কোটি কোটি মানুষের জীবনমরণ সমস্যা যেখানে, সেখানে পরিকল্পিত প্রস্তুতির দরকার নেই?

বিপ্লবের আগুনে পুড়ে তৈরি হবে খাঁটি মানুষ। তাঁদের নিয়েই গড়ে উঠবে দল, সেনাবাহিনী। প্রত্যেক ফ্রন্টে অবস্থা অনুযায়ী বিপ্লবী বাহিনী পজিশন নেবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সব ক্ষেত্রে।

কিন্তু যুদ্ধ মানে যুদ্ধই। একটা আদর্শগত যুদ্ধ। আরেকটা বহিরঙ্গে। আদর্শে সুশৃঙ্খল এবং গঠনেও সুশৃঙ্খল বাহিনী ছাড়া শাসকশ্রেণীর নিটোল আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে লড়া অসম্ভব! কোথায় আপনাদের সেই সেনাবাহিনী?

বোধিসত্ত্ব দেখেছে, এ-কথার কোন সোজা জবাব কেউ দিতে পারেনি। অস্পষ্ট জবাব। বিশাল সেনাবাহিনী হচ্ছে। হবে। কোথায়? কেউ জানে না। সে তখনই বুঝেছিলো, আবেগ যতটা এঁদের, বাস্তব সম্পর্কে ঠিক ঠিক ধারণা ততটা নেই। পিনাকীও এই দলের একজন। যাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চায় সরলরেখায়। ওরা প্রবল প্রতিপক্ষের কথা একেবারে ভুলে যেতে চায়। জটিলগতি জীবনের প্রত্যেকটা বাঁক-মোড়কে পিনাকীরা সেভাবে ধরার চেষ্টাই করলো না। বোধিসত্ত্ব তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ নিয়ে ওদের বুকের মধ্যেকার চলমান আবেগের স্রোতে সাঁতরে বেড়িয়েছে একা। কিন্তু তেমন একটা কিছু পায়নি, যাকে জীবনের ধ্রুবতারা বলে আঁকড়ে ধরা যায়। অমোঘ না হোক, পিনাকীদের উদ্দাম আবেগ, আর কাজকর্মের তাৎক্ষণিক সত্যকেও তাঁর ভারি ঠুনকো মনে হয়েছে।

'তা হলে বোধিসত্ত্ব, তুমি কী বলতে চাও? আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য যে টাটকা ছেলেগুলো তৈরি হয়ে আছে, তাঁরা কি সব মিথ্যে? জানো কি! কত ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র তাঁদের কেরিয়ারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লড়াইয়ে নেমে পড়লো, তাঁদের কোন দাম নেই!

না, না! আমি তা বলতে চাইনি! বোধিসত্ত্বর মনের মধ্যে আর একটা মন চিৎকার করে উঠলো।

তা হ'লে তুমি কী বলতে চাইছো?

অসহায় বোধিসত্ত্বের যুক্তিবাদী মন হাতড়ে বেড়িয়েছে নিজেরই ক্রুদ্ধ প্রশ্নের উত্তর। উত্তর খুঁজে পায়নি।

ওরা সত্যি। ওদের ভালো চিন্তা, সরল আবেগও সত্যি। ওদের কথাগুলো সত্যি। তবুও ভুল হচ্ছে কোথায় যেন। আমি তো মার্কসবাদের ভারী ভারী বই পড়িনি! অত তত্ত্বকথা জানি না। তাই বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

এ-ভাবে ভাসা ভাসা কথা বলে এত বড় কাজকে অস্বীকার করতে পারো না তুমি।

অস্বীকারও করছি না। বাধা দেবার ক্ষমতাও নেই। আমায় মন সায় দিচ্ছে না। আমি তাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে চাই।'— এইসব বিভ্রান্তির জোয়ারভাঁটায় দাঁড়িয়ে কোনমতেই কারোর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছিলো না বোধিসত্ত্ব। গুমরে গুমরে মরছিলো তাই।

উনিশশো ছেষট্টি সালের আটই আগস্ট। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দামামা বেজে উঠলো। চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং শ্লোগান তুললেন, 'সদর দপ্তরে কামান দাগো।' 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো।' ছেষট্টি থেকে তিয়াত্তর সাল। গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর অত্যাচার-অবমাননা, কোথাও কোথাও যন্ত্রণাকর মৃত্যু নামিয়ে আনা হলো। যার রেশ চললো ছিয়াত্তর সাল পর্যন্ত।

সাতষট্টি সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার এলো।

মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখার্জি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদী নতুন শক্তি নিয়ে হাজির হলো সেই সরকারে। যার নেতা জ্যোতি বসু। সে বছরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদীকে নয়া সংশোধনবাদী বলে বসলো ভবিষ্যৎ নকশালপন্থীরা। চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও পিকিং রেডিও থেকে নকশালপন্থীদের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে শুরু করলো। পিকিং থেকে চৈনিক নেতা লিন পিয়াও তখন 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো' তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে ব্যস্ত।

তখন থেকেই বোধিসত্ত্বর কাছে এই ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের লেগেছিলো। তা হলো, পশ্চিমবঙ্গে যখনই একটা করে ভোট হচ্ছে, আর সি পি আই এম দলের নেতৃত্বে বারবারই যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই নকশালপন্থীদের বিপ্লবী চিন্তাগুলো চাগিয়ে উঠছে।

গ্রামে-গঞ্জে দু'চারটে জমিদার-জোতদারের গলা কাটছে নকশালপন্থীরা। কিন্তু

বাদবাকি সময় এঁদের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর একেবারেই শোনা যায় না।

সি পি আই এম এল, অর্থাৎ নকশালপন্থীরা ওদের থিয়োরি রাখলো। ওরা বললো, ভারত কৃষিপ্রধান সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এদেশের পুঁজিপতিদের মৌলিক ক্ষমতা নেই। এঁরা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া। এ-দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি। তাই দেশে পুঁজিপতিদের কোন প্রগতিশীল ভূমিকাও নেই। শিল্প বিকশিত হয়নি। তাই ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা গৌণ। কৃষি বিপ্লব করেই এ-দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করতে হবে।

.........সেই রাতটাও ছিলো গভীর। অন্ধকার প্রগাঢ় হয়েছিলো। অজ্ঞাত কারণে রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলোও জ্বলছিলো না। বোধিসত্ত্ব তো বেশি রাত পর্যন্ত জেগেই থাকে। ...'রাত গাঢ় হলে আমার সমস্ত সুখ; আমার সকল যন্ত্রণা আমারই একান্ত সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে ওঠে, জেগে থাকো বুধ। আমি জেগে থাকতেই চাই। আমি জেগেও থাকি। আমি কলম নিয়ে বসি। সাদা কাগজে আঁচড় কাটতে থাকি। কিন্তু লিখতে পারি কোথায়? তবুও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার মস্তিষ্ক থেকে বুকের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে আসে রক্তধারা। রক্তাক্ত সময় যে শুরু হয়ে গেছে বাইরে। ওঃ। কি যন্ত্রণা! অসহ্য! আমি বুকের রক্তে কলম ডুবিয়ে বসে থাকি। আমার রাতগুলো যায় জাগরণে। যে রাতে কোন আলো নেই। আমি আছি অন্ধকারে। অন্ধকার আমাকে পেছনে টানতে থাকে।' শব্দ ভেসে আসে.......

......সাইরেনের শব্দ! সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে একটা পুলিসভ্যান শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ঢুকলো। সব চুপচাপ। শুধু পুলিসভ্যানের যান্ত্রিক আওয়াজ নৈঃশব্দ্য ভাঙছিলো। হঠাৎ—

বুম্—বুম্!

কান ফাটানো বোমার শব্দ।

নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ!

নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও! ছড়িয়ে দাও! ছড়িয়ে দাও!

—অনেকগুলো মানুষের শ্লোগান শোনা গেলো পাশের কোনো রাস্তা থেকে।

এই ঘটনা সেই প্রথম ওঁদের পাড়ায়। না বুঝেই ওঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিলো। এ কিসের ইঙ্গিত! আট বছর আগেকার সেই রাত আর তার দু'দিন পরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা কেমন করে ভোলা যায়! বোধিসত্ত্ব স্বগত উচ্চারণে ফেরে।

...'ওদের চিন্তাভাবনা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি ওদের কাছ থেকে সরে এসেছি। কিন্তু ওরা চুপ করে বসে নেই। চুম্বকের মতো আকর্ষণে পিনাকী ও তাঁর দলবল দিশাহীন পথে ছুটছিলো।

ওরা দিশাহীন?

আমি অন্তত তাই মনে করি। আমি ওদের কথা ও কাজের কোন সারবত্তা খুঁজে পাইনি।'

বোধিসত্ত্বের ভেতরের দোদুল্যমান আমি বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চেয়েছে। মাঝে মাঝে অ্যাডভেঞ্চারের রঙিন স্বপ্ন চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে।

'মানুষের জন্য কিছু করার এই উন্মাদনার ভাগ নাও বোধিসত্ত্ব। পেছিয়ে গেলে লোকে ছিঃ ছিঃ বলবে।

অকারণ লক্ষ্মীছাড়ার মতো মৃত্যুর দিকে ছুটে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।

এতবড় কাজের কিছু অর্থ নিশ্চয়ই আছে। হাজার হাজার লোক ভুল বুঝতে পারে না।

হিটলার লক্ষ লক্ষ লোককে ভুল বুঝিয়েছিলো।

কথার পিঠে কথার মালা গেঁথে নিজে দায়মুক্ত হতে পারবে না বোধিসত্ত্ব।

যদি কোনদিন এমন কোন কাজ পাই, বুঝতে যদি পারি, কাজটা করে ফলাফল আসবে, আনন্দের সঙ্গে সে কাজ করবো।'

ইনক্লাব!
জিন্দাবাদ!
নকশালবাড়ি!
জিন্দাবাদ!

এবার শ্লোগান শুনে তিনতলার জানালা খুলে ফেললো বোধিসত্ত্ব। সেদিন তাঁর মনের মধ্যে আতঙ্কের থেকে কৌতূহলই বেশি ছিলো।

পুলিসভ্যানটা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। অন্ধকার রাস্তা চিরে পুলিসভ্যানের দু'টো হেডলাইটের আলো রহস্যকাহিনীর কোন দৃশ্যের ছবি হয়ে আলো-আঁধারি তৈরি করেছে। হঠাৎই পুলিশভ্যানের আলোর বৃত্তের মধ্যে পড়ে গেলো দু'টো মানুষ।

পিনাকী! ও যে পিনাকী! অবাক বোধিসত্ত্ব দেখলো, পিনাকীর দু'হাতে দু'টো বোমা অন্য ছেলেটাকে দেখে বোধিসত্ত্বের ভুরু কুঁচকে গেলো।

হল্ট! এক পা-ও এগোবে না! গুলি চালাবো! এর উত্তরে পিনাকীর হাতের বোমা দু'টো একেবারে পুলিস ভ্যানের সামনে গিয়ে পড়লো।

বুম্-বুম্!

পুলিসভ্যানের হেডলাইট দু'টো ভেঙে চুরমার। পুরো অন্ধকার হয়ে গেলো রাস্তা। আর বোমার ধোঁয়ায় গোটা জায়গাটা ভরে গেলো। 'নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে পিনাকীরা ওদের বাড়ির পাশের বাই লেন দিয়ে পালালো। তক্ষুণি পুলিসের বন্দুকের শব্দ। খোলা জানালাগুলো পটাপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো।

এরই মধ্যে বাই লেনে ঢোকার মুখে দোতলা মাটকোঠা বাড়িটার একতলা থেকে কান্নার রোল উঠলো।

একদল মানুষ পালাচ্ছিলো। গলি দিয়ে দৌড়োবার দুপদাপ শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। তার পেছনে তাড়া করছিলো পুলিসের বুট। হলুদ বাড়ির একতলায় কান্না আর আর্ত চিৎকার। অন্ধকার।

আমার মেয়েকে বাঁচাও! পুলিসের গুলি লেগেছে শিখার গায়ে! বাঁচাও! বাঁচাও!

দূরে আরো কয়েকটা বোমা পড়লো।

পুলিসগুলো ফের এই রাস্তায় ঘুরে এলো। অন্ধকার, আতঙ্ক, আর্ত চিৎকার, বোমার শব্দ, পুলিস বুটের দাপাদাপি। বিষিয়ে গেলো সেদিন থেকে এই পাড়ার গোটা পরিবেশ।

পরের দিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে বোধিসত্ত্ব দেখেছিলো, বাড়িগুলোর দেয়ালে দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখা আশ্চর্য সব শ্লোগান। এ-সব লেখায় সে অন্তত বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো।

'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'

'চীনের পথ আমাদের পথ।'

'নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ।'

'নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।'

যে ঘটনা সেদিন বোধিসত্ত্বকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো তা বড় কষ্টের। তা বড় করুণ। পিনাকীরা পুলিসভ্যানের দিকে বোমা ছুঁড়েই বাই লেনে ঢুকে দৌড় দিয়েছিলো। পুলিস গুলি চালিয়েছিলো সেদিকে লক্ষ্য করেই। বাই লেনে ঢুকতেই তিন বাই একের সি নম্বরের হলুদ মাটকোঠা বাড়িটা। শোবার ঘরের জানালা খুলে বাড়ির বৌ বাইরে কি হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছিলো। মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিলো দশ বছরের মেয়ে শিখা কর্মকার। মা উঠে বসায় সেও উঠে বসে জানালায় চোখ রেখেছিলো। তখনই আগুনের ঝলকানির সঙ্গে পুলিসের বন্দুকের গুলি শিখার গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে ঘরের দেওয়ালে বাধা পেয়েছিলো।

বাই লেনের সেই বাড়ি থেকে ভেসে আসা কান্না ওদের সেই রাস্তাটাকে শোকার্ত, বিষণ্ণ করে রেখেছিলো কতগুলো দিন।

'জীবন হয়তো এরকমই। কখনো কেউ হাসবে। কখনো কেউ কাঁদবে। কেউ যন্ত্রণায় নীল হয়ে আর্তনাদ করবে। কেউ কেউ বিপ্লব করতে চাইবে। কেউ রাজভোগ খাবে। কারোর খাবার জুটবে না। আমি তার কোনটাকেই আটকাতে পারবো না। আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী। আমি এসব দেখি। নানা মানুষের সাথে কথাও বলি। কোনো পথ তো খুঁজে

পাই না! এক এক সময় কারোর সাথে কথা বলতেই ইচ্ছে করে না। আমি কি অসামাজিক হয়ে যাচ্ছি? আমি জানি না।

আমার আর একটা মন চিৎকার করে উঠতে চায়। তা'হলে সামাজিক কে? পিনাকী আর ওর দলের লোকেরা কি সামাজিক? যাঁদের জন্য ওদের সশস্ত্র বিপ্লব, তাঁরা কি এঁদের জানে? বোঝে? দিনের বেলায় পিনাকীদের দলবলের রাস্তা দিয়ে বোমা-পাইপগান হাতে দৌড়োদৌড়ি দেখলে লোকজন ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। দোকানপাটের ঝাপ বন্ধ হয়ে যায় আতঙ্কে।

এই সব নিত্যদিনের মানুষগুলো কি আছে পিনাকীদের সঙ্গে? অবাধ্য ছেলের মতো ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন উঠে আসে এভাবে। আর দশ বছরের শিখা! তার প্রাণের বিনিময়ে কী পাওয়া গেলো? এরকম মৃত্যুর বিনিময়ে কী-ই বা পাওয়া যেতে পারে! যে টিফিন বক্সট নিয়ে মেয়েটা পরের দিন স্কুলে যেতো, তার ওপর ছিটকে গিয়েছিলো তার রক্ত। তার মা-বাবার এই-ই বুঝি পাওনা ছিলো!'

সারাদিন মেঘলা করে রইলো। সকাল-দুপুর-বিকেল জুড়ে ক্লান্ত রোদ এই ছোট রাস্তাটার ওপর বিষণ্ণতার ছায়া মেলে রাখলো। হলুদ বাড়ি থেকে গমকে গমকে কান্না ভেসে আসছিলো। দুপুর গড়িয়ে বিষাদাচ্ছন্ন মেঘলা বিকেল আরো ভারী হয়ে উঠলো বোধিসত্ত্বের কাছে। বন্ধু সুশান্তর লেখা কবিতার বইটা নিয়ে বসে ও। বুকের মধ্যে পাষাণভার। মনের প্রত্যেকটা গবাক্ষে অর্গল তুলে দিয়ে সে সাজানো বর্ণমালায় চোখ বুলোতে থাকে। 'এসব ভাবতে গিয়েই আমি/তোমাকে অবিশ্বাস গড়ে তুলি/এসব ভাবতে গিয়েই আমি/প্রতিটি গোলাপ শ্রেণীতে প্রস্ফুটিত অবিশ্বাস খুঁজে পাই।'

......চোখ বুজে ভাবলেই পিনাকীর সেই সহজ সরল মুখটা ভেসে ওঠে। সেই পিনাকী মুছে গেলো পৃথিবী থেকে। রাস্তার মাঝখানে তাঁকে আপাদমাথা শূন্যতার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে দীপু চলে গেছে অনেকটা দূরে। অনেকক্ষণ। সামান্য পেছনে ফিরেছিলো বোধিসত্ত্ব। পরতের পর পরত সাজানো ঘটনাপ্রবাহ। একে একে আসে, একে একে যায়। 'পিনাকী! তোদের থামানোর মুরোদ আমার ছিলো না। আমার তেমন কোন পার্সোনালিটি নেই যে, তোদের আটকাবো। যা ভবিতব্য, তাই হলো।'

বোধিসত্ত্ব ঘরে ফিরলো। ভাই সকালেই বেরিয়েছে। বাবা তো বলতে গেলে বয়সের ধাক্কায় বিছানায়। মায়ের হাতেই সংসারের সব।

মা ভাত বাড়তে বাড়তে বললেন, কি শুনছি রে বুধ?

কী?

পিনাকীকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

মায়ের কাছেও খবরটা পৌঁছে গেছে। তবুও মাকে আর আতঙ্কিত করতে চায়

না বুধ।

পিনাকী তো এখন কলকাতায় থাকে না। কোথায় পিসিবাড়ি নাকি কাকার বাড়িতে ছিলো!

হ্যাঁ। ও রায়গঞ্জে ছিলো কাকার বাড়িতে। ওর দলের ছেলেরা বোধহয় জানতে পেরেছিলো।

রায়গঞ্জের খবর তুমি জানলে কি করে?

পিনাকীর মা আজকে কান্নাকাটি করছিলো। পিনাকীর বাবা টুটুলকে বলেছে, পিনাকীর কাকার একটা টেলিগ্রাম এসেছে রায়গঞ্জ থেকে। পিনাকী নাকি বেশ কিছুদিন ধরে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতো। একটা উটকো ছেলে নাকি ক'দিন ধরে ওর কাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিলো। পিনাকীর চেনা চেনা লেগেছে। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। একদিন বাজার করতে গিয়ে ও আর ফেরেনি।

পিনাকী খুন হয়ে গেছে, এ খবর দীপুর কাছে যখন চলে এসেছে, তখন ঘটনাটা সত্যিই। কারণ দীপুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউণ্ড যোগাযোগ আছে ওদের দলের। তবুও বোধিসত্ত্ব মাকে চিন্তায় ফেলতে চাইলো না। বললো, ও অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে।

তা গেলেই ভালো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও চালাক ছেলে।

কত ছেলেই তো এ-ক বছরে খুন হয়ে গেলো। তারা কি সব বোকা ছিলো!

বোধিসত্ত্ব চুপ করে রইলো। চুপ তো করে রইলো সে, কিন্তু ওঁর অন্তর হা-হা করে চিৎকার করে উঠলো, ও বলতে চাইছিলো, 'বুঝলে মা, ওরা সবগুলো বোকা! সবগুলো! সব আত্মহননে মেতেছিলো। কিচ্ছু করার নেই। রক্তপাত হবে, এটা ঠিক হয়ে আছে। আটকাবে কে!'

তাঁর ভাত বিস্বাদ লাগে। হাত গুটিয়ে বসে রইলো সে।

খাচ্ছিস না?

ভালো লাগছে না।

মা বোঝেন। ছেলের যন্ত্রণার উৎস মা জানেন।

থাক। জোর করে খেতে হবে না। উঠে পড়। হরলিক্স করে দিই বরং।

পিনাকী এ-বাড়িতে এলে ওর পছন্দের খাবার ছিলো সর্ষের তেল দিয়ে মুড়ি মেখে পিয়াঁজ আর নারকোলের টুকরো দিয়ে খাওয়া। বাড়িতে ঢুকেই হাঁক পাড়তো, মাসিমা! মাসিমা! আমার মুড়ি মাখা কোথায়। আর আপনার হাতের স্পেশাল আদা-তেজপাতার চা!

সেই পিনাকী পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলো।

'পিনাকী, তুই আজ কোথায়? তোর সাথে তো আর কোনদিন মুখোমুখি কথা বলতে পারবো না। তবু তোর সাথে আমি কথা বলতেই থাকবো। তোদের ভুলগুলো আমাকে বলতেই হবে। না হলে নতুন যুগের ছেলেরা হয়তো একই ভুল করবে।'

সেই সময় যারা পিনাকীর বাড়িতে আসতো, ওদের রাজনীতি আর স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলতো, টেবিল ফাটাতো, শেষ পর্যন্ত ওদেরই হাতে খুন হবার ভয়ে পিনাকী কলকাতা ছেড়ে রায়গঞ্জে পালিয়েছিলো। যেদিন ওরা শুরু করেছিলো, অন্তত আর যাই হোক, আদর্শে কোন ফাঁক ছিলো না। কিন্তু একদিন তা কেমন ঝাপসা হয়ে গেলো। আজ মনে হয়, সেদিনের কথাও সত্যি। এখন যা হচ্ছে, তাও সত্যি। কিন্তু সেনাবাহিনী? সেই আকাশকুসুম ফানুস সেদিন যারা উড়িয়েছিলো, এই রক্তাক্ত দশকের কাছে তাদের দায় থেকেই গেলো। একটা অসম যুদ্ধে, বিনা প্রস্তুতিতে আবেগ ছড়িয়ে, তরতাজা তারুণ্যকে এভাবে নামিয়ে দেওয়া?—না! ঠিক হয়নি। এরই জন্য বোধিসত্ত্বের অন্তঃস্থল প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠেছে বারবার।

'বুঝলি পিনাকী, আমাদের গোরা, যে স্কুলের গন্ডি পেরোতে পারলো না, কাপড়ের ব্যবসায় নেমে পড়লো, সেও কিন্তু বুঝে ফেলেছিলো শাসকশ্রেণীর চালাকি। কিন্তু তোরা উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে রইলি!'

যেদিন রাতে পুলিসের গুলিতে দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে শিখা মরে গেলো, তার দু'দিন পরে বিবেকানন্দ রোডে একটা ট্র্যাফিক পুলিসকে খুন করা হলো; পরের দিন খবরের কাগজে জানা গেলো, বিদ্যাসাগর আর ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির মুন্ডু কাটা হয়েছে কয়েকটা জায়গায়।

'পিনাকী, সব কাজের পেছনেই যুক্তি আর তত্ত্ব হাজির করা যায়। কিন্তু এই হাস্যকর ছেলেমানুষী দেখে আমি অন্ততঃ গম্ভীর মুখে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা মানতে পারিনি। মনে মনে আমি হো-হো অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছি। এই কিনা তোদের সমাজ বিপ্লব!'

ধ্বংসের উৎকট তান্ডবের মধ্য দিয়ে প্রায় এক দশক কেটে গেলো। পাল্টে গেছে অনেক কিছু। কোথায় সেই তুখোর ছেলেগুলো? আজ সত্যি কথা বলতে কি, ব্যথায়, দুঃখে, প্রিয় হারানোর শোকে টনটন করে উঠছে বোধিসত্ত্বের মন। সারা মন জুড়ে হা-হা করা শূন্যতা। কেউ নেই তাঁর কাছাকাছি। মরণের গন্ধ নিয়ে আসা ভারী বাতাস ওঁকে চেপে ধরতে চাইছে। বড্ড একা, আর বড় অসহায় হয়ে পড়লো বোধিসত্ত্ব।

পিনাকীর সেই প্রাণখোলা হাসি, বাতাস বেয়ে ওর কানে ভেসে এলো। বহুদিন পরে স্মৃতির জানালাগুলো খুলে যাচ্ছে একের পর এক। সেই স্মৃতির তোরঙ্গের মধ্যে জমে আছে বিষাদ, আনন্দ, প্রতিবাদ, বিরক্তি, রাগ সবই। তবুও পিনাকী ওঁর পরিপূর্ণ

ব্যক্তিত্ব নিয়ে অনেকের মধ্যেও অনন্য, উজ্জ্বল। ওঃ! সাঁতারু পিনাকীর সেই সুন্দর শরীরে ছুরির কোপ পড়েছে কত! তাঁর গাঢ় লাল রক্তে মাটি ভিজেছে। অথবা রিভলবারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে হয়তো। না কি পুলিসই তুলে নিয়ে গিয়ে চরম অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে অন্ধকার কোন ঘরের মধ্যে?

'ওঁর সেই অভিভাবকের মতো আন্তরিক ব্যবহার আর ঔদার্যভরা হাসি! ভুলি কি করে?

বোধিসত্ত্বর বুকের ভেতরটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সব কিছু ফাঁকা লাগছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না সে। নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

......কাঁদ বোধিসত্ত্ব। তোর একটু কান্না তো অন্তত আমার প্রাপ্য আছে!

কে!

আমি পিনাকী।

তুই-তুই এভাবে চলে গেলি!

উপায় নেই। যাওয়ার জন্যই আমাদের জন্ম। অনেক ভুল থাকলেও কিছু করার চেষ্টা করে গেলাম।...

চোখের জলে সমস্ত দুনিয়া ঝাপসা হয়ে যায় বোধিসত্ত্বের সামনে থেকে। বেঁচে থাকতে যাঁর সঙ্গে মতের মিল হলো না, সেই পিনাকী সিন্‌হাকে শোকপাথারে গাঁথা হাজারো অশ্রুবিন্দুর মালা পরিয়ে শেষ বিদায় জানালো ওরই একদা প্রিয়তম বন্ধু বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী।

'পিনাকী, আমরা তো মেনে নিতে পারি না যে, তুই নেই! আমার মতো, দীপুর মতো এমনই অনেক ছেলের হৃদপিণ্ডের প্রতিটি ওঠানামায় তুই বেঁচে থাকবি। তুই বেঁচে আছিস।'

পাঁচ

'এ ঘোর রজনী, মেঘ গরজনী,
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ-পানে নিরখিয়া।।
সই, কি করব, কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে।।'

—জ্ঞানদাস

পৌষ মাস শেষ হতে আর দশ দিন বাকি। জমিতে আমন ধান পেকে গেছে। কোথাও কোথাও ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে। তবে বেশির ভাগ জমিতে পাকা পুরুষ্টু ধান শীতের শিশিরে স্নান করছে এখনও। জমি থেকে আমন ধান উঠে গেলেই বোরোর জন্য জমি তৈরি শুরু হয়ে যাবে। পৌষ থেকে শুরু হয়ে মাঘেও চলবে বীজ বোনা। রবি মরসুমের ফসল হলেও এদিকটায় গমের চাষ তেমন একটা নেই। তবে নদীর চর অঞ্চলে এ সময় অফুরন্ত রবিশষ্য। মুলো, পালঙ, উচ্ছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, করলা, কড়াইশুটি, ছোলা, মটর, কলাইয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত বোঝাই হয়ে আছে। এ বছর ফলন ভালোই হয়েছে। ফসল তো ভালোই হয়। তবুও ফসলের জন্মদাতাদের ঘরে সারা বছরের খাবার জোটে না। এইসব জমিভরা উথলে ওঠা সবুজ এখনো অবধি চাষীর পুরোপুরি নাগালের মধ্যে এলো না।

আজ এক দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে জেগে উঠেছে চর সুলতানপুর গ্রাম। এই গ্রামের টগবগে ছেলে পরেশ দাস আর নেই। আজকে তাই দু'পাশে এইসব ফসলী জমির মধ্য দিয়ে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। সামনে একটা সাইকেল ভ্যানে ফুল-মালা ধূপ-ধুনোয় সাজানো পরেশ দাসের নিষ্প্রাণ শরীরটা।

সাইকেল ভ্যানের পাশে পাশে যাচ্ছে পরেশের বোন মালতী। কাঁদতে কাঁদতে ওর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ও শুধু ঘুরে ঘুরে পেছন দিকে দেখছিলো। অ্যাতো মানুষ! অ্যাতো মানুষ আমার দাদারে ভালবাসত! এত দুঃখেও মালতীর দাদার জন্য গর্ব হচ্ছিলো। হাঁটছিলো মানিকও। তারও খানিকটা দূরে হাঁটছিলো অঞ্জলি। এপার ওপার দু'পার থেকেই ঝেঁটিয়ে মানুষ এসেছে। নদীপাড়ের প্রত্যেকটা গ্রামের ভেতর দিয়ে শবযাত্রা চলতে লাগলো। মৌন, নিঃশব্দ এই চলা। প্রতিটি পদচিহ্নেই ছিলো দুঃখ, যন্ত্রণা আর রাগের প্রতিফলন। একসময় শবযাত্রা পাকা রাস্তায় উঠলো। বিকেল

হয়ে এসেছে। মালোপাড়া পেরিয়ে সেই মিছিল সাতগেছিয়ায় ঢুকলো। তারপর হাইওয়ে। হাইওয়ে ধরে ওরা স্টেশনমুখি চলতে শুরু করেছে। শীতের সূর্য অপরাহ্নে এসে কমজোরি হয়ে পড়েছে। হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে ভারী ভারী ট্রাক আর যাত্রীবোঝাই বাসগুলো। শবযাত্রা ওদের গতি শ্লথ করে দিয়েছে। ফের রেললাইন পেরিয়ে সেই বিশাল জনসমষ্টি নিশ্চুপে স্টেশন রোডে ঢুকলো।

স্টেশনবাজার থমথম করছে। সবজি বাজার, মাছপট্টি, ডালপট্টি হয়ে ওরা শ্মশানের পথে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সূর্য ডুবে গেছে। অঞ্জলি দেখলো, বিলাস একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ ছলছল করছিলো। অঞ্জলির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। বিলাসের চোখে আকুতি ছিলো, কোন শয়তানি ছিলো না। মেয়েরা এসব চট করে ধরতে পারে। অঞ্জলি বুঝলো। অঞ্জলি সামনে তাকিয়ে দেখলো, মানিক নিশ্চুপে হেঁটে যাচ্ছে। চোখ দু'টো পাথরের মতো কঠিন। অপ্রতিরোধ্য। অঞ্জলি কেঁপে উঠলো।

চালপট্টিতে আড়তদার গোবিন্দ তালুকদার দেখছিলো শবযাত্রার প্রত্যেকটা মানুষকে। মানুষগুলোকে দেখে কেন কে জানে গোবিন্দ তালুকদারের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। মাথা ঘুরে গেলো। গদির মধ্যেই তালুকদার মশাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। খানিকটা সুস্থ হয়ে গদির তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তালুকদার মশাই গম্ভীরভাবে বললেন, একটা ব্যাপার নজরে আনছস ক্যাবলা?

কি কত্তা?

হালায় জাউল্যারা তো ছোটলোক?

হ কত্তা।

ল্যাহাপড়া জানে না। মূর্খ। কথায় কথায় মারামারি চুলাচুলি করে।

ঠিকই কইসেন কত্তা।

কিন্তু দ্যাখসস নি, অ্যাতগুলান লোক চুপচাপ হাইট্যা গেলো। কারুর মুহে রা নাই। হুড়াহুড়ি নাই। হৈ চৈ নাই! এই শিক্ষা অগ কে দিলো ক দেহিনি?

পরেইশ্যায় দিসে। পরেইশ্যায় জাউল্যাগ চালাক কইর‍্যা দিসে। যাই কন তাই কন কত্তা, পরেইশ্যায় পোলাডা বেশ ভালোই ছিলো।

চুপ কর, চুপ কর! ভালোই ছিলো! হালায় দুইদিনের লেংটি ইন্দুর। পোকার বাচ্চা পোকা! ইস্টিশন বাজারে মহাজন আড়তদারগ ব্যবসা লাটে তুইল্যা দেওনের ফিকির তুইল্যা দিসিল! হালায় মরসে, আপদ গেসে।

ক্যাবলা এ কথার উত্তর দিলো না। মনে মনে বললো, যতই কন কত্তা, পরেইশ্যার

দুই চরণে আমি গড় করি। আমার ভাঙা চালে বিষ্টির জল পড়তো দেইহ্যা দশ আটি ছন ও আমারে মাগনা দিয়া দিসিলো। ভগমান, অরে তুমি সগ্‌গে নিয়া যাইও। — বলে ক্যাবলা মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি করে চোখের জল লুকলো।

ভৈরব মাঝি মাটির দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে শোকে পাথর হয়ে বসেছিলো। ঠাহুর! এ আমারে কি কল্লা, ঠাহুর! আমার একটা মাত্র পোলারে কাইড়্যা নিলা! কই যামু আমি কও, কই যামু। অ মালতীর মা গ! তুমি অ ফাহি দিস আমারে, পরেইশ্যায়ও দিলো! — সারাদিন ভৈরব মাঝি চিৎকার করে একই কথা বলতে বলতে গলা ভেঙে ফেলেছে। কারুর সান্ত্বনায় কাজ হয়নি। নিজে নিজেই চুপ করেছে সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ, পরেশের বাপ ভৈরব মাঝি। অন্যান্য জেলে ঘরের দু'চারজন বয়স্ক মানুষ ভৈরব মাঝির পাশে বসে আছে। সান্ত্বনা দিতে দিতে তারাও ক্লান্ত। এরা যায়নি পরেশ দাসের শবযাত্রার সঙ্গে। ভৈরব মাঝির পাশে বসে আছে। ভৈরব দাস দাওয়ায় বসে দেখছিলো মানুষের পর মানুষ লাইন দিয়ে চলেছে তাঁর ছেলের পেছন পেছন। মেয়ে মালতীও গেলো। ঘরে থাকলো না।

শোকজর্জর ভৈরব ভাবছিলো, এভাবেই কাতারে কাতারে মানুষ একদিন চলে এসেছিলো এপার।...........তখন সে ভৈরব মাঝি হয়ে ওঠেনি। ছেচল্লিশ সালের সেই দাঙ্গার ছবিগুলো ওর সামনে দাবানলের মতো জ্বলে সবসময়। তখন থেকেই পাশাপাশি বাস করা মানুষগুলো আস্তে আস্তে শত্রু হয়ে গেলো। হিন্দু আর মুসলমানরা নাকি আর একসঙ্গে থাকবে না। দেশের নেতারা নাকি এইসব কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথম যেদিন কথাটা ওর কানে গিয়েছিলো, ও অট্টহাসি হেসে উঠেছিলো। এইয়া আবার হয় নাহি কহনো! বিশাল পদ্মার নীল জলে ওরা সবাইই তো মাছ ধরে। কিসের ভাগাভাগি? কোন ভাগাভাগি তো নাই! ভৈরব দাস একদিন সন্ধ্যায় পদ্মার চরে নৌকা বেঁধে জালটাল কাঁধে নিয়ে ঘরে ফিরছিলো। ঘরে ফিরছিলো মনিরুদ্দিও। ভৈরবই কথাটা তুললো।

হুনছস নি মনিরুদ্দি?

কও বাই?

হিঁদু-মোসলমানে নাহি আর এক লগে থাকবো না! ইসব কি হাচা কতা?

হ বাই। হাচাই।

তুইও কস মনিরুদ্দি!

বাই, তুমি খুব সাদাসিদা। খপর তো কিসু রাহ না! পদ্মার পানি গড়াইছে অনেক দূর। কিসু হোনো নাই?

ভৈরব দাস সেদিন বড় ধাক্কা খেয়েছিলো। এ সব কয় কি! অ্যাতদিনকার ঘরবাড়ি ফ্যালাইয়া কই যামু? কিন্তু যামু ক্যান? আমার বাবা, আমার ঠাকুদ্দার ভিটা। ইয়া ছাইড়া যাইতে অইবো! ক্যান? ক্যান?

শেষ পর্যন্ত ভয়ানক দাঙ্গা ভৈরব দাসের চোখ খুলে দিলো। ওর স্বপ্নগুলোকে ও আর গড়ে তুলতেও চাইলো না। এদিকে যখন দেশ স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছে, নোয়াখালি আর কলকাতার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নির্লজ্জভাবে যেন দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। দেশকে কেটেকুটে ভাগ আর ভোগ করার ছকবাজি চলতে লাগলো কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের মধ্যে। সরল ভৈরব দাস, বেহায়া, লোভে চকচক করা চোখমুখের নেতাদের চিনতে কিন্তু একটুও ভুল করেনি। ভৈরব এক লাইনও পড়াশোনা করেনি। কিন্তু বিদ্যেবোঝাই বাবুদের চোঙ ধরে বক্তৃতা করতে দেখলেই সে খেপে যেতো। হালা, পুঙ্গির পুতেরা ল্যাকচার মারায়! হালারা আমাগো জলে ফ্যালাইয়া দিলো!

উইঠ্যা পড়েন মাঝি!

হুঁ। কে?

আমি।

উঠুম! ক্যান?

এই যে কাইল কইলেন, ভোর ভোর ডাইক্যা দিও! রওনা দিয়া দিমু।

চটকা ভেঙে গিয়েছিলো ভৈরব দাসের। বউ হরিমতি ওর চওড়া বুকে হাত রেখে আগামী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায়, আর যা আজকে ফেলে চলে যেতে হবে তার জন্য গুমরে ওঠা যন্ত্রণাকে সামলাচ্ছিলো। ভৈরব দাস উঠে বসলো। বউ হরিমতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। গতরাতের উদ্দাম যন্ত্রণাবিদ্ধ মৈথুনের চিহ্ন ধরে আছে হরিমতি। ভৈরব গত রাতে পাগল হয়ে গিয়েছিলো। হরিমতির ঘাড়ে, বাহুতে নখের আঁচড়ের দাগ। শ্যামলা মেয়েটা এইভাবেই ভৈরবের সমস্ত যন্ত্রণা শুষে নিতো।

ওঠেন। উইঠ্যা পড়েন মাঝি। দ্যাখতে দ্যাখতে ব্যালা হইয়া যাইবো।

হ। ওঠন তো লাগবোই। আর ভাইব্যা কাম কী?

ভৈরব দেখছিলো, হরিমতির পাশে দু'বছরের শিশু পরেশ নিশ্চিন্তে, নির্মল আনন্দে হাসি হাসি মুখ করে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

তারপর পদ্মাপারের সেই জেলেপাড়া থেকে ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর। ফরিদপুর থেকে হাঁটাপথ, কখনো বা নৌকায় মাগুরার দিকে চলা। মাঝখানে পেরোতে হলো মধুমতী নদী। নদী দেখলেই কান্না পেতো ভৈরব দাসের। ছলছল করে উঠতো চোখ দু'টো। হরিমতি বলতো, কান্দেন ক্যান মাঝি? একটা

কিসু উফায় হইবোই! ভগমান আছে না! হ্যায় দ্যাখবো। মাগুরা থেকে কালিয়াগঞ্জ। কালিয়াগঞ্জ থেকে ট্রেনে করে যশোর। যশোর থেকে বেনাপোল-পেট্রোপোল বর্ডার পার হয়ে বনগাঁ। সেই ভ্রমণের কথা কি ভোলা যায়! আজকের সত্তর বছরের বৃদ্ধ ভৈরব মাঝি চোখ বুজলেই সেই দৃশ্য দেখতে পায়। দলে দলে মানুষ, চোখেমুখে নিদারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে পথ চলছে। কাঁধে, মাথায় বোঁচকা। মেয়েদের কোলে শিশু সন্তান। কেউ বাবা-মা-দাদা-দিদির হাত ধরে হাঁটছে। কি কষ্ট গ্যাসে। ভাবন যায়। এইরহমই লোকজন, যেইভাবে আইজ আমার পোলা পরেশের লগে যাইতাছে! আইজ যেমন কষ্ট অগ, তেমুনই মা-বাবার ভিটা থুইয়া আইতে আমাগো বুক ছিড়া পড়সে।

তারপর একদিন এই চর সুলতানপুরে ভৈরব মাঝি তাঁর সরকারি বরাদ্দ বাবদ পেলো সাড়ে তিন কাঠা জমি, আর ঘর বানাবার জন্য কিছু টাকা। চর সুলতানপুরের কলোনিতেও জেলেরা তাঁদের পরিশ্রম দিয়ে শক্তপোক্ত বসতি গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি আরো অনেক কলোনি হলো। এখানেই ভৈরব দাস ধীরে ধীরে ভৈরব মাঝি হয়ে গেছে। কিন্তু রাক্ষুসী ভাগীরথী যে চর সুলতানপুরেও ছোবল মারতে শুরু করেছে!

পরেইশ্যারে! আমার পরেইশ্যা! আমারে ফ্যালাইয়া থুইয়া তুই কই গেলিরে বাবা। ডুকরে কেঁদে উঠলো ভৈরব মাঝি। অতীত ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্লান্ত পথিক আবার কঠিন বাস্তবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

•

এদিকে তখন শ্মশানে পরেশের চিতায় আগুন জ্বলে উঠলো। আকাশে মেঘ ছিলো। চিতা যখন পুরোপুরি জ্বলে উঠেছে, তখনই শুরু হলো ঝড়, সঙ্গে টিপটিপ বৃষ্টি। বাতাস পেয়ে চিতার আগুনের লকলকে শিখা আকাশের দিকে ছুটে যেতে চাইছিলো। দাদার পায়ের দিকে দাঁড়িয়েছিলো মালতী। —দাদায় শ্যাষ হইয়া যাইতাছে। আর দাদারে দ্যাখতে পারুম না গো! হা-হা করা শূন্যতা মালতীর বুকের ভেতর খরার মতো জ্বলতে শুরু করে দিলো। আর কেউ নেই মালতীর। মা মরে গেছে সেই কবে! দাদাকে বেড় দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মালতী। সতেরো বছরের তরতাজা যুবতী। কি করুম এইবার আমি দাদা গো! বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিলো মালতী। চুল থেকে কপাল বেয়ে জলের ধারা নামছিলো। বৃষ্টির আর চোখের জলে একাকার হয়ে যাচ্ছিলো সব। ঝোড়ো বাতাসে চিতা থেকে আগুনের লকলকে শিখা কেউটের ফণার মতো ছোবল দিচ্ছিলো শ্মশানযাত্রীদের। বৃষ্টিসিক্ত, উদ্ভিন্নযৌবনা, শোকে মুহ্যমান মালতী ইচ্ছে করেই যেন সেই ছোবল খাচ্ছিল। আর মনে মনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিচ্ছিলো নিজেকে। এক সময় ওর চোখের রঙ আর চিতার আগুনের রঙ এক হয়ে জ্বলতে লাগলো। এবার যুবতী মালতী পুরুষের মতো মুঠো পাকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে বললো, আমিও ছাড়ুম

না!

হয়তো রাত বারোটা বেজে গেছে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। দু'একটা খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় রাত্তিরের নদীতীর শুধুই মায়া আর মোহ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো যেন। শ্মশানযাত্রীরা ঘরে ফিরছে। অঞ্জলি হাঁটছিলো মানিকের পেছন পেছন। কালকে মানিকের শক্তিশালী হাত দু'টোর বাঁধনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও অঞ্জলি বাঁধা পড়ে গিয়েছিলো। সেই কটা মুহূর্তের কথা মনে পড়লেই অঞ্জলির যেন জ্বর এসে যাচ্ছে। কেঁপে উঠছে ও। ভয়ে নয়, অদ্ভুত এক আনন্দে। অঞ্জলি এবার কয়েক পা তাড়াতাড়ি হেঁটে মানিকের পাশাপাশি চলে এলো।

মানিকদা!

মানিক অন্যমনস্ক ছিলো। গত দু'দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ওকে তোলপাড় করে দিচ্ছিলো। অঞ্জলির ডাক শুনে চমকে উঠে বললো, কি কস?

না। কিস্যুই না। এমনিই।

তবে?

বড় ডর লাগে মানিকদা! অঞ্জলি মানিকের গা ঘেঁষে চলতে চাইছিলো। আজকের দিনটায় সবাই দুঃখের সমুদ্রে ডুবে পাথর হয়ে আছে। কেউ তাই অত কিছু গ্রাহ্য করলো না। কিন্তু মানিকের ভারী অস্বস্তি হচ্ছিলো। ওর মনে হচ্ছিলো, অঞ্জলি ভারী গায়ে পড়া মেয়ে। বড় ঢলানি।

ছয়

'তুমি এখন শুয়ে আছো মুষ্টিবদ্ধ দু'হাতে ঘুম।
পথের মধ্যে উবু হয়ে তুমি এখন স্বপ্নরত,
মধ্যরাতে আকাশভরা তারার মেলায় স্বপ্নবিভোর।
বুকে তোমার এফোঁড়-ওফোঁড়
অনেক ছিদ্র, স্বাধীনতার অনেক আলোর আসা-যাওয়া,
তুমি এখন শুয়ে আছো ঘাসের মধ্যে টকটকে ফুল।
পৃথিবীকে বালিশ ভেবে বাংলাদেশের সবটা মাটি
আঁকড়ে আছো-তোমার বিশাল বুকের নিচে।
এতটুকু কাঁপছে না আর,
এক বছরের শিশুর মতো থমকে আছে। তোমার বুকে
দু'টো সূর্য, চোখের মধ্যে অনেক নদী, চুলের মধ্যে
আগুন রঙা শীত সকালের হু হু বাতাস।
মাটির মধ্যে মাথা রেখে তুমি এখন শুয়ে আছো।'

—নির্মলেন্দু গুণ

'দিন আর রাতগুলো আসা-যাওয়া করতেই থাকে। মৃত্যু হোক বা জন্মই হোক কোন কিছুতেই কোন কিছু থেমে থাকে না। বিস্মৃতি, সে তো মানুষেরই আছে। পথ চলতে চলতে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, পুরনো দগদগে ঘাও-তো শুকোতে থাকে। যন্ত্রণা কমে আসে। দাগ থেকে যায় চিরকালের জন্য।'

জন্মমৃত্যু-ওঠাপড়ার এ-সব কথাই তো আমি লিখতে চাই। দিনগুলো আমাকে অস্থির করে রাখে। রাতের নৈঃশব্দ্য আমাকে শান্তি দেয়। আমি লিখি সারা গায়ে নৈঃশব্দ্য মেখে।

পৌলমী, তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার চিঠি আমার কাছে একরাশ সুগন্ধ বাতাস। কি সুন্দর হাতের লেখা তোমার, পৌলমী। যেন জ্যোৎস্নামাখা জলধারা। তুমি জানতে চেয়েছো, আমার লেখালিখি কেমন চলছে। কি উত্তর দিই বলো তো! যদি আমি বলি, যা আমি বলতে চাইছি, তা আমার কলমে যে কিছুতেই আসছে না পৌলমী। অমনি তুমি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাবে। বলবে, আবার সেই হেঁয়ালি শুরু হয়ে গেলো!

কিন্তু বিশ্বাস করো পৌলমী, যা আমি দেখি, যা অনুভব করি, তা আমি লিখতে পারি কই? এই প্রশ্ন তো আমি আমাকেই করি। অক্ষম কলম আমার। যে যুগকে সবার সামনে পরিষ্কার তুলে ধরবো ভেবেছিলাম, তা তেমনভাবে কিছুতেই লিখতে

পারি না। হে বর্ণমালা আমার! তোমাকে সাজিয়ে তুলতে তুলতেই আমার দিন গড়িয়ে কত রাত চলে গেলো। রাতের কলস ভেঙে মায়াভরা জ্যোৎস্না আসে যায়, কিন্তু আমি বসে থাকি। আমার কলম চলে কি চলে না। বর্ণমালা আমার! হে আমার বাংলা ভাষা! আমার অহঙ্কার, আমার প্রেম, তোমাকে একান্ত কাছে পেতে চেয়েছিলাম। তুমি ধরা দিলে কই?

আমার নিজের সঙ্গে আমার এক অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে, মহাকাব্য লিখবো একটা। কি নিয়ে লিখবো পৌলমী? বিশ্বাস তুমি করবে কি না জানি না, আমি আজো ঘুরে বেড়াই। আজো আমি খুঁজে বেড়াই, এমন একজন আশ্চর্য মানুষের স্বপ্ন দেখি আমি, যাঁকে কিছুতেই ধরতে পারি না। সেই মানুষটাকে, অথবা সেই মানুষীকে নিয়ে বসে দু'চারটে কথা বলার ইচ্ছে ছিলো, যে এমন একটা পৃথিবীর খবর দেবে, যে পৃথিবীতে সুন্দরের উপাসনা বিরামহীন। কাজী নজরুল ইসলাম সওগাতের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন'। তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই আমি কবি। বনের পাখি নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনদিন অনুযোগ করে না।......আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীনা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।' বলো পৌলমী, বিদ্রোহী কবি যে সুন্দরের কথা বলেছিলেন, এখন কে বলবে সে কথা? আমার ক্লান্তিহীন খোঁজা চলতেই থাকবে। যতদিন না পাওয়া যায় তাকে।

আমরা কোথায় আছি? কেন আছি? চারদিকের এই বিপন্ন প্রশ্ন বাতাসকে থামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কংক্রিট এই যুগে প্রশ্নের প্রতিধ্বনি ছাড়া কোন জবাব নেই। যুবক যুবতীদের শিরা-ধমনীতে সরীসৃপের মতো এই যুগ বক্র-পিচ্ছিলভাবে চলতেই থাকে। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য এনে দিতে পারে না। সবাই বাড়িমুখো আসে, রাস্তামুখো চলে যায়। ব্যস! এই পর্যন্তই। তারপরই সব শূন্য লাগে।'

.......তুমি হাসছো?

তোমার কথা শুনে হাসি পাওয়ারই কথা।

কেন?

দেখো বুধ, একটা কথা বলি। তুমি কোথায় বাস করছো?

ও, ছেলেমানুষ ভেবে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছো বুঝি! তা কলকাতাতেই তো থাকি। কলকাতা হলো পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। আর পশ্চিমবঙ্গ হলো ভারতের—

ইয়ার্কি মেরো না। কতদিন আর স্বপ্নের পাখায় ভর করে উড়ে বেড়াবে বুধ! তাকিয়ে দেখো। রাস্তায় নামো। অবাস্তবকে খুঁজে বেড়ানোর কোন মানেই হয় না!

আমি রাস্তাতেই আছি। কঠিন সে মাটি। নিষ্ঠুর এই যুগ। শয়তানের রাজত্ব চলছে তো বেশ কয়েক বছর ধরেই। যত হাঁটি, তারই চিহ্ন পাই মানুষের মেলায়। তাই একটু নির্মল বাতাস চাই পৌলমী। মনের মতো মানুষ চাই।

সেই বড় বড় কৃষ্ণকালো চোখ দু'টো তুলে ধরে পৌলমী আমার দিকে তাকালো। অমনভাবে তাকালে আমার বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে ওঠে। আমি সব গুলিয়ে ফেলি। ওই দু'চোখে অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে ওঠে। যেন মরুভূমিতে পথ হারানো দারুণ তৃষ্ণার্ত এক পথিক। একটু জলের জন্য দিশেহারা। পৌলমী, তোমার দু'চোখে এত দুঃখের ছায়া পড়ে কেন বলতে পারো? প্রথম দেখায় যে চোখ দু'টোর ব্যথাতুর চাহনি আমাকে বেঁধে ফেলেছিলো, তেমনই আজও তুমি তোমার চোখের কৃষ্ণসায়রে আমাকে ডুব দিতে ডাকো!

এই যে ভাবুকমশাই! কি ভাবা হচ্ছে? নিশ্চয়ই এমন কিছুতে আপনি মগ্ন হয়ে পড়েছেন, যে বিষয়টা আপনি বলে বোঝাতে পারবেন না। যেমন করে লেখা দরকার, তেমন করে লিখতে পারবেন না, তাই তো!

হাসিতে একেবারে লুটিয়ে পড়তে চায় পৌলমী।

ওঃ! এরকম লোক সত্যিই আমি এর আগে কখনো দেখিনি। কিমাশ্চর্যম্! একমাত্র এই কথা ছাড়া আমি আর কী-ই বা বলতে পারি!

পাগল করে দেওয়া কটাক্ষ হানে পৌলমী। কিন্তু পৌলমী! তুমি কেমন আছো?

আমি! আমি! আমি তো আছিই। যেমন ছিলাম, তেমনি আছি। ছাড়ো ওসব কথা বুধ। তোমার কথা বলো। তোমার কথা শুনতে চাই আমি।

কি এমন কথা, যা তুমি শুনতে চাও? আমি তো কথাই বলতে জানি না। আমাকে অনেকে বলে নির্জীব। কেউ কেউ বলে ভীতুর ডিম। কেউ বা বলে, বোবা নাকি!

ছোটবেলায় যে স্বপ্ন আমি দেখতাম, তা তো পেলাম না! স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলো। সে তো তোমাকে বলেছি বুধ।

তা'হলে?

তোমার কথা কী এমন কথা, তা জানতে চাও বুধ? তোমার কথা তো আমার

কাছে নিছক কথা বলার জন্য কথা মনে হয় না! তোমার কথা স্বপ্ন হয়ে ওঠে। আমার না পাওয়া স্বপ্নগুলো খুঁজে পাই তোমার কথায়। তুমি নিজেও জানো না বুধ, তুমি কি বলো।

আমি তো কিছু বলেই উঠতে পারলাম না পৌলমী। গুছিয়ে কথা বলতে জানি না আমি। কল্পনার জাল বুনে যাওয়াই আমার কাজ।

তুমি যাকে বলো আগোছালো বকা, আমার কাছে তা স্বপ্ন হয়ে ওঠে। আমি আমার ভাঙা স্বপ্নের দালানকোঠাগুলো ফের তৈরি করে ফেলি তোমার স্বপ্ন থেকে স্বপ্ন নিয়ে।

......আমি অবাক হয়ে যাই পৌলমীর কথা শুনে। নিজের শরীরে চিমটি কেটে দেখি, তন্দ্রা আসেনি তো আমার!

না। তুমি ঠিকই আছো বুধ।

ও আমার একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। শরীর শরীরের কাছাকাছি চলে আসে। ঠোঁট টিপে মিটিমিটি হাসে পৌলমী। আবার গম্ভীর হয়ে যায়। দুষ্টু চোখ দু'টো নিমেষে তীরবিদ্ধ ব্যথাতুর কোন পাখির চোখ হয়ে যায়। জলভরা আঁখিতারা টলটল করে।

পৌলমী! এমন কোরো না তুমি। কি বলতে চাও বলো। তোমার কষ্টের কথা তো আমি জানি। বলো, আর কি বলবে?

আমি তোমার চোখে চোখ রেখে প্রগাঢ় স্বপ্নে ডুবে যেতে চাই বুধ। সমাজ-সংসার তুচ্ছ হয়ে যাক।

কেন এমন কথা বলছো! তুমি কি বলছো, তুমি কি তা বুঝতে পারছো?

বুঝতে চাই না। কে বুঝতে চেয়েছে আমাকে? যাঁকে নিয়ে কিশোরীর স্বপ্ন জন্ম নেয়, যুবতীর স্বপ্নের বাসা গ'ড়ে ওঠে, এমন এক পুরুষ চেয়েছিলাম আমি, যে আমাকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। শুধু নেওয়া নয়, উজাড় করে দেওয়ারও একটা জায়গা থাকা চাই। তাই নয় কি!

তোমার স্বামী আর তোমার সংসারকে তুমি উজাড় করেই তো দিচ্ছো। সাগরমেলায় তো দেখলাম, স্বামীকে কিভাবে আগলে রেখেছো। যেটুকু দেখেছি, তাতে এটুকু অন্তত বুঝেছি, সব দিকে তোমায় নজর আছে। একেবারে পাক্কা গৃহিণী।

না, না, না! প্রতিদিন এভাবেই আমি গৃহিণী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। আমি তো দিতেই চাই। কিন্তু যাঁকে দিচ্ছি, তাঁর কি নেওয়ার ইচ্ছে আছে? না কি সে নিতে জানে!

কোথায় মিলছে না, ভালো করে খুঁজে দেখো। ভুল বোঝাবুঝির জায়গাটা যদি দু'জনেই ধরতে পারো, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। দেখে নিও!

দু'জন। কোথায় দু'জন দেখলে? সারাদিন আমি একা। আর যেখানে একান্ত ব্যক্তিগত শয্যার কাহিনী রচনার কথা ছিলো, আমার সেই রাতের রূপকথায় কোনো রাজপুত্র আসে না। যে আমার মনের প্রতিটি তার ছুঁয়ে যাবে, আনন্দ ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়বে, মধুমাস আসবে আমায় প্রতিটি রক্তকণায়। গোলাপের পাপড়ি মেলার মতো আমার সমস্ত লজ্জা-আবরণ তাঁর পরুষ আঙুলের খেলায় মেঝেতে গড়িয়ে পড়বে। আমার সমস্ত মন হবে তাঁর। আমার সকল শরীরও তাঁর। বালিকা পৌলমী তার ইচ্ছে আশার চারাগাছের গোড়ায় স্বপ্নের ঝাঁঝরি দিয়ে এভাবেই জল ঢেলে গিয়েছে। সে গাছ অকালে মরে গেলো বুধ।

দাম্পত্য কি জানো তো! যখন ঠিক মেলে না, তখন একটু উল্টে-পাল্টে আগু-পিছু করে মিলিয়ে নিতে হয়। দেখে নিও, সব একদিন সমান সমান হয়ে যাবে। সবুর কর তুমি। আজ যেখানে ঐকতান মনে হচ্ছে, কাল সেখানেই দ্বৈতকণ্ঠ গুনগুন করে গান গাইবে।

শোনো বুধ! স্পষ্ট করে বলি। আমার জীবনে কোন দ্বৈতকণ্ঠ নেই। দু'জন—এই কথাটাই আমার জীবনে এখনো আসেনি। দু'জন হবার চেষ্টা ছিলো একমাত্র আমার। ওঁর নয়। বললাম না, সারাদিন আমি একজন। রাতভর আর একজন। সে তো মানুষ নয়! সে এক যন্ত্র। আমি যখন কাঙালিনী হয়ে উঠি রোজ রাতে, একটু ভালোবাসার জন্য, সে তখন হুলো বেড়ালের মতো শুধুমাত্র ঝাঁপিয়ে পড়তেই ব্যস্ত।

চুপ করো পৌলমী! চুপ করো! তোমার একান্ত অনুভূতির কথা সবাইকে বোল না।

চুপ করতে পারছি না।

কেন?

একটা কেরিয়ার সর্বস্ব মানুষ, যে নিজেকে ছাড়া আর কিছু বোঝে না, জানে না, তাকে কোনোভাবেই যে মনের মধ্যে জায়গা দিতে পারছি না!

চেষ্টা করো। সময় সবকিছু পাল্টে দেবে।

চেষ্টা আমি করেছি। আর নয়। বৌ তাঁর কাছে একটা ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেমে, ভালোবাসায়, বাসনা-কামনায় আমি পরিপূর্ণ নারী হতে চাই। শুধুমাত্র সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সম্পত্তি নই।

বোধিসত্ত্ব বিষণ্ণ হাসে। বলে, পৌলমী, কারোর প্রেম দেরিতে আসতে পারে। তার পেছনে তাঁর বড় হয়ে ওঠার পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে। তুমি তাকে জাগিয়ে তোলো। একদিন দেখবে, তোমার প্রেমে সে পাগল হয়ে উঠবে।

এমন করে তুমি কথা বলো বুধ। এত বোঝো, এতটা বোঝাও, যে, আমি আর

স্থির থাকতে পারি না। তোমাকে চিঠি দিই। সুযোগ পেলেই ছুটে আসি। তোমার প্রতিটি কথা বুকের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে আমার।

'...এ-এক অদ্ভুত বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি আমি। এ বাঁধন না যায় ধরা, না যায় ছাড়া। একটা মন বলে, বুধ, এই রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও! আর একটা মন বিবেকের সাথে লড়াই করে।—যে তোমার সাহায্য চাইছে, তাকে তুমি ঠেলে ফেলে দিতে পারো না— তাহলে আমি কোথায় যাই?'

...চুপ করে আছো বুধ! কি ভাবছো? কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি! প্রতি রাতে মনে হয়, একটা রোবোটের সঙ্গে আমার অনিচ্ছুক মিলিত হওয়া। অনিচ্ছা আর ঔদাসীন্যে যন্ত্র হয়ে আমি খুলে ফেলি লজ্জার খোলস। পুরুষের শরীরের দাবি আমার মনের দাবিকে উপেক্ষা করে। আমাকে পাঁকে নামিয়ে দেয়। হ্যাঁ। আমি খেলা করি। জলজ জন্তুর সঙ্গে লজ্জাহীন হয়ে, উন্মত্ত আমি খেলা চালিয়ে যাই। সব শেষে সেই ঘেন্নার পাঁকের মধ্যে আমার প্রতি রাতের অপবিত্র সুখের মরা মুখ দেখতে পাই আমি। রাতভর আমি কাঁদি। আমার কান্না শোনার অপেক্ষা করে না তৃপ্ত পুরুষটি। এমনি করে চলতে থাকলে হয় আমি পাগল হয়ে যাবো, নয়তো মরেই যাবো।

'এ-সব বোলো না পৌলমী। সময়ের হাত ধরে চলতে হবে। চলতে চলতে কোথায় যাওয়া যায় দেখাই যাক না! আর আমি কিই বা বলতে পারি। আমি তো কথাই খুঁজে পাই না। আমি পিনাকী নই। চূড়ান্ত আবেগে ভেসে গিয়ে একটা কিছু করে ফেলা আমার চরিত্রে নেই। করে ফেললে তারপর? ভার বইবার শক্তি আছে আমার? পৌলমী, তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। তুমি তো সেদিন থেকেই আমাকে রঙিন ক'রে দিয়েছো। যেদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো। তোমাকে ভালোবাসি, সাহস করে এমন কথা বলার সাহস নেই আমার। নিজে হীনমন্যতায় ভুগি. এ-যুগের এক ব্যর্থ চরিত্র আমি। সঙ্কোচ আমার সঙ্গী, তুমি তো জানই. জড়তায় আমার চলা থেমে যায়। আমি শুধু চলার চেষ্টা করি। তুমি এসেছো আমার জীবনে. এক অদ্ভুত সময়ে। আমি বুঝে উঠতে পারি না, কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার? প্রেমিকা? বন্ধু? মনের মানুষ? না কি প্রিয় সখী? যে-কথা আমি কারোর সামনে বলতে পরি না, সেই সব মনের কথা অনর্গল তোমাকে বলে ফেলি। তা হলে? তুমি আমার কে? আমিই বা তোমার কে? আজন্ম সংশয়ী আমি, দ্বিধা যে আমার কিছুতেই কাটে না!'

...কি হলো? পৌলমীর হাসিমাখা মুখ ভেসে উঠলো আমার সামনে। সমস্ত বিষণ্ণতা মুছে গেছে ওঁর। যেন বলতে চায়, 'সখী গো, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম/কানের

ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো......'

আমাকে নিয়ে লিখবে না কিছু বুধ? লিখো, লিখো অন্তত কিছু। আমি তোমার সৃষ্টিতে অন্তত বেঁচে থাকি বুধ।

বেঁচে তো থাকবেই, সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু আমার সৃষ্টির কথা বললে তো! তোমাকে তো সবসময়ই বলি, মহাকাব্য লিখবো ভেবেছিলাম। কিন্তু লেখার মতো মানুষ কই! শোন, একটা কথা তোমাকে বলি পৌলমী, লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি. দীঘল গড়ন, কখনো বিষণ্ণ, কখনো চটুল, কপালে সিঁদুর, তোমাকে আমি রচনা করে চলেছি সর্বত্র।

তুমিই বলো, এমনি করে কথা বললে আমি ঠিক থাকি কী করে? তুমি আমার সবটুকু এভাবেই দখল করে নিয়েছো। তোমার কথা শুনলেই আমি আমাকে খুঁজে পাই। যে পৌলমী প্রেম চেয়েছিলো, যাঁর গহীন বনের অন্ধকারে সুখের মাদল বেজে ওঠে। ইচ্ছে করে মনুর বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন তছনছ করে দিয়ে তোমার সামনে নিজেকে মেলে ধরি।

থামো, পৌলমী, তুমি থামো। তোমাকে আমি সুন্দর ক'রে নানা রঙে, নানান ভঙ্গিতে তৈরি করি। একজন সম্পূর্ণ নারী হও। আমি কলম তুলে নিই হাতে।

হ্যাঁ গো। তুমি আমাকে সৃষ্টি ক'রে নিও৷ তুমি কবি। আমার কবিঠাকুর।

......কবি ঠাকুর? কে যেন বলেছিলো একদিন? হ্যাঁ মনে পড়েছে। সেদিনটার কথা ভুলি কী করে! সেই পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিলো মানিক বোস।

...'মাঝ-সাগরে ভেলা ভাসালাম,
বুকের মধ্যে বাজলো ধূম।
ভুবনজোড়া কবিঠাকুর,
তোমার গানে ভাটিয়ালি,
শ্যামল বাংলা বৈষ্ণব সুর...'

রেবতীবাবু স্যা'র বলেছিলেন, মানিকের মৃত্যু আমার জীবনের চরম ভুল। ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতা।

আমি সপ্রশ্ন তাকিয়েছিলাম আমার প্রাক্তন অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের দিকে।

কেন?

.ওনাকে বলেছিলাম. শ্রমিকরা বাউড়িয়ায় জুট মিল গেটে মানিককে সংবর্ধনা দিয়েছিলো ওর বাবা মৃত ললিত বোসের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য। কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়া আরো একজন শ্রমিকের পরিবারও মালিকের কাছ থেকে একটি পয়সা আদায় করতে পারেনি। সেদিনের সভায় সেই পরিবারটিও হাজির ছিলো। মানিকের

সঙ্গে পরে ওরা দেখা ক'রে এ-ব্যাপারে কি করা যায় তা জানতে চেয়েছিলো। মানিক বলেছিলো, আপনাদের কেউ কাগজপত্র নিয়ে কলকাতায় শ্যামপুকুর স্ট্রিটে আমাদের বাড়িতে আসুন। দেখা যাক, কি করা যায়। একটা কথা কি জানো বোধিসত্ত্ব!

কি?

যুদ্ধে নেমে শত্রুপক্ষকে যদি তুমি স্ট্র্যাটেজিটা বলেই দিলে. শতকরা নব্বুই ভাগ হার হয়ে গেলো তোমার। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোপনীয়তা মাস্ট।

এক্ষেত্রে কি এমন কোন ঘটনা ঘটেছিলো?

হ্যাঁ। মানিক তো পোড় খাওয়া কোন ট্রেড ইউনিয়ন লিডার বা কর্মী ছিলো না! ও তো ছেলেমানুষ। কথাটা ও সবাইকেই বলেছে। এ-কান ও-কান হয়ে সেই কথা কর্তৃপক্ষ অবধি গেছে। ওরা দ্রুত খুনের ছক কযে ফেলেছিলো. যা আমাদের বোঝা উচিৎ ছিলো।

বোধিসত্ত্ব একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না. রেবতীবাবু স্যার এইসব দায়ভার নিজের কাঁধে নিচ্ছেন কেন! এই ঘটনায় তিনি শুধুমাত্র সামাজিক কর্তব্যবোধ আর মানবিক দিক থেকেই নিজেকে ব্যর্থ ভাবছেন? না কি অন্য কোন দায় আছে তাঁর?

বুঝলে বোধিসত্ত্ব, সেদিন বিকেলে জুটমিলের আর এক মৃত শ্রমিক নিরাপদ বাউড়ীর ছেলে প্রশান্ত বাউড়ী তার বাবার মৃত্যু-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে মানিকদের বাড়িতে এসেছিলো। রাতে থেকে গিয়েছিলো সে। প্রশান্তকে অনুসরণ করেই একটা দল এসেছিলো এ-পাড়ায়। পাড়ার মস্তানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে এই দু'জনকে খুন করা হয়েছিলো ঐ রাতে। পুরো ছকটাই আমরা পরে জানতে পেরেছি। মালিকপক্ষ, বা শোষকশ্রেণী যাই বলো না কেন, পথের কাঁটা দূর করতে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ওরা বিবেকহীন।

আপনি এই সব ব্যাপার জানলেন কি করে?

কয়েকদিন অপেক্ষা করো। অবশ্যই বলবো। নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার কোন মানুষই সহ্য করবে না। অবহেলা, অনাদর, আর অত্যাচারের প্রতিবাদ হবেই। মানুষের চরিত্রই তাই। যে লোকটা কারুর সাতে পাঁচে থাকে না, দেখা যাবে দুর্দিন ঘোচাতে ভেতরে ভেতরে সে কত সাহসী কাজ করেছে। লোক দেখানো সাহসীরা তার একশোভাগের একভাগও করতে পারবে না। আমি তাঁদের মতো মানুষকে পছন্দ করি। শ্রদ্ধা করি।

উনিশশো পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জুন। গভীর রাতে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো, সারা দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছে। পরদিন খবরের কাগজ পড়ে দেশের

বেশির ভাগ মানুষ খবরটা জানলো।

সকালবেলা ন্যাপলাদার চায়ের দোকানে বোধিসত্ত্বই আগে চলে গিয়েছিলো। ওর সঙ্গীসাথী কেউই তখনো ভিড় জমায়নি। দু'চারজন বয়স্ক লোক, যাঁরা সকালের রোজকার খদ্দের, তাঁরা কাঠের বেঞ্চিটাতে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। বিশাল হেডলাইন হয়েছে কাগজে। 'দেশজুড়ে জরুরী অবস্থা জারী।' একটা খবরের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বেশ ক'জন। খুঁটিয়েই পড়ছে সবাই। কেউ কোন মন্তব্য করছে না। বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য করছিলো, সবার চোখেমুখেই চাপা আশঙ্কা।

ন্যাপলাদা, একটা চা দাও।

বোধিসত্ত্ব শুধু লোকগুলোকে দেখছিলো। প্রত্যেককেই সে চেনে। সবাই ছাপোষা মানুষ। জরুরী অবস্থার খবরটা সবাই পড়ছে বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলছে না।

হঠাৎ একটা শোরগোল উঠলো। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর মুখ ততক্ষণে ভয়ে আমসি হয়ে গেছে। বোধিসত্ত্ব রাস্তা বরাবর তাকিয়ে দেখলো, কংগ্রেসের এক হোমরাচোমরা নেতা দলবল নিয়ে এদিকেই আসছে।

উঁচু কলারওয়ালা খদ্দরের পাঞ্জাবি, চোস্তাই প্যান্ট, চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা দশাসই চেহারা। কপালে একটা লাল টিপ। চোখ দু'টো জবাফুলের মতো টকটকে লাল। কংগ্রেসের এই নেতাকে ঘিরে থাকে হাতকাটা ভুলু, পিন্টা, চোর ভজুয়া, ল্যাংড়া, চিংড়ি, কেটলি, হাফ বাটালি, বাঙালবাবু এইসব নামের মস্তানরা। এখন পুরো দলটাই লোকটার সঙ্গে আছে। রাস্তা কাঁপিয়ে ওরা আসছিলো। রাস্তার মোড়ে এসে ওরা থামলো। সামনের লোকগুলোকে একবার দেখে নিলো। দোকানের ভেতর থেকে ন্যাপলাদা বত্রিশপাটি দাঁত বার ক'রে হেঁ-হেঁ ভঙ্গিতে বললো, টবলুদা। ক'টা চা হবে?

ডাকসাইটে কংগ্রেসী নেতা পাঞ্জাবির কলারটা বাঁ হাত দিয়ে একবার নেড়ে নিয়ে ভুসভুসে গলায় আওয়াজ ছাড়লেন, আব্বে অ্যাই বাটালি! ক'জন আচিস?

ওস্তাদ, এক ডজন।

শুদু চা! না আর কিছু বলবো?

গুরু, কি বলবো?

শুদু চা হোক।

আজ ম্যাডামের জন্মোদিনে বাঁ—শুদু চা এই সক্কালবেলায়!

ম্যাডামের জন্মোদিন! তোকে কে বললো বে?

ওই যে লাট্টুদা বললো। তুমি বাঁ-কিচ্চু মাতায় রাখচো না।

আাই ল্যাংড়া! গান্ডুটাকে ধরে দু'টো কোংকা লাগা। সুয়োরের বাচ্চার হাতে জাতীয়

কংগ্রেসের তেরঙ্গা ধরিয়েচি, গান্ডু এখনো পলিটিক্সটাই শিকলো না।

অ্যাই পিন্টা, শোন না বে, টবলুদা কি বলছে! শ্লা নকশাল ভাগালি, সি পি এম ভাগালি। এখন পয়দাপানির ব্যবস্তা হলো, আর শ্লা আজকে কিসের জম্মোদিন সেটা জানো না!

লে লে! আচ্ছা কেলো করেচিস! সুনে লে! এমার্জেন্সি ডিকলেয়ার হলো আজ। কান খুল কর শুন লে। ফিন্ বাঁ-উল্টাপাল্টা রিমার্ক পাস করবি তো লাস ফেলে দেবো।

ল্যাংড়া নামের ছেলেটাকে দেখে বোধিসত্ত্ব স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলো। 'কোথায় যেন এটাকে আমি দেখেছিলাম! কোথায়? স্মৃতি এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেন আমার?

অ্যাই ন্যাপলা! হাঁ করে দেকচিস কি রে! চা লাগা বারো খানা। আর ডিম পাঁউরুটি ভি এক ডজন।

এবার বলো গুরু এমাজেন্সির জম্মোদিনের কেসটা। বুঝে লি ভালো করে।

আরে বাঁ—, এমাজেন্সির জম্মোদিন অবে কেন? শ্লা, যারা দেসের সাদিনতা আনলো, সেই সহীদ রোবিন্দনাথ, নেতাজী, ক্ষুদিরাম, নিবেদিতা, বিবেকানন্দের দেসের মানুস হয়ে একনো কিচু বুঝলি না! শোন্ তা হলে—

বলেই কংগ্রেস নেতা টবলু মিত্তির ফের বাঁ হাত দিয়ে তার পাঞ্জাবির কলারটা নেড়ে নিলো।

শোন্! এমার্জেন্সি হলো সব্বোজনীন জরুরী অবস্তা। থুরি! আর বলিস না মাইরী! তোদের জন্য সব্বোজনীন দুগ্গোচ্ছব সব্বোজনীন শ্যামাপুজোয় বক্তিতে দিতে দিতে জিভের আগায় সব্বোজনীন কতাটাই চলে আসে। অ্যাই ন্যাপলা! ডিম পাউরুটি হলো! জরুরী অবস্থা হয়ে গেছে দেসে। যেমন কতা, তেমন কাজ। মেরা ভারত মহান! কতা কম কাজ বেশি!

বোধিসত্ত্বর বমি এসে যাচ্ছিলো। ও চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো বললো, ন্যাপলাদা, দামটা আমার অ্যাকাউন্টে লিখে রেখো।

একটু গিয়েই সজলের সঙ্গে দেখা। বোধিসত্ত্বর মনে হলো, সজল বেশ চিন্তিত।

কি হলো?

না, কিছু হয়নি। তোর খোঁজেই যাচ্ছিলাম। মাসিমা বললেন, ন্যাপলাদার দোকানে চা খেতে গেছিস। চলে এলি কেন? চ', চা খেতে খেতে দু'চারটে কথা বলি।

না, ওখানে যাব না। টবলু মিত্তির আর একগাদা নোংরা কীট ন্যাপলাদার দোকানে চা খাচ্ছে। অশ্রাব্য সব মুখের ভাষা।

বামপন্থীদের তাড়াতে জাতীয় কংগ্রেসের কালচারকে এতটাই নিচে নামাতে হয়েছে। অসহ্য!

কথা বলতে বলতে সজলের মুখ থমথমে হয়ে গেলো। সি পি আই এম পার্টি করতো বলে এই ট বল্ মিত্তিররা বাহাত্তর সালের এপ্রিল মাসে সজলকে পাড়া থেকে পালাতে বাধ্য করে। মৃত্যুর মুখোমুখি চলে এসেছিলো সজল। ময়দানের কাছে পড়ে ছিলো ওর রাজনৈতিক সহকর্মী মনোজের লাশ। মধ্যমগ্রামে একটা নালার মধ্যে দেখা গিয়েছিলো দেবাশিসের গলাপচা দেহ। সজল মরেনি। কংগ্রেসের এক প্রবীণ নেতা জানতে পারেন, সজলকে খুন করার ব্লু প্রিন্ট হয়ে গেছে। তিনি সজলের জ্যেঠার মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন ওঁকে। সজল তাই মরেনি। সে পালিয়েছিলো। পঁচাত্তর সালের গোড়ায় ও ফিরে এসেছে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও বোধিসত্ত্ব দেখেছে ওর চোখে-মুখে ছাইচাপা আগুন।

বুধ, তোকে খুঁজছিলাম। রেবতীবাবু তোর খোঁজ করছিলেন। চল একটু। ওনার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

এখনই?

এখন গেলেই ভালো। কাগজ দেখেছিস? সেন্ট্রাল গভ্‌মেন্ট সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। বিরোধী দলের পলিটিক্যাল ফেলোদের ওপর আর এক দফা ঝামেলা করবে বলে মনে হচ্ছে। অ্যালার্ট তো থাকতেই হবে। একটু ডিসকাস করা দরকার। চল্ ঘুরে আসি একবার।

রেবতীবাবু আজ অসম্ভব গম্ভীর। তিনি কোন ভনিতা না করেই কথা শুরু করলেন।

শুনেছো তো বুধ, সেন্ট্রাল গভ্‌মেন্ট এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছে!

হ্যাঁ। কাগজে পড়লাম।

আমার একটু ভয় হচ্ছে। কেননা, এর একটা অন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ইন্দিরা কংগ্রেসের। অন্তত আমার ধারণা তাই।

কি রকম স্যার?

প্রথমত, এখন নতুন করে জরুরী অবস্থা জারীর কোন মানেই হয় না।

কেন?

একাত্তর সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হলো। তখন ভারতীয় সংবিধানের তিনশো বাহান্ন নম্বর ধারা প্রয়োগ করে সেন্ট্রাল গভ্‌মেন্ট জরুরী অবস্থা জারী করেছিলো। তা কিন্তু আজো উইথড্র করা হয়নি। এটা মরা মানুষকে দ্বিতীয়বার ফাঁসি দেওয়ার মতো ব্যাপার হলো বলা যায়।

তা আপনি ভয় পাচ্ছেন বলছেন। কিন্তু কেন?

সেটাই বলছি। গুজরাটে নব নির্মাণ সমিতি আর বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সেন্ট্রাল গভ্‌মেন্টের এগেনস্টে মুভমেন্টগুলো বেশ দানা বেঁধেছে। ভেতরে ভেতরে সারা দেশেই ইন্দিরা গান্ধীর ডিকটেটরশিপের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো একজোট হচ্ছে। মুভমেন্টের তোড়জোড়ও চলছে। আবার কংগ্রেস দলের ভেতরেও মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ দেখা যাচ্ছে। এই দু'টো দিকে লক্ষ্য রেখেই আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছে ইন্দিরা গান্ধী। আপাতত সে এক ঢিলে দুই পাখি মারলো বটে, তবে ইন ফিউচার এগুলোই হবে আমাদের প্লাস পয়েন্ট।

কোন দিক দিয়ে প্লাস পয়েন্ট?—প্রশ্নটা সজলের।

দ্যাখ সজল, ওয়েস্টবেঙ্গলে সি আর পি, পুলিস আর পোষা গুন্ডাদের দিয়ে ওরা বামপন্থীদের তো বটেই, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরও বর্বর অত্যাচার করেছে। খুন, জখম নির্বিচারে চালিয়েছে। এমনকি কংগ্রেসের ভেতরের গণতান্ত্রিক ভাবনার মানুষগুলোকেও ওরা অপমান করছে। দু'এক জনকে খুনও করেছে। অবশিষ্ট ভারতের মানুষজনের কাছে খবরটা হয়তো পৌঁছেছে, কিন্তু কতটা নিষ্ঠুরতা আর কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার সঠিক চেহারা তাঁরা দেখেননি। তুই দেখে নিস সজল, এমার্জেন্সির নাম করে তাবড় তাবড় বিরোধী নেতাদের এবার অ্যারেস্ট করবে। ফলে এতদিন যে লড়াইটা আমরা একা লড়ছি, দাঁত কামড়ে পড়ে আছি, তা আর থাকতে হবে না। এই ইস্যুতে যৌথ মুভমেন্ট করা যাবে।

'রেবতীবাবুরা এতদিন ধরে লড়াই করেছেন? কোথায়? দেখা যাচ্ছে, সজলও এর সঙ্গে জড়িত। সজল কি তা' হলে গোপনে রাজনৈতিক কাজ করে যাচ্ছে! তবে এটা ঠিক, সজলের চোখে-মুখে সবসময় যে তীব্র দীপ্তি, কাঠিন্য আর জ্বলন দেখি, তাতে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় বৈকি! তবে এটাও সত্যি, ওরা দারুণ সতর্ক। এটা মানতেই হবে, যদি ওরা এখনো সি পি এম-এর সঙ্গে থেকে থাকে, টবলু মিত্তির আর তার দলবল যদি একটুও বুঝতে পারে, পাড়ায় এঁরা সি পি এম-এর হয়ে কাজ করছে, তবে আর রক্ষা থাকবে না। কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে।' বোধিসত্ত্বর ভাবনা ধাক্কা খেল রেবতীবাবুর কথায়—

বোধিসত্ত্ব, আমাদের কথাবার্তা শুনে তুমি একটু ধাঁধায় পড়েছো! তাই তো?

ঠিক তা নয়। তবে আপনি যেভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন, তাতে এই নোংরা সময়েও একটু ভরসা পাই। মনে হয়, এই নোংরামির প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠি। কিন্তু জানি, এদের বিরুদ্ধে একা কিছু করতে পারবো না। ওরা ছাতু করে দেবে আমায়।

ঠিকই বলেছো। যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন স্বৈরাচারীদের হাতে, তখন দুর্বলকে কৌশল নিতেই হবে। মুখোমুখি লড়াই করা যাবে না। হঠকারী লড়াই আত্মহত্যার শামিল।

স্যার, আমি আদৌ লড়াই করতে পারবো কি না জানি না। এটাই হয়তো সত্যি কথা, কিন্তু মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। এই তো একটু আগে ন্যাপলাদার চায়ের দোকানে টবলু মিত্র আর তার নোংরা সঙ্গীগুলোর আচার-আচরণ, অশ্রাব্য গালাগালি শুনে চিৎকারে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু আমি কাপুরুষ, ভীতু, যতই মুখে বড় বড় কথা বলি, প্রতিবাদ না করে চুপ করে উঠে এলাম। সে-যে কি যন্ত্রণা, স্যার আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না।

কারেক্ট! বোধিসত্ত্ব, তোমাকে আমি ডেকেছি এই জন্যই। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার যন্ত্রণা আছে। আমারও তো যন্ত্রণা আছে! আমি এই ক'বছরের রক্তাক্ত সময় শুধুই দেখে যাচ্ছি। আমি যাদের কৈশোর থেকে পড়িয়েছি, যৌবনে এসে কলেজে ভর্তি পর্যন্ত যাঁরা আমার ছাত্র ছিলো, এমন বেশ কয়েকজন দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এই সময় নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। আমি তো তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারিনি! আবার চোখ বুজে থাকতেও পারছি না। বুক জ্বলে যায় আমার। তুমি তো জানো, সজলের দুই প্রিয় বন্ধু, রাজনৈতিক সহযোগী মনোজ আর দেবাশিসকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে খুন করা হয়েছে। সজলেরও সেই দশা হতো। খুনিদের দলেও কিছু মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ আছেন। এমনই একজনের জন্য সজল বেঁচেছে। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। মনে রাখবে, আমাদের মতো তিনিও এমনই মনের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছেন। কংগ্রেস যে এমন খুনি আর গুন্ডায় ভরে যাবে, স্বপ্নেও তা তাঁরা ভাবেননি। যাই হোক, এমনই যন্ত্রণা পাচ্ছেন বহু মানুষ। তাঁদের এক জায়গায় জড়ো করার চেষ্টা করছি আমি।

আপনি একা এই কাজ করতে পারবেন? এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে! বোধিসত্ত্বর সেই সংশয়ী মন আবার জেগে উঠলো। যে প্রশ্ন সে একদিন পিনাকী সিন্‌হাকে করেছিলো, আজও তাঁর সেই একই জিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে উঠলো।

.....'আমি যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি। আমি তো তেমন মানুষ আর তেমনই এক আদর্শ খুঁজে বেড়াচ্ছি। যা এই অন্ধকার সময়কে মোকাবিলা করতে পারবে। আমি তো এমন সব চরিত্র, আর এমন সব কাজ দেখতে চাই, যা যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে মেনে নেওয়া যায়। আমি সেই সব মানুষগুলোকে নিয়েই তো লিখতে চাই! নইলে যে আমার প্রতিটি বিনিদ্র রজনী, নিস্ফলা হয়ে যাচ্ছে।'....

রেবতী চ্যাটার্জি সামান্য হেসে বললেন, আমি তো জানিই, যুক্তিহীন কোন কাজে তোমার সায় পাওয়া যাবে না। এই জন্যই তুমি আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছো।

আজ উনিশশো পঁচাত্তর সালের ছাব্বিশে জুন। এখন বেলা সোয়া এগারোটা বাজে। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। হয়তো দুপুরের দিকেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

......আবেগমথিত কণ্ঠে রেবতী চ্যাটার্জি বলে চলেছেন। বোধিসত্ত্ব মন্ত্রমুগ্ধ। সজল নির্বাক. চিত্রার্পিত।

এ-রকমই কালো মেঘ আমাদের সামনের দিনগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবুও আমি মনে করি, পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী শক্তির উত্থান আটকানো যাবে না। তুমি তো জানো, সজল একসময় খোলাখুলি সি পি আই এম দলের কাজ করতো। ঝড়ও বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। এখনও সে এই দলের সঙ্গে আছে। আমিও আছি। আমি পার্টির এই অঞ্চলের সম্পাদক। দু'জনকেই আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতে হচ্ছে। এ-যেন ধারালো কোন বর্শার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা। একটু এধার-ওধার হয়ে গেলে বুকে গেঁথে যাবে বর্শাটা।

বোধিসত্ত্ব খানিকটা হতভম্ব। ওঁর অনুমান পুরোটাই সত্যি। তবে এভাবে রেবতীবাবু তাঁকে বিশ্বাস করে সবটা জানিয়ে দেবেন, এমন কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

যা বলছিলাম। অনেক কথা তোমায় বলবো বলে ডেকেছি। তুমি আমাদের দলে যোগ দাও, এ-কথা আমি বলবো না। তবে আমি তোমাকে বলছি, তুমি আমাদের সাহায্য করো। তোমাদের মতো ভালো ছেলেদের তো চাই আমরা।

কি সাহায্য করবো?

দেখো, এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠবে। তোমাকে ডিটেলে এত কথা বলার আর স্কোপ পাবো কি না কে জানে! তাই আজকেই একটা প্রাথমিক ধারণা করে দিচ্ছি আমি। তোমাকে এর আগেও বলেছিলাম, সত্তরের দশকে নকশালপন্থীদের ব্যক্তিহত্যার মুভমেন্ট বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের এগনোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। তুমি তা মানতে চাওনি সেদিন।

ওদের আত্মত্যাগ তো ছিলো!

ছিলো। তবে তা আনাড়ির মতো। ভূমিহীন কৃষকদের জমি দখলের লড়াইকেও কার্যত ওঁরা পিছিয়ে দিয়েছিলো।

কিভাবে? এটা কী করে হয়! ওদের লড়াইই ছিলো মূলতঃ জোতদারদের বিরুদ্ধে।

বলছি। প্রমাণ বা যুক্তি ছাড়া আমি একটাও কথা বলবো না। স্বাধীনতালাভের পর থেকে কংগ্রেসী আমলে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের হাজার হাজার একর খাস জমি কিন্তু সরকার নেয়নি। সাতষট্টিতে জেলার বীরপাড়া ও তোরষা চা বাগান আর দার্জিলিং

জেলার ফুগড়ি ছাড়াও আরো বেশ কিছু বাগানের তিন হাজার একরেরও বেশি জমি কৃষক ও ভূমিহীনরা দখল করেছিলেন। তথাকথিত আইনের পথে এই কাজ হয়নি। তবুও যুক্তফ্রন্ট সরকার দখলকারি কৃষকদের পুলিস দিয়ে ওঠায়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার তখন জলপাইগুড়ি যান। দখলি সেই জমি বিলি বন্দোবস্ত করার কথা বলে আসেন। এভাবেই আমরা চেয়েছি কৃষক আন্দোলন বা জমি দখলের ক্ষেত্রে আইনী সুযোগকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে। অন্তত শান্তিপূর্ণভাবে যতটুকু পারা যায় আর কি!

কিন্তু নকশালপন্থীদের অপরাধটা কী?

উদাহরণ দিচ্ছি। নকশালবাড়িতে জোতদার নগেন চৌধুরীকে হত্যা করা হয়েছিলো। এই অঞ্চল ছিলো নকশালপন্থীদের ঘাঁটি। কিন্তু যেটা আসল কাজ, সেই জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করার কাজটা কিন্তু ওরা করেনি। সেই গ্রামেই কিন্তু কয়েকশো বিঘা আবাদযোগ্য সরকারি খাস জমি পতিত অবস্থায় পড়েছিলো। অকারণ রক্তপাত, যা শাসকশ্রেণীকে কড়া ব্যবস্থা নেবার অজুহাত যোগায়, ওরা তাই-ই করেছিলো।

এই ঘটনাতেই একেবারে জমির লড়াই পিছিয়ে গেলো?

এ-রকমই অজস্র ঘটনা আছে। একটা ঘটনাই তোমাকে ডিটেলে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি।

বলুন।

এই ঘটনার পরে জোতদার আর পুলিসের একটা অংশ মরীয়া হয়ে উঠলো। ফের হরেকৃষ্ণ কোঙার এগিয়ে এলেন। মীমাংসার সূত্র হিসাবে বললেন, জমির আন্দোলনকারী যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা আছে, আদালতে হাজির হলেই তাঁরা জামিন পাবেন। আন্দোলনকারীরা মীমাংসাসূত্র মেনে নিয়েছিলেন। এই কাজটা যদি ভালোভাবে হতো তা'হলে জোতদার-পুলিসের ষড়যন্ত্র আটকে দেওয়া যেতো। জমির আন্দোলনও গতি পেতো। কিন্তু তা হয়নি।

একটা কথা বোধহয় বুধকে বুঝিয়ে বলা দরকার স্যার।—সজল রেবতীবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললো।

কি কথা বল্ তো?

সেটা হলো, ভোটে তখন যক্তফ্রন্ট জিতলেও পুলিস, প্রশাসন, আমলাদের মধ্যে কংগ্রেস ও জোতদার-ধনীদের লোকজনই গিজগিজ করছিলো। ফলে সেই ঘটনায় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার জানতেও পারলেন না যে, সেখানে পুলিস ক্যাম্প বসে গেছে। কোঙারের মীমাংসাসূত্র কোনো অজ্ঞাত কারণে কাজে লাগানো হলো না। একজন পুলিস অফিসার তীরের আঘাতে মারা গেলো। পরের দিন পুলিসের

গুলিতে প্রাণ হারালেন সাতজন সাঁওতাল মহিলা, দু'টি শিশু আর একজন কৃষক।

এবার রেবতীবাবু বললেন, খুব গভীরভাবে যদি ঘটনাগুলো লক্ষ্য করো বুধ, তবে কূটকৌশলটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারবে। হ্যাঁ সজল, তোমার কথা শেষ করো।

জোতদাররা কৌশলে প্রচার করলো, হরেকৃষ্ণ কোঙার আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিসী হস্তক্ষেপের কথা বলে গেছেন। এদিকে নকশালপন্থীরা বলতে লাগলো, সি পি এম নেতৃত্ব জোতদারের দালাল হয়ে গেছে। আর একদল চিৎকার করতে লাগলো, যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যে অরাজক অবস্থা নিয়ে এসেছে। পরে আরো একধাপ এগিয়ে ওরা বলতে শুরু করলো, সি পি আই এমই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বারোটা বাজাচ্ছে। সাতষট্টি সাল থেকে আজকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত খবরের কাগজগুলো সি পি আই এম-কেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছে। নকশালদের করেছে হিরো।

এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। ধনীদের মুখপত্র খবরের কাগজগুলো যখন তোমার আবেগে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তোমাকে হিরো বানাচ্ছে, অতএব বোঝা যায়, তোমার কাজকর্ম তাদের পারপাসই সার্ভ করছে।

কথাটা যুক্তিসঙ্গতই।

পাশাপাশি এটাও খেয়াল করে দেখো বোধিসত্ত্ব, সাতষট্টি থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত প্রচুর বিক্রি হওয়া খবরের কাগজগুলো এবং কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রশাসনিক মহল, শাসক দল সবাই সি পি এম-এর নিন্দা চালিয়ে গেছে। নকশালরা তো আছেই। শরিক দলগুলোর সঙ্গে নানা ইস্যুতে মতান্তরের বিষয়গুলো নিয়ে খবরের কাগজগুলো এমনভাবে লিখেছে, যাতে মনে হবে, সমস্ত দোষ সি পি এম-এর। কিন্তু প্রতি ভোটেই দেখা যাচ্ছে সি পি এম-এর আসনসংখ্যা বাড়ছে। জনসমর্থনও বেড়েই চলেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার। তাই না!

আরো আশ্চর্য দেখো, যে খবরের কাগজগুলো একদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে চীনের দালাল বলেছে, নকশালপন্থীদের তা বলছে না। অথচ ওরা খোলাখুলি লিখছে, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এই ঘটনাও আমার আগের যুক্তিকেই সমর্থন করে। অর্থাৎ নকশালদের শিশুসুলভ আচরণ আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীকে একটুও আঘাত দিতে পারেনি। যা আবেগেই শেষ এবং পাল্টা আঘাতে চুরমার।

তা ঠিক।

শেষ পর্যন্ত একাত্তর সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট একশো তেরোটা, তার মধ্যে সি পি এম একাই একশো পাঁচটা আসন পেয়ে গেলো। ওরা চমকে গেলো। বুঝতে পারলো, ওদের অস্তিত্ব টলোমলো। তাই ষড়যন্ত্র করে ওরা বামপন্থীদের সরকারে

আসতেই দিলো না। সেই তিনমাসের অজয়-বিজয় সরকারের পরই বাহাত্তর সালের ভোটে ঐতিহাসিক রিগিং-এর ঘটনা। এক কলঙ্কিত নির্বাচন।

স্যার, কথায় কথায় আলোচনার বিষয়টা অন্যদিকে ঘুরে গেলো। কথা হচ্ছিলো নকশালপন্থীদের হঠকারী কাজকর্ম নিয়ে।

হ্যাঁ। আর বোলো না, বয়েস হয়ে যাচ্ছে। বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলছি। সজলদের মতো ছেলেরা আছে। ওদের ওপর ভরসা রাখতে হয়। তাই তোমাদের মতো ছেলে চাই আমাদের। বুদ্ধিমান, স্থিতধী, সাহসী আর পরিশ্রমী।

বলুন স্যার!

দেখেছো বোধিসত্ত্ব, সজল এই ফাঁকে কেমন শাসন করছে আমায়। হাসতে হাসতে বললেন রেবতীবাবু। ও হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। সাতষট্টি সালের ঘটনাবলী আর সেই সময়কার দলিলপত্র ভালো করে ঘেঁটে দেখেছি আমরা। তাতে এটা স্পষ্ট, নকশালবাড়ির ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন ভালো ফল আনতে পারতো। কিন্তু ওঁদের আবেগসর্বস্ব, অবাস্তব, হঠকারী কাজগুলোকে সি পি এম প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বেশ প্ল্যানমাফিক ব্যবহার করেছিলো সেন্ট্রাল গভ্‌মেন্ট। জেনে হোক, বা না বুঝে হোক, তখন নকশাল নেতৃত্ব তার খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলো।

একটু থেমে রেবতীবাবু ফের বলতে শুরু করলেন।

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিঙে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে একটি বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো। এর নাম ছিলো স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স। তখন এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন। ওই বাহিনীর কিছু লোকজনকে ছদ্মবেশে নকশালবাড়ির সেই আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। ওইসব ছদ্মবেশী চরদের কাজই ছিলো যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের উত্তেজিত করা। যাতে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির ছুতো দেখিয়ে সরকারটা ভাঙা যায়। সেই সময় পয়লা জুলাই আসামের গুয়াহাটিতে ছিলেন সি পি আই এম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর চক্রান্ত ছাড়া এটা আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে ফের ভোট ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখা যাচ্ছে না।

রেবতী চ্যাটার্জি থামলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত বিষয়টা বুঝে নিতে চেষ্টা করছিলো। এরই মধ্যে সজল একটা মন্তব্য করলো, যেটা এর আগেও বোধিসত্ত্বের মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। সজল বললো, বুঝলি বুধ, একটা ব্যাপার খুব সত্যি, সাতষট্টি থেকে বাহাত্তর সালের মধ্যে যখনই যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয়েছে, তখনই নকশাল মুভমেন্ট শুরু হয়ে যেতো। এটা কি কোনো কাকতলীয় ঘটনা!

ঠিকই বলেছিস। অন্ততপক্ষে এই জায়গাটায় তোর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে যাচ্ছে। আমারও এটা মনে হয়েছে বারবার।

আজকে আমাদের এই পাড়াতেই দেখ না, যে-সব ছেলেগুলো টবলু মিস্তিরের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের কয়েকজনকে আমিই দেখেছি আলকাতরা দিয়ে দেয়ালে লিখছে, নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ, লাল আগুন ছড়িয়ে দাও এসব।

সজলের এই কথাটা শুনে বোধিসত্ত্ব প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

একটা ব্যাপার আমার মাথায় স্পার্ক করে যাচ্ছিলো বহুক্ষণ থেকেই। কিছুতেই ক্লিয়ার হচ্ছিলো না। বুঝলি সজল, তোর কথায় ঘটনাটা মনে পড়ে গেলো।

কোন ঘটনা?

তোর মনে আছে কি না জানিনা। আমার সন তারিখ আর মনে নেই। যেবার পুলিসের গুলিতে তিন বাই একের সি বাড়ির বাচ্চা মেয়েটা মারা গেলো। কি নাম যেন মেয়েটির।

শিখা। শিখা কর্মকার।

হ্যাঁ। শিখা। তুই তো ভুলিসনি দেখছি!

আমি কি ভুলতে পারি! না আমায় ভুললে চলে!

সজল বোধিসত্ত্বর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলছিলো। ওর চোখ দু'টো তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে।

'সত্যিই তো, এসব কথা সজলের ভুললে চলবে! ওর দুই প্রিয় বন্ধুকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করা হয়েছিলো। আরো কত ঘটনা চোখের সামনে ভাসছে। একটা মানুষ, যার মধ্যে একটুও মানবিকতা বোধ আছে, সে এসব ভুলবে? তাই কি হয় নাকি!'

চুপ করে গেলি কেন? কি যেন বলতে যাচ্ছিলি?

ও হ্যাঁ। যেদিন শিখা পুলিসের গুলিতে মারা গেলো, ঠিক তার আগের মুহূর্তে আমি জানলা দিয়ে দেখেছিলাম পিনাকী পুলিস ভ্যান লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লো। এতে আমি ততটা অবাক হইনি। আমি চমকে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে আর একটা ছেলেকে দেখে।

কেন?

ওই ছেলেটা গঙ্গার ধারে আহিরীটোলা ঘাটের কাছে থাকে। ওয়াগন ব্রেকার। সবাই ওকে চেনে। সন্ধের দিকে গঙ্গার ধারে ঘুরতে যাওয়া বহু মেয়ের গলার হার ছিনতাই

করেছে ও। পাবলিকের হাতে বেধড়ক মারও খেয়েছে। আমি সেই রাতে কিছুতেই মেলাতে পারিনি, এমন একটা অ্যান্টিসোশ্যাল কি করে হঠাৎ নকশালপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গেলো!

খোঁজ নিলে দেখা যাবে পুলিস আর কংগ্রেসের লিডাররাই হয়তো প্ল্যানমাফিক ওকে নকশালদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তখন সর্বত্রই এটা হয়েছে। তখন থেকেই তো টবলু মিস্তিরদের রমরমা দিন যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের চমকে লাখ লাখ টাকা আদায় করছে। ছিঁটেফোটা দিচ্ছে পোষা মস্তানদের।

হ্যাঁ। আজকে সকালে আরো চমকে গেলাম।

কিরকম?

সকালে ন্যাপলাদার চায়ের দোকানে টবলু মিস্তির যেই মস্তানটাকে ল্যাংড়া বলে ডাকছিলো, সেই রাতে একেই আমি পিনাকীর সঙ্গে বোমা হাতে দেখেছিলাম। আগে খুব রোগা ছিলো। এখন গায়ে গতরে ফুলেছে।

ওরে ব্বাবা। এ তো পুলিসের নাম্বার ওয়ান চর। ল্যাংড়া তো! ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট। হাসতে হাসতে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। টবলু মিস্তিরের ডান হাত। কমসে কম তিন চারটে খুন করেছে। আর কতগুলো মৃত্যুর জন্য ওই নোংরা কীটটা দায়ী কে জানে!

কি রকম?

ওই পিরিয়ডে পুলিস পাড়ায় রেইড করে গাদা গাদা ছেলে তুলে নিয়ে যেতো। থানায় ছেলেগুলোকে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হতো। ল্যাংড়া বোরখা পরে ওদের সামনে গিয়ে কে কে নকশাল বা সি পি এম করে, অথবা খুব জঙ্গী, তাদের দেখিয়ে দিতো। সেইসব ছেলেগুলোকে রেখে পুলিস বাদবাকি ছেলেদের ছেড়ে দিতো। যে ক'টা ল্যাংড়ার দ্বারা চিহ্নিত, সে ক'টাকে পুলিস পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে চালান করে দিতো। প্রয়োজনে মাঝরাতে পুলিস জিপে করে রাস্তায় নিয়ে এসে গুলি করে মেরে ফেলতো। পরে বলতো, জিপ থেকে পালাতে গিয়েছিলো, কিংবা এনকাউন্টারে মারা গেছে। এদিকে ল্যাংড়া ফের পাড়ায় এসে নকশাল ছেলেদের সঙ্গে ওর কাজ চালিয়ে যেতো।

ওঃ! ভাবা যায়!

আর একরকম পুলিসের চর আছে, যারা পাড়ায় সমাজসেবা করে। পুলিসকে খবরও দেয়।

বলিস কি!

এই ল্যাংড়াই হয়তো পিনাকী সিন্‌হাকে খুন করেছে। কেননা পিনাকীর কাছে কাছে থেকে পিনাকী সম্পর্কে ওই বেশি জানতো। এরাই মানিক বোস আর প্রশান্ত বাউড়ীকে মেরেছে। এ-খবর তো আমাদের কাছে আছেই।

শেষে রেবতী চ্যাটার্জি বললেন, বোধিসত্ত্ব, তোমাকে অনেক কথা বললাম। অনেক কথা বলা বাকিও রইলো। এই অবিশ্বাসের যুগে যখন বিপন্ন মানুষ একটু খড়কুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন তোমাদের মতো সাচ্চা ছেলের ওপর আমাদের ভরসা করতেই হয়। তোমার মনে প্রশ্ন আছে, তোমার মনে যন্ত্রণা আছে। একটা চরম অমানবিক ঘটনা ঘটলে তুমি তো ঘরে বসে চুপ করে থাকতে পারো না! সে তো আমি দেখেছিই। বোধিসত্ত্ব, আমি তো শিক্ষক। শিক্ষক জীবনে হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে দেখেছি। এখনো দেখছি। এদের মধ্যে তো কাউকে কাউকে অন্যরকম মনে হয়। যে অন্যান্য আর দশজনের চেয়ে আলাদা। তাঁদেরকে আমরা খুঁজি। এই সমাজই তাঁদের খোঁজে। তাদের চায়। সমাজের এই দাবিকে তুমি উপেক্ষা করতেও পারো। সাদা চোখে মনে হবে, তাতে বোধ হয় কিছু এলো গেলো না। না, বোধিসত্ত্ব, না। তাতে অনেক সর্বনাশ হয়ে যায়। তুমি দারুণ অনুভূতিসম্পন্ন ছেলে বোধিসত্ত্ব। তোমার চোখে আমি আগুন দেখেছি।

......'আমি কোথায় যাই স্যার? আমি তো পাগল হয়ে যাবো! আমি তেমনভাবে কিছুই ভাবিনি। কি করবো জানি না। তবুও এই দুঃসময়ে, এই দুর্দিনে অসহ্য কষ্টে আছি। বাইরে যা দেখি, দেখে সহ্য করতে পারি না। ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে যাই। আমি নিজে নিজেই রাস্তায় নেমে পড়ি। নেমে আদৌ আমি কি করবো, তা কিন্তু আমার জানা নেই! যাঁরা আগুপিছু না ভেবে নেমেছিলো, তাঁদের রক্তময় ছিন্নভিন্ন মৃতদেহগুলো, আর তাঁদের জন্য আরো যাঁরা জীবন ছেড়ে চিরবিদায় নিলো, তাঁদের কথা ভেবে আমি নিদারুণ কষ্টে আছি। এই যন্ত্রণা থেকে, এই সময়ের দাহ থেকে মুক্তি খুঁজতে আমি কতদিন ধরে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমার এক পাগল কবি বন্ধু আছে। তাঁর নাম সুশান্ত। ওকে দেখেছিলাম, দারুণ ভালো ছাত্র ছিলো। ভালো চাকরি পেয়েছিলো। কিন্তু দিক্‌নির্ণয় করতে পারলো না। পাগল হয়ে গেলো। এখন গাঁজা, ভাঙ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। ওর কবিতার লাইনগুলো কিন্তু আমাকে আরো ছোটায়।

'আমার সমস্ত সত্তা ক্রমশ
অসিতবর্ণ রূপ নিচ্ছে

অসিত পাথরে মুড়ি দিয়ে
ঘুমিয়ে আছে নিকাশী আকাশ
আমার সব কিছু একাকার
আমার জীবন—
হে জীবন! আমাকে একটি ফোটা গোলাপ
কিংবা এক ফোঁটা রোদ্দুরে দাঁড় করাও।'

এই রক্তমাখা সময়ের বৃন্তে, আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী, একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আমাকে বলছেন স্যার, তুমি কিছু করো। আর পৌলমী। সে এক অদ্ভুত নারী। সে কি আছে আমার সঙ্গে? না কি নেই! জানি না। কিন্তু সেও আমার কাছে দাবি করে একটি জীবনের গান। আর আমি? আমি আমার কাছে দাবি করি এক নিটোল, নিখুঁত মহাকাব্য। যে কাব্য ধরে ফেলবে এই দুরন্ত সময়কে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কিছুই করে উঠতে পারি না। আমি এ যুগের পুরুষকারহীন অক্ষম এক পুরুষ। কি হবে আমাকে দিয়ে?'....

মনের গভীর থেকে উঠে আসা আবেগ, আর চিরন্তন বেদনাকে সঙ্গী করে রেবতী চ্যাটার্জি প্রতিটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন অসাধারণ, মায়াময়, স্বপ্নমাখা, বাস্তব, কিন্তু বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়, এমন সব শব্দ সাজিয়ে। এমন সব কথা ধরে রাখা কি চাট্টিখানি কথা! বোধিসত্ত্ব নির্বাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

শোনো, বোধিসত্ত্ব, শোনো। তুমি চুপ করে আছো কেন? গীতা পড়েছো?

না।

শোনো, গীতায় বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম। তিনি আমাদের অস্তিত্বকে পূর্ণ করেন, বোধকে প্রদীপ্ত করেন। আমাদের ভেতরের কলকব্জাকে সচল করেন।

আপনি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করেন নাকি?

একটুও না। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে তাতে বিশ্ব মানবাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। আর গীতা তো মানুষের পবিত্র সুন্দর কর্মময় জীবনের বাণী বহন করে আনে। গীতার অনেক কিছুই গ্রহণ করা যায়। মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়াতে লিখেছেন, 'ভগবদ্গীতাতে আমি যে সান্ত্বনা পাই, সারমন অন্ দা মাউন্টেও সব সময় তা পাই না। হতাশায় ডুবতে ডুবতে যখন একটু আলোও চোখে পড়ে না, তখন আমি ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করি।' অলডুস হাক্সলির কথাটাও বলি।

হাক্‌সলি বলেছিলেন, গীতায় সনাতন দর্শনের সার সংগ্রহ আছে সহজ ভাষায়। তাই তা সমগ্র মানবসমাজের কাছেই স্থায়ী।

সজল নিশ্চুপ। বোধিসত্ত্ব নির্বাক। তখনো রেবতীবাবু বলে চলেছেন। আবেগে তাঁর গলা কেঁপে কেঁপে উঠছে।—

যখন জীবন জুড়ে থাকে অন্ধকার। মানুষের লাঞ্ছনা আর চোখে দেখা যায় না। তখন নিজের ভেতরকার প্রদীপের সলতেটাকে উস্‌কে দেবার দরকার হয়। শুক্ল যজুর্বেদে আছে, 'তেজোহসি তেজোময়ি দেহি, বীর্যমসি বীর্যং দেহি, বলমসি বলং ময়ি দেহি, ওজোহসি ওজোময়ি দেহি, মন্যুরসি মন্যুং ময়ি দেহি, সহোহসি সহময়ি দেহি।' তাই-ই আমি বলছি, তোমরা তেজী হওয়ার পাশাপাশি কৌশলীও হও। ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোকে জাগিয়ে তোলো।

বোধিসত্ত্ব ঘরে ফিরলো সেদিন আরেক বোধিসত্ত্ব হয়ে। এভাবেই একটি যুগ শেষ হয়ে আরেকটি যুগে তাঁর পদচিহ্ন পড়লো।

সাত

'হাথক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানী।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ-দুহুঁ দোহা হোয়॥'

—বিদ্যাপতি

পৌলমী, তোমার চিঠি পেলাম। চিঠি তো নয়, এ যেন জলপ্রপাত। সফেন জলধারার দারুণ বেগে পাথুরে জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। এত দাহ তোমার! এত আগুন!

... হ্যাঁ বোধিসত্ত্ব, একটা করে দিন যায়, আর আমার বুকের মধ্যে দাহ বেড়েই চলে।

নিজেকে থামাও করো পৌলমী। এই দাহ তোমাকে পোড়াবে। পুড়বে তা'হলে আরো অনেকেই।

তুমি একদিন এসো আমার কাছে বুধ। আমার সমস্ত কথা, দিন যাপনের প্রতিটি মুহূর্তের সব কাহিনী তোমাকে শোনাতে চাই আমি। আমি একা পড়ে আছি। আমার দিনগুলো সঙ্গহীন একাকীত্বে ডুবে আছে। আমার দিন আর কাটতে চাইছে না। আমাকে বাঁচাও বুধ! আমার সমস্ত সত্তা চিৎকার করে উঠতে চাইছে। বাঁচাও আমাকে বুধ! আমাকে বাঁচাও তুমি!

কেন, কি হলো তোমার? এত অতৃপ্তি কেন? যে সুন্দর মনটা তোমার বুকের ভেতর জেগে আছে, তাকে খোলা বাতাসে ভাসিয়ে দাও। তুমি পৌলমী, যে পৌলমীকে আমি জেনেছিলাম, তাকে তুমি মেলে ধরো।

জানো বুধ, সন্ধের পর থেকে রাত যত এগিয়ে আসে, আমার ততই দমবন্ধ অবস্থা হতে থাকে। আমার প্রত্যেকটা দিন কাটে প্রেমহীনতায়। আর প্রতিটি রাত কাটে যেন কর্দমাক্ত পিচ্ছিল কোন ডোবার ভেতর। চারধারে যেন কাঁটা ঝোপের বেড়া, অন্ধকার। আমার রাতের শয্যায় কোনো রূপকথার রাজপুত্র আসে না। নীল জলপরী হয়ে কাশফুলের ঢেউতোলা ভুবনডাঙার মাঠের পাশে পদ্মশালুকের পুকুরে নগ্নতার নিবিড় খেলায় মেতে উঠতে পারি না আমি। আমি সরীসৃপ হয়ে যাই বুধ। আমি না পাওয়া আকাঙ্খায় পুড়তে পুড়তে সাপিনী হয়ে যাই। আমার লজ্জার সমস্ত খোলস খুলে

ফেলে দেয় সেই পুরুষ নামক জন্তু। হ্যাঁ। ঘেন্নার পাঁকে ডুবতে ডুবতে আমি পুড়ে যাওয়া আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলি। কামনার আগুন উস্‌কে দিই। লজ্জাহীনা হয়ে আমি কামনায় মেতে উঠি। ঘেন্না থেকে টেনে বের করি দেহের সুখ। বলো বুধ, এটা কি কোনো জীবন?

পৌলমী শোন। এটা কোনো কাজের কথা নয়। তুমিই তো বলো, স্বপ্ন আর বাস্তব একই ব্যাপার নয়।

তা নয়। কিন্তু স্বপ্ন তো আমার থাকতেই পারে। আমার সেই স্বপ্ন অবাস্তবতার পথ ধরেও হাঁটে না। একটি মেয়ে, সে তার পুরুষের কাছে চায় প্রেম। সে চায়, তার স্বামী তার মনটাকে পুরোপুরি বুঝুক। এটা স্বাভাবিক দাবি। যে কোনো মেয়ের চিরবাস্তব স্বপ্ন। তাই নয় কি!

... আমি সেই যুবক— বোধিসত্ত্ব। এ-সব কথার উত্তর খুঁজে পাই না। কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলি। আমি তো সংসারী নই! দাম্পত্য জীবনের এইসব গভীর প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার সাজে কি? আমি তো বুঝে পাই না, কী করবো আমি! আমি তোমাকে সৃষ্টি করতে চাই আমার রচনায়। আমি তোমাকে জানতে চাই পৌলমী। তোমাকে বুঝতে চাই। তোমার বিষণ্ণ চোখের তারার টলটলে কৃষ্ণ সরোবরে আমি বারে বারে ডুব দিই। অসম্ভব, দুর্নিবার আকর্ষণ আমার তোমাকে ঘিরে। পৌলমী, তোমার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে আমার বুক ভারী হয়ে আসে। আমি অবচেতনার অন্তহীন সাগরে ডুবে যাই।...

কথা বলছো না কেন বুধ? কি ভাবছো তুমি?

তোমার কথাই তো ভাবছি।

ভাবো, ভাবো। এতেই আমার সুখ। তোমাকে নিয়েই আমি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলতে চাই।

এ কথা কি তোমার বলা সাজে?

সবই বলা সাজে আমার। বালিকা পৌলমী যে স্বপ্ন দেখতো, তা তো মুছে গেছে। এখনো সে যা চায়, তা জোর গলায় বলতে কোনো দ্বিধা নেই তার।

তুমি কি চাও?

আমি তোমাকে চাই।

... এই যে আমি বোধিসত্ত্ব। পৌলমীর এই সমর্পিত ভঙ্গি আর কথায় কেঁপে উঠি। সর্বনাশের কথা! কিন্তু আমি কি অস্বীকার করতে পারি যে এই কথায় আমি দারুণ সুখ বোধ করছি না! সেই মেয়ে যখন দর্পিতা হয়ে আমাকে কামনা করে, আমার

চারদিকে সুগন্ধ বাতাস বইতে থাকে তখন। সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে সব কিছু। আমি তাকে কবিতা শোনাই—

> 'পাথরে খোদাই করে যে মুখচ্ছবি তুমি বহু যত্নে করেছ রচনা
> আসলে পাথর সে তো নয়; কাঁচা
> পলি, বিস্মৃতিপ্রবণ বালি—
> চিত্রমালা একদিন ধুয়ে যাবে জলে, দু' একটি অনিবার্য প্রখর বর্ষণে;
> নদীর বহতা স্রোতে ঢেউ হয়ে জাগে তারই স্থির প্ররোচনা।
> চলচ্ছবি মুছে গেলে, কখনও বিধবা থাকে শাদা ক্যানভাস?
> জীবন পূর্ণের কাছে নতজানু; শূন্যতাকে ভরে দেয় নিয়ত বাতাস—
> প্যালেটে উৎকণ্ঠ রঙ, ডানা মেলা তুলি; উদগ্রীব হাতুড়ি বাটালি;
> নিয়ত নতুন ছবি মেঘে; নতুন দৃশ্যের জন্মে প্রতিদিন গর্ভবতী ঘাস।'

পৌলমী, এটা কার লেখা কবিতা, জানো?

না।

শবরী ঘোষ নামে এক মহিলা কবির। তোমার অতৃপ্তি আর আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই এই কবিতায়।

পৌলমী এবার মিষ্টি করে হেসে ওঠে। বলে, বুধ, আমার কাছে আসবে কবে? কবে আসবে, বলো বুধ?

... তাঁর সেই গভীর কাজল চোখের আর্তি আমাকে পাগল করে দিতে চায়। আমি ছুটতে থাকি। সময় তখন আপেক্ষিক হয়ে যায়। রেলগাড়ির শব্দ শুনতে পাই আমি। রাত্রি গভীর হয়। গাঢ়তর অন্ধকার চারদিকে। আকাশে লক্ষ তারা ঝিকমিক করে। নৈঃশব্দ্য যেন গান গেয়ে ওঠে। উথাল পাথাল হয় আমার মন। কি করবো আমি? আমি যে লিখতে চাই। তাই আমি কলম নিয়ে বসি।...

হাজারো চরিত্র চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করে। আমি তো ছুটতেই থাকি। ছুটতে ছুটতে নদীর জলকল্লোল শুনতে পাই। এই তো সেই নদী। যার নাম ভাগীরথী। নদীর পাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চর সুলতানপুর, মেদগাছি, মালোপাড়া এই সব জেলেদের গ্রাম।

আমি হাঁটতে থাকি.... আমি চলতে থাকি.... আমি মালোপাড়ায়, চর সুলতানপুরে সেইসব জেলেদের ঘরে ঢুকে পড়ি। এমনিতেই জেলেদের জীবনে নিত্য অভাব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। শুধু জেলেদের কেন! তাঁতীদের অবস্থাও খুব খারাপ যাচ্ছে এখন। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, নাদনঘাট, পূর্বস্থলী— তাঁতীরা

ধুঁকছে সব জায়গাতেই। বাজারে সুতো নেই। আকাল লেগেছে সব জায়গাতেই। রাজ্য জুড়ে অবশ্য শ্মশানের শান্তি।

এদিকে সুতোর যা দাম তাতে কাপড়ের বাজারে লাভ খুঁজে পায় না তাঁতী। তাঁতীদের সংসারে হাহাকার লেগে গেছে। তাঁদের কেউ কেউ ট্রেনে হকারি করতে নেমে পড়েছে। আবার অনেকে চালের চোরা কারবার করছে। চাষীদের হাতে পয়সা নেই। ফসল উঠলেই কর্জ শোধ করতে হয়। চাষীর ধান কম দামে মহাজন-জোতদারের গোলায় জমা হয়। পরে আবার বেশি দামে চাল কিনে খায় চাষী। ধার করে। কর্জ বাড়ে। কে কাকে বলবে? গত পাঁচ বছর ধরে খুন হয়েছে অনেকে। যেমন খুন হয়ে গেলো পরেশ দাস। যাঁরা গরিব লোকেদের হয়ে কথা বলতো, তাঁরা ঘরছাড়া। যেমন গোপাল রাজবংশী। ও নাকি ভেতরে ভেতরে রাজনীতি করতো। আবছা আবছা এই কথাটা শুনেছে চর সুলতানপুরের জেলেরা। গোপাল যতদিন গ্রামে ছিলো, দেশ বিদেশের খবর, দিল্লি-কলকাতার খবর পাওয়া যেতো। পরেশও দু'চার কথা জানাতো। এখন কে বলবে? তাই এই মুহূর্তের রাজনীতির হাল-হকিকৎ ভাগীরথীর তীরের এই জেলেরা খুব একটা বুঝতে পারছিলো না।

পরেশ দাস খুন হবার পর নদীর গান যেন থেমে গেলো। জেলে গ্রামগুলো যেন শক্তিহীন হয়ে ঝিমোতে লাগলো। কিন্তু তবুও জেলেদের একটা দায়িত্ব থেকে যায় পুত্রহারা ভৈরব মাঝির প্রতি। আর মালতী? ওর কী হবে? পরেশের নৌকোটাও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই আজ সন্ধেয় মনসাতলার চাতালে শেষ পর্যন্ত একটা সভা বসলো। গ্রামের বুড়োরা সবাই এসেছে। যোয়ানরা তো এসেছেই। এসেছে বৃদ্ধ ভৈরব মাঝি। মালতীও এসেছে।

তাইলে আমাগো সভা শুরু কইরা দ্যান দিহিনি।

হ। সভা তাইলে আরাম্ব অইল। বৃদ্ধ শ্রীদাম মালো আলোচনার মুখপাত করলো,

আপনেগোরে নতুন কইর‍্যা আর কী কমু। হগগলই ত জানেন। পরেইশ্যায় আইজ নাই। বৈকুণ্ঠধামে চইল্যা গ্যাসে। কিন্তু হ্যার বাপ আসে। ভৈরবদাদায়। বুড়া হয়য়্যা গ্যাসেন। মালতী ত আসে। এই মাইয়ারে লইয়া বুড়া মানুষডায় খাইবো কী? আপনেরাই গেরামের মানুষ, একডা বিচার লয়েন, কী করন যায়।

কিন্তুক কথাডা অইলো, ভৈরবদাদায় ত আর নৌকা লইয়া গাঙে যাইতে পারবো না। জালও ফ্যালাইতে পারবো না।— সৃষ্টিধর দাস এই প্রশ্নটা তুললো।

ছিষ্টিধর হাচা কতাই কইসে। কিন্তু উফায় ত একটা বাইর করন লাগবো!

এবার মানিক উঠে দাঁড়ালো।

আমি কই কি, য্যাতদিন কিসু অ্যাকডা না অয়, আমরা য্যারা গাঙে যাই, পরেশদাদার নামে এক পোয়া কইরা মাছ আলাদা রাহুম। হেই ট্যাহাডা মালতী গ ঘরে যাইবো।

না! ভিক্কার দান আমরা নিমু না। —মালতী ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ও বেশ জোরেই কথাটা বললো। সবাই ওর দিকে তাকালো। আজকে, এবং এখনই এই গ্রামের মানুষগুলো বুঝতে পারলো, এই ক'দিনে অনেক বদলে গেছে মালতী। সেই লাজুক, নতমুখী মেয়েটার মধ্যে যেন পৌরুষের দার্ঢ্য চলে এসেছে। গোপেশ্বর বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো, তাইলে কী করবি?

আমি নিজেই নৌকা বাউম। মাছ ধরুম নিজেই।

এইডা কি কথা কস্ মালতী? মাইয়া মাইনসে নাও বাইবো!

সভায় গুঞ্জন উঠলো। ভৈরব মাঝি চুপ। ভৈরব মাঝি আর কিছু ভাবতে চায় না। এখন সে সবকিছুই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিসের জন্যই বা সে আজ লড়াই করবে? পূর্ববাংলা ছেড়ে ফরিদপুর থেকে ভৈরব মাঝির সঙ্গে একসঙ্গেই ভারতে এসেছিলো বৃন্দাবন মালো। সে ভৈরব মাঝির থেকে দশ বছরের ছোট। ষাট বছর বয়স। এখনো তুফানে নৌকা সামলায় একা। সে উঠলো সভায়।

কর্থাডা অইল, অগ তাইলে খাওনের উফায় কী অইবো। হাচা কথাই এইডা, এক পোয়া কইরা মাছ হগগলের ভাগ থিকা দিলে আইজ গেল, কাইলও যাইবো, কিন্তুক চিরডা কাল তো যাইবো না! ব্যবস্থা একডা করন লাগবোই!

জাউল্যার ঘরের বউ-মাইয়ারা যদি হাটে মাছ বিকাইতে পারে, তবে গাঙে নাওও বাইতে পারবো।

মালতী ফের কথা বললো।

হ। মাছবাজারে ত দিব্যি মাইয়া মাইনষে মাছ ব্যাচতাছে। নাও বাইতে তাইলে অত আচার-বিচার ক্যান?

হাচা কতাই ত কইসে মালতি।

এ-কথা ঠিকই, জেলেদের ঘরের অনেক মেয়ে বউ বাজারে মাছ বিক্রি করে। পুরুষরা অনেক সময় নৌকা থেকে মাছ নামিয়ে ফের ভাগীরথীতে ভেসে পড়ে। বাড়ির বউরা সেই মাছ চুবড়িতে করে মাছপট্টিতে নিয়ে যায়। এরা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর কথা সেভাবে ভাবে না। দুএকটা ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করে। তবে প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে হাইস্কুলে আর যাওয়া হয় না। দু'একজন যদিও বা যায়, সংসারের দাবিতে জ্ঞাত ব্যবসাতেও নেমে পড়তে হয়। ক্লাস এইট নাইনে এসে ঠেকে যায় তাদের পড়াশোনা। চর সুলতানপুরের দু'জন মাত্র এখনো পর্যন্ত হাইস্কুল পেরিয়ে কলেজের চৌকাঠে পা রেখেছে। একজন হলো গোপাল

রাজবংশী। আর একজন হলো পরেশ দাস।

জেলেদের মধ্যে পড়াশোনা জানা লোক নাই। কিন্তু জীবন অভিজ্ঞতার ভারে সবাই টইটম্বুর। দুঃখ সুখের এই পৃথিবীতে ছোট ছোট সুখ আর বাদবাকি সময়ে জীবনযন্ত্রণা নিয়ে ওরা দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলো। মানুষ হিসাবে তাঁদের পাওনা কতটুকু, অধিকারই বা কতটুকু, সে সম্পর্কে ওরা কিছুই ওয়াকিবহাল নয়। শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের মতো তর্ক বা কথার কচকচিতে ওরা গেলো না। প্রাণধারণই এদের মূল কথা। এরা মূর্খ। এরা ছোটলোক। ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদই ওদের জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। আপাদমাথা পরিশ্রম দিয়েই ওপার বাংলা থেকে চলে আসা ছিন্নমূল মানুষগুলি নয়া বসতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলো। সেখানে সংসারের নারী-পুরুষ দু'জনকেই রাস্তায় নামতে হয়েছে। এমনকি চালের ব্ল্যাকের কাজে অথবা আনাজ-তরকারি-কাঁচামালের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে, ট্রেনে করে শহরের বাজারে যাচ্ছে মেয়েরাও। ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে। দেশভাগ এইসব গরিব মানুষের সংসারের অন্তঃপুরের আবরণটুকু এভাবেই খসিয়ে দিয়েছিলো। তাই এই সভায় শেষ পর্যন্ত মালতীর দাবি গৃহীত হয়ে গেলো। মালতী আপাতত বৃন্দাবন খুড়ার নৌকায় মাছ ধরবে। বাজারে যেখানে পরেশ মাছ বেচতো, সেখানেই সে মাছ বেচবে।

শীত চলে গেলো। বসন্ত এসে ধাক্কা দিলো দুয়ারে। পরেশকে হারানোর শোকও একসময় থিতিয়ে আসে। নদীর বুকে জেলে নৌকাগুলো ঘুরে বেড়ায়। মাঝ নদীতে জাল পাতা হয়। মাছ ওঠে। সেই মাছ বাজারে চলে যায়। আর ঢলঢলে যৌবন নিয়ে অঞ্জলি চর সুলতানপুরের গাঙপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি উদাস। ওর সারা মন জুড়ে শুধুই মানিক। কিন্তু মানিকের মনের নাগাল সে আজও পেলো না। অঞ্জলি ঠারেঠোরে মানিককে ওর মনের কথা বোঝাতে চেয়েছে অনেকদিন। মানিকের ভঙ্গিতে হ্যাঁ-ও নাই, না-ও নাই। মানিক উদাসীনের মতো অঞ্জলির হাবভাব দেখে। কোন প্রতিক্রিয়া অন্তত বাইরে দেখায়নি আজও পর্যত। অঞ্জলি তাই ভয়ানক অস্বস্তিতে ভুগছে। বড় আগেই মন দিয়ে ফেলেছে অঞ্জলি। কিন্তু জাউল্যার পোলার কোন হুঁশই নাই। কিশোরী অঞ্জলি প্রায় রোজই গাঙপাড়ে অশ্বত্থ গাছের নিচে বিকেলবেলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নদীর বাঁকের মুখে জলের স্রোত আছড়ে পড়ে। মাটি আলগা হয়ে যায়। ঝপ ঝপাং, ঝপ ঝপাং শব্দ করে পাড় ভেঙে পড়ে। মাটির সেই বড় বড় চাঙড়গুলো কয়েক মুহূর্ত ভেসে থাকে। ভেসে থাকতে থাকতে, গলতে গলতে, ভেঙে চুরে, গুঁড়িয়ে, কাদার তাল হয়ে ভাগীরথীর গর্ভে চলে যায়। ভরা নদী, যৌবনবতী নদী, এভাবেই পৃথিবীর শিকড় আলগা করে দিতে থাকে। মাটি খসে খসে পড়ে। চর সুলতানপুরের ডাঙা অঞ্চলের পরিসর এভাবেই ছোট হতে থাকে। সকলের অগোচরেই এই ঘটনা

ঘটছে। অথবা কেউই গুরুত্ব দিচ্ছে না ব্যাপারটাকে। নদীর ভাঙন তো রোজকার ঘটনা। কী হবে ভেবে? কিন্তু শুধুমাত্র একজন এই ক্ষয়ে যাওয়া ডাঙার চেহারার ষোল আনা হিসাব রাখছে। সে সৃষ্টিধর দাসের মেয়ে অঞ্জলি। এই বয়সেই অঞ্জলিকে কি বড় দেখায়। বাড়ন্ত শরীর। চিন্তায় ভাবনায়ও যেন বাড়ন্ত। তাই ওর কেবলই মনে হয়, দুয্যোগ আইতাসে। আমাগো কপালে শনি লাগবো। নদী যে রোজ ভাঙেই শুধু। হ্যার পরে কী অইবো? মা গো! ডরে যে বুক কাঁপে।

পশ্চিম পৃথিবী বরাবর সূর্য কলস কলস লাল রঙ ঢেলে দিলো ভাগীরথীতে। একটা দিনের আয়ু শেষ হয়ে এলো। নদীর জলে সেই লাল রঙ ছড়িয়ে পড়লো। অঞ্জলিও দাঁড়িয়ে রইলো অশ্বত্থ গাছের নিচে। এক এক করে জেলেরা সব নৌকা পাড়ে ভেড়াতে শুরু করেছে। ঐ যে! মানিকের নৌকো আসছে। অঞ্জলির মুখস্ত হয়ে গেছে। আধো অন্ধকারেও সে বুঝতে পারে মানিকের নৌকো কোনটা। মানিক নৌকো থেকে নামলো। নৌকোটা পাড়ে বেঁধে গল্লুইয়ের মাছগুলো ঝাঁকায় তুলে ডাঙায় উঠে এলো। অঞ্জলি অশ্বত্থগাছের ঘন ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে ঘাটের পথে এসে দাঁড়ালো।

মানিকদা!

মানিক চমকালো।

কী রে! কী কস?

কি মাছ পাইলা আইজ?

দুইডা ইলিশ উঠসে। অ্যা-হ্যাকডা দুই কিলো কইরা হইবো। মানিকের মনটা আজ খুশি খুশি। ভোলা মাছও জালে উঠেছে অনেকগুলো।

অ্যাহন তো ইস্টিশন বাজারে যাইবা?

হ। মাছগুলান বেচুম। ইলিশ দুইডা ভাল দামে বিকাইবো। তুই এহানে কি করস?

তোমার লেইগ্যা দাঁড়াইয়া আসি।

ক্যান? কী অইলো?

অঞ্জলি ভাবে, কি অইল এহনো বোজ না মানিকদা! আমি ডুবছি যে!

তুমি বাজার থিহা আহনের পথে আমার লেইগ্যা এক ছড়া পুঁতির হার আনবার পারবা?

মানিক এক মুহূর্ত কি ভাবলো। তারপর বললো, যদি ভুইল্যা না যাই, নিয়া আহুমঅনে।

ভুইললো না মানিকদা! অঞ্জলির চোখে-মুখে আর্তি ঝরে পড়লো। মানিক ভাবে, একগাছা হারের লেইগ্যা এতবড় মাইয়াডা অ্যামন করে ক্যান? অঞ্জলি বলে, আমার

কথা মনে কইরো। তাইলে ভুলবা না।

আইচ্ছা আইচ্ছা, ঠিক আসে। বলে মানিক ঝাঁকা মাথায় করে বাজারের দিকে রওনা দেয়। অঞ্জলি ওর পিছু পিছু খানিকটা যায়। চর সুলতানপুরে ঢোকার মুখে ও মানিককে আবার বলে, মানিকদ্দা, হারডা আনবা কিন্তু! তোমার দেওয়া হার পরনের খুব শখ আমার। বলেই অঞ্জলি গ্রামের পথ দিয়ে দৌড় লাগালো। মানিক ভাবে, এইয়া আবার কী কথা কয় মাইয়াডা!

বাজারে পৌঁছে মানিক দেখলো, মালতী দাস মাছ বিক্রি করতে এসে পড়েছে। ওর পাশের জায়গাটাই পরেশের ছিলো। সেখানেই বসেছে মালতী। ক'দিন ধরেই ও দেখছে, মালতীর পয় আছে। ওর হাতে মাছ বিক্রি ভালো হয়। নিজের মাছ বিক্রি হয়ে গেলে মালতী মানিকের মাছও বিক্রি করে দেয়। মালতী মাছ বাজারে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে এরই মধ্যে। মালতীর ব্যক্তিত্বের কাছে ধাক্কা খেয়ে অনেকেই এখন ওকে সমঝে চলে। মালতীর বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে! আমার দাদারে খুন করসে। আমি ভুলুম কি কইরা! যদি জানতে পারি, ক্যারা এই কাজ করসে, আঁশ বটি দিয়া গলা নামাইয়া দিমু। ছাড়ুম না আমি!

প্রত্যেকটা দিন যায়। মালতী দাস শুধু পরিবর্তিত হতে থাকে। দোকানদারি করতে করতে ওর পরিচিতিও বাড়তে থাকে। মানুষকে বুঝে নেবার অদ্ভুত এক ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে সে। মালতীর এই প্রখর তেজের সামনে মানিকও দাঁড়াতে পারে না। ও অবাক হয়ে শুধু বোবার মতো দেখে মালতীকে।

সৃষ্টিধর দাস একটু আলসে প্রকৃতির মানুষ। মোটামুটি রোজগার হলে আর নদীতে যেতে চায় না। হাটে গেলেও বাড়ির কলাটা মুলোটা বেচে দু'দশ টাকা জমিয়ে বউয়ের জন্য একটা মাকড়ি বানিয়ে দেবার বহুদিনের ইচ্ছেটা পূরণ হয়। কিন্তু কুঁড়েমির জন্য আজও পর্যন্ত সেই কাজটা হলো না। নৌকোটা ঘাটে পড়ে আছে। গোছগাছ করতে হবে। আজ দুপুরে বেরোতেই হবে। আলস্য ভেঙে সৃষ্টিধর উঠে পড়লো।

অঞ্জুর মা, দু'গা মুড়ি দ্যাও। ত্যাজপাতা দিয়া একটু চা কর। চা ডা না খাইলে শরীল গরম অইবো না।

বৌয়ের নাম লক্ষ্মী। নামেও লক্ষ্মী, কাজেও লক্ষ্মী। খুব গোছানো। এইজন্য সৃষ্টিধর সংসারের সমস্যাটা টের পায় না। মেয়েটার প্রতিও যে সৃষ্টিধর খুব একটা নজর দেয়, তাও বলা যাবে না। সেদিন লক্ষ্মীমণি বলেওছিলো, আমার লেইগ্‌গা আর তোমার মাকড়ি বানাইতে লাগবো না। মাইয়াডার লেইগ্‌গা পারলে অ্যাকটা দুইটা কইরা কিসু বানাও। বিয়া ত দেওন লাগবো মাইয়ার!

হ, হ। দেরি আসে বিয়ার! অ্যাহনই মাইয়ার বিয়া দেয়! কি বা বয়স হইসে অর?

জনতা স্টোভে চা বসিয়ে লক্ষ্মীমণি বেতের ডালায় করে সৃষ্টিধরকে মুড়ি দেয়। সঙ্গে একটা ভেলিগুড়ের ডেলা। চায়ের জলে ভেলিগুড়ের ডেলাটা নাড়তে নাড়তে লক্ষ্মী কথা বলে।

মাইয়াডার দিহে তাহাও নি! অয় যে ফনফন কইর‍্যা বাড়তাসে। ট্যারটা পাওনি মাঝি! অয় যে তোমার চ্যাহারা পাইসে। দ্যাকতে দ্যাকতে ডাগর হয়য্যা গেলো। অ্যাহন থিকা বিয়ার কতা ভাবো।

সৃষ্টিধর বউয়ের কথায় পাত্তা দেয় না। এমনি করেই বাপের নজরের বাইরে অনেকটা অবহেলায় অঞ্জলি বড় হয়ে উঠলো। অঞ্জলি হিংসা করে মালতীকে। সবাই মালতীর দিকে নজর দেয়। সহানুভূতি দেখায়। ভালোবাসে। এখন তো স্টেশন বাজারে মালতীকে সবাই চেনে। কিন্তু অঞ্জলি নীরবে সবার অগোচরে যে কত বড় হয়ে গেছে, কেউ তেমন করে খোঁজ রাখলো না। কারুর কারুর ভাগ্যটা এমনিই হয়। যেমন এই নদী, নদী যে রোজ চর সুলতানপুরকে একটু একটু ক'রে খেয়ে নিচ্ছে, অঞ্জলি ছাড়া তার খোঁজ কেউ রাখলো না। বাঁশবাগানটা শেষ করে নদী সামনের মাঠটা ধরেছে। মনসাতলা পেরোলে ওদের বাড়ি আর মানিকদের বাড়িই প্রথমে। নদীর গ্রাসে সেগুলোই আগে পড়বে। অঞ্জলি সব কিছুরই হিসাব রাখে।

চা খেয়ে সৃষ্টিধর বেরিয়ে গেলো। সকালের রোদ্দুর মানকচুগাছের বড় বড় পাতার ওপর পড়েছে। বেড়ার ধারে থোকা থোকা গাঁদাফুল ফুটেছে। অঞ্জলি গোরুটাকে মাঠে বেঁধে দিয়ে এলো। অঞ্জলির মা উঠোন ঝাঁট দিয়ে জড়ো করা শুকনো পাতাগুলো রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনের পাশে এনে রাখছিলো। এই পাতা ধরিয়েই রান্না হবে।

অঞ্জু!

কি মা!

টিপকল থিকা দুই কলসী জল নিয়া আয়!

যাইতাছি।

অঞ্জলি ঘর থেকে কলসী নিয়ে বাড়ির বাইরে রাস্তায় নামলো। লক্ষ্মী পেছন থেকে দেখছিলো মেয়েকে। চেহারায় পূর্ণ যুবতীর মতো হয়ে গেছে অঞ্জলি। ভেবে মরে লক্ষ্মী। বাপটায় চোখের মাথা খাইসে! মাইয়াডায় যে ডাগর হয়য্যা গ্যাল! আমারে মাকড়ি বানায়া দিবার হাউশ। আমি তো বুড়ি হইবার যাইতাসি। আমার মাকড়ি দিয়া কী অইবো? অ্যাহন মাইয়াডারই গয়না দরকার।

আসলে লক্ষ্মীও যে এখনো পূর্ণ যৌবনবতী নারী। লক্ষ্মীমণি চেহারায়, সৌন্দর্যে এখনো সেই যুবতীই আছে। মায়ের বাঁধুনি পেয়েছে মেয়ে। আর বাপের মতো চেহারা। তাই অঞ্জলি মাকে ছুঁয়ে ফেলেছে বড্ড তাড়াতাড়ি। অঞ্জলি কলসী কাঁখে জল নিয়ে

চলে এসেছে। ঘরে কলসী রেখে দিয়ে অঞ্জলি বাইরে এলো। লক্ষ্মীমণি অঞ্জলিকে ডাকলো।

অঞ্জু শোন!

কি কও? অঞ্জলি মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। লক্ষ্মীমণি মেয়ের দুই ড্যানা ধরে মেয়েকে দেখতে লাগলো। লম্বায় মা-কে ছাপিয়ে গেছে মেয়ে। উথলে উঠা অঞ্জলির শরীরটা আজ প্রথম লক্ষ্মীমণি ভালো করে দেখলো। তারপর গভীর দরদের সঙ্গে ডাকলো, অঞ্জু!

হুঁ।

তুই কিন্তু বড় হইয়া গ্যাছস। যহন তহন আর রাস্তায় ঘুরিস না মা! চুল ছাড়া রাহিস না। বাইন্ধা থুইস। বুজছস?

হুঁ।

যা, তরকারির ঝুড়িটা লইয়া আয় তো। অ্যাহন থিহা ঘরের কাম করবি। শ্বশুরবাড়িতে গ্যালে, ঘরের কাম না জানলে ব্যাজায় দুঃখ আসে কফালে।

শ্বশুরবাড়ির কথায় মায়ের দু'হাতের মধ্যে কেঁপে উঠলো অঞ্জলি। মা বুঝলো, মাইয়া হাচাই বড় হয়য়্যা গ্যাসে।

অঞ্জলি ওর যৌবনের, ওর বেড়ে ওঠার স্বীকৃতি পেলো মায়ের কাছে। বাপ ওকে খেয়াল করে না। মানিকও ওকে বুঝে উঠতে পারেনি। অঞ্জলি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, যদি প্রথম ওর নারীত্বের স্বীকৃতি কেউ দিয়ে থাকে, তার ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, সে হলো বিলাস।

কথাটা মনে পড়তেই তরকারি কাটা শেষ করে ঘটির জলে হাত ধুয়ে অঞ্জলি ঘরে ঢুকলো। শুকনো গামছায় হাত মুছে, ভাঙা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চিরুনি দিয়ে উস্কোখুস্কো চুলগুলো যতটা সম্ভব পরিপাটি করে আঁচড়ে নিলো। কাজলের একটা টিপ পড়লো কপালে। তারপর বারান্দা পেরিয়ে লাফ দিয়ে উঠোনে নামলো। দৌড়লো রাস্তার দিকে। দেখে লক্ষ্মীমণি চ্যাঁচালো।

অঞ্জু, কই যাস?

আইতাসি! ঘাটের দিহে যাই!

তাড়াতাড়ি আবি।

যামু আর আমু!

রাস্তায় নেমেই ঘাটের দিকে দৌড়লো অঞ্জলি। এককেবারে ভুইল্যাই গেসিলাম। মানিকদারে পুঁতির হার আনতে কইছি না! আনসে ঠিহই। অ্যাতহনে নাও ভাসায়য়া দিসে নাহি কে জানে! পড়ি মুড়ি ছুটলো অঞ্জলি।

ঘাটে পৌঁছে অঞ্জলি দেখলো, পাড় থেকে মানিকের নৌকো হাত পাঁচিশেক দূরে চলে গেছে। অঞ্জলি চ্যাঁচালো।

মানিকদা-আ-আ! আমার পুঁতির হার আনছ নি-ই-ই-ই-ই!

স্পষ্টই দেখলো অঞ্জলি। মানিক জিভে কামড় দিয়েছে। একটু লজ্জায়ও পড়ে গেছে।

না রে অঞ্জু-উ-উ! অ্যাক্‌কেবারে ভুইল্যা গেসি-ই-ইই-ই! কাইল নিয়া আহুম অনে-এ-এ-এ-এ!

অঞ্জলির প্রবল উচ্ছ্বাসের মুখে এই কথাটা যেন গাঙের এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলো। একেবারে মিইয়ে গেলো অঞ্জলি। মনে মনে বললো, আর কাইল! আমি কি এক ছড়া পুঁতির হারের লেইগগা মরি! আমারে তুমি মনে রাহ নাই মানিকদাদা!

শ্লথ গতিতে বাড়ি ফিরে চললো অঞ্জলি। মানিকের দিকে ফিরেও তাকালো না। দূরে নৌকা থেকে অঞ্জলির করুণ মুখখানা দেখে আজ সত্যিই মানিকের খুব মায়া হলো।

আট

'......আজ খোলো দ্বার সবাই সবার—
হবো সবাই মিলে দিগন্ত পার
ধরো বৈঠার গান ভরিয়ে প্রাণ
উজানী দরিয়ায়॥
এই পথের বাঁকে মৃত্যু হাঁকে
বিজলী হানা নিঃসীম রাতে
ভুলেছি ভয়, আনবো জয়
মুক্তি প্রাতে।'

জার্মান লোকসঙ্গীত 'স্যান্ডার্স অব দ্য রিভার' ছবিতে মাঝির ভূমিকায় পল রোবসনের গান

—অনুবাদ : কঙ্কন ভট্টাচার্য

ছিয়াত্তরের কলকাতা। বোমা-মৃত্যু-রক্ত-ঘাম-পুলিসের দাপাদাপি পেরিয়ে খানিকটা শান্ত। এর মধ্যে একদিন রেবতীবাবুর সঙ্গে বোধিসত্ত্বর দেখা হয়েছিলো। বলেছিলেন, এসো একদিন বুধ।

যাবো। বোধিসত্ত্ব বলেছিলো অবশ্য সেদিন। কিন্তু আনমনা বোধিসত্ত্বর মন পড়েছিলো পৌলমীর দিকে। প্রতি সপ্তাহেই একটা করে চিঠি পাঠায় পৌলমী। তাদের ফ্ল্যাটে আসার অনুনয় থাকে তাতে। বোধিসত্ত্ব ঠিক করেছে, সামনের বুধবার ও যাবে বালিগঞ্জে। পৌলমীর কাছে।

......আমি তো মানুষ! কতবার ফিরিয়ে দেওয়া যায় আর কতবারই বা অস্বীকার করা যায় এমন আর্তিকে?—পার না বোধিসত্ত্ব, তুমি তা পার না! সে ক্ষমতা নেই তোমার। তুমি বিবেকহীন নও, অসামাজিকও নও। যুক্তি বুদ্ধি রুচি অথবা নিতান্ত মানুষ হিসেবে ভদ্রতাবোধেও তো কারুর ডাকে সাড়া দিতে হয়!

'আর আমি তো বলতে পারি না, শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরেই আমি ওঁর কাছে যাবো! সেই সাগরদ্বীপে ওকে দেখবার পর থেকে আজও পর্যন্ত কি আমার মন থেকে পৌলমীকে মুছে ফেলতে পেরেছি? না, পারিনি। হয়তো পারতাম, যদি না সে আমাকে এভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইতো। সে যদি আমাকে ভুলে যেতো, হয়তো আমিও স্মৃতিতে তার সচল উপস্থিতি রেখে অন্যদিকে ফিরতাম। কিন্তু তা হয়নি। সে আমার কাছে নিজেকে ভুলে থাকতে দেয়নি। আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা। তার মনের আগুন আর ছাইচাপা শরীরী আকাঙ্ক্ষা সে ঢেকেঢুকে রাখতে চায়নি আমার কাছে।

কিন্তু আমি যে দ্বিধা এড়াতে পারিনি। আমার সেই শক্তি নেই। আমি এই শ্মশানে

বন্ধ্যা যুগের ফসল এক পৌরুষহীন যুবক। এই সময় আমাকে এমন শক্তি দেয়নি যে, আমি গ্রহণ করতে পারি পৌলমীর ভার। আমি কৃষ্ণের মতো শক্তিমান নই যে, অনুগতা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ রুখে দেবো! এই যুগ একদল যুবককে আদর্শবা জঙ্গী করে তুলেছিলো। তাদের তাজা রক্তে মাটি ভিজেছে। আর একদলকে বানিয়েে মস্তান। তারা এই সময়টাকে নোংরা করে তুলেছে। আর বাদবাকি সবাই ক্লীব। প্রতিবা করতে ভয় পাই। অসহায়ের পাশে সাহায্যের জন্য দাঁড়াতে পারি না। আমি কেম করে পৌলমীকে টেনে তুলবো তাঁর অন্ধকার জীবন থেকে! আমারই যে বুক কাঁপে সব সময় বুকের ভেতর টিপ টিপ শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু তবুও এ-কথা সত্যি, যে পৌলমী আমার মতো এই অযোগ্য মানুষটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। আমিও বি চাইছি এর থেকে মুক্তি পেতে? বোধ হয় না। কিন্তু কেন? তা জানি না। এর ফলাফ কি? তাও জানা নেই। এভাবেই একটা যুগ আমাদের ভবিষ্যৎহীন ভবিষ্যতের দিবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।'

•

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই সে কলিং বেল টিপলো। একটুখানি নীরবতা। সমস্ত কিছু চুপচাপ। দরজার বাইরে দাঁড়ানো মানুষটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলো। সে আবার কলিং বেল টিপলো। বেশ খানিকক্ষণ বেলটা বাজলো। ফের স্তব্ধতা। লোকটা তার হাতঘড়ির দিকে নজর করলো। রাত বারোটা সতেরো। তার অসহিষ্ণুতা বেড়ে যাচ্ছিলো। পা সামান্য টলোমলো। নিস্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। একদিবে নিস্তব্ধতা, আর একদিকে সামনের বন্ধ দরজা। এ-দু'য়ের মাঝখানে পড়ে মানুষটা ক্রমশ রেগে যাচ্ছিলো। এবার সে কলিং বেলের সুইচে বুড়ো আঙুলটা ঠেকিয়ে কুড়ি থেবে পঁচিশ সেকেন্ড টিপে রাখলো। কলিং বেলের মিষ্টি আওয়াজ নাগাড়ে শোনা যাচ্ছিলো

এবার দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা দরজা খুলে গেলো। ঘুম জড়ানো চোখে পৌলমী দাঁড়িয়েছিলো।

এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো?—মানুষটার চোখে-মুখে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যাবতীয় তাচ্ছিল ফুটে উঠছিলো।

হুঁ, একটা বই পড়তে পড়তে তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো।

উত্তর শুনবার অপেক্ষা না করে সে পৌলমীকে পাশ কাটিয়েই ঘরে ঢুকে পড়লো মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো। পৌলমী দরজা বন্ধ করে দিলো।

এতো রাত হলো?

বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। আরে, তুমি চেনো তো ওকে! দীপক বোস লালবাজারে ওদের ইলেকট্রিক গুড্‌সের বিশাল দোকান।

হুঁ, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আজ বেরোবার সময় তো বলে যাওনি, যে রাতে বন্ধুর বাড়ি হয়ে আসবে!

এ-আর বলার মতো এমন কি কথা! ভেবেছিলাম, ঠিক সময়েই ঢুকে পড়বো।

আচ্ছা দীপঙ্কর, তুমি কি আমাকে মানুষ বলেই মনে কর না? এটা কমনসেন্সের ব্যাপার। আমি একা ঘরে আছি। তুমি রাতে দেরি করে আসবে, সেটা আমার জানার দরকার নেই!

এ-সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এত কথা বলতে একদম ভালো লাগে না। আর তুমি তো বসে ছিলে না, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলে।

কথা বলতে বলতেই দীপঙ্কর ব্যানার্জি জামা-প্যান্ট খুলে একটা পাতলুন আর গেঞ্জি প'রে বাথরুমের দিকে হাঁটা দিলো।

পৌলমী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ড্রইংরুমের টেবিল ধরে।

বাথরুম থেকে শাওয়ারের জলের শব্দ ভেসে আসছিলো। ঘরের মধ্যে হুইস্কির হালকা গন্ধ ভাসছিলো। আস্তে আস্তে ফের অস্বস্তিকর এক নীরবতা চেপে বসছিলো ঘরের মধ্যে। সিলিং ফ্যানের সামান্য শোঁ-শোঁ শব্দ ঘরের পেস্তারঙের দেয়ালে ধাক্কা লেগে মিলিয়ে যাচ্ছিলো অনবরত। বাথরুমে তখনো শাওয়ার থেকে নেমে আসা ছন্দোময় জলের শব্দ।

তখনো পৌলমী দাঁড়িয়েছিলো। ওঁর অভিব্যক্তিতে নির্বিকার হবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো। তবুও চোখ-মুখ ফুটে বেরিয়ে আসছিলো যন্ত্রণা। যন্ত্রণা সামলাতে সে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলো। এবার সে ড্রইংরুম থেকে ভেতরের ঘরে গেলো।

ডাক্তার দীপঙ্কর ব্যানার্জি কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পলু, কোথায় গেলে?

সাড়া নেই।

পলু!

সাড়া নেই।

পলু-উ-উ!

আমি এ-ঘরে।— ভেতরের ঘর থেকে পৌলমী উত্তর দিলো।

ডাকছি, উত্তর দিচ্ছো না কেন?

ভালো লাগছিলো না।

এটা অসভ্যতা।

আমার মন বলে কিছু যে একটা আছে, সেটা কি তুমি বোঝো?

অবান্তর কথা। হঠাৎ এ-কথাটা আসে কি করে?

এটা বোঝার মতো বোধই তো তোমার নেই। তুমি যা করবে, সেগুলোই সব ঠিক কাজ। আর আমার সব কিছুই অবান্তর। তাই তো!

মানুষটার কপালে ভাঁজ পড়লো। চোখে-মুখে তাচ্ছিল্য।

পলু, শোনো, এ-সব নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। এ-সব অর্থহীন কথাবার্তা।

দীপঙ্কর ভেতরের ঘরে ঢুকলো। পৌলমীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে ওঁর কোমর জড়িয়ে ধরলো। ডান হাত উঠে এলো স্তনচূড়ায়। পৌলমী চোখ বুজে তাঁর যন্ত্রণা সামলাচ্ছিলো। ঝটকা দিয়ে সে দীপঙ্করের ডান হাত সরিয়ে দিলো। তার চেয়েও দ্রুত ডাক্তার দীপঙ্করের ডান হাতের মুঠি ফের চেপে বসলো পৌলমীর বুকে।

পলু, বিছানায় চলো। রোজ রোজ একই রকম ব্যাপার ভালো লাগে না। ইজি হও পলু। কাম অন্। চলো, শোবে চলো।

দীপঙ্করের নিজেকে যদিও দারুণ ফ্রেশ লাগছিলো, কিন্তু পৌলমীর মনে হচ্ছিলো একটা সরীসৃপ যেন ওর শরীরটাকে ক্রমশঃ পেঁচিয়ে ধরছে। ওঁর চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিলো ঘৃণা। ও হাঁসফাঁস করছিলো।

প্রায় টানতে টানতেই দীপঙ্কর ওঁকে বেডরুমে নিয়ে গেলো।

একটু আগেও পৌলমীর খিদে পাচ্ছিলো।ও রাতে কিছু খায়নি। ভেবেছিলো, দীপঙ্কর এলে একসাথে খাবে। কিন্তু এখন আর পৌলমীর খিদে নেই। ওঁর মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছিলো। সে এক সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রণা। সারা বুক জুড়ে হাহাকার। খাঁ—খাঁ শূন্যতা।

‘........এই যন্ত্রণার কথা আমি কাকে বলবো! একটা অমানুষ আমার জীবনটাকে ছেকলে বেঁধে ফেলেছে। খাবলে খাবলে খাচ্ছে আমার শরীর। রাতে আমি খেলাম কি খেলাম না, তাও জানার প্রয়োজন বোধ করে না লোকটা! মন বলে কিছু নেই এর। এ কি করে ডাক্তারি করে আমি বুঝে পাই না। ওঃ! অসহ্য! কি করে এর থেকে মুক্তি পাবো আমি! আমি আর পারছি না যে।’.......

গা গুলিয়ে উঠছিলো ওঁর। খিদেটা একদম মরে গেছে। ধীরে ধীরে ওর শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছিলো। রোজকার মতোই ওর শরীর আর মনের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। ওঁর শরীরে এখন আর কোনো পোশাক নেই। আদিম জীবন শুরু হচ্ছিলো এই রাতে। কোন প্রেম ছিলো না এখানে। পৌলমীর নগ্ন শরীরে ডাক্তার দীপঙ্করের পরুষ হাত দু'টো খেলা করে বেড়াচ্ছিলো অবহেলায়। নিষ্পেষিত হচ্ছিলো পৌলমী। সে বাধা দেয়নি। সে কোনদিনই বাধা দিত না। বিয়ের পর থেকে সে সব কিছু উজার করে দেবারই চেষ্টা করেছিলো। আজ মনের ভেতর যখন দুঃখসাগর উথলে উঠছে.

যাকে নিজের করে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো, এখন তার ওপর জমে উঠেছে পুঞ্জীভূত ঘৃণা। কিন্তু তবুও কি আশ্চর্য! পৌলমী কিছুতেই এই পুরুষটাকে বাধা দিতে পারে না। কেন? এই রাগ আর ঘৃণার সঙ্গে শরীরী আকাঙ্খাও যেন ওর প্রতিরোধের সব বাধাগুলোকে ভেঙে দিতে চায়। দীপঙ্করের এক একটা আচরণ যখন পৌলমীকে হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়, সমস্ত রকম প্রতিরোধের শক্তিও সে হারিয়ে ফেলতে থাকে। পুরুষের আদিমতার হাতছানিতে সে ক্রমশঃ মেতে ওঠে। আনন্দ নয়, প্রেমও নয়, হতাশা থেকে উঠে আসা অবসাদ ওকে নিস্তেজ করে ফেলে। কিন্তু দহন চলতে থাকে গভীরে। পুরুষের প্ররোচনা ভেতরের ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা সেই তুষের আগুনকে উস্‌কে দেয়। দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে পৌলমী। মনের দাহ শরীরী দাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেও যেন সরীসৃপ হয়ে যায়। দাহ থেকে তীব্র সুখের জন্ম হতে থাকে পৌলমীর শরীরে। দাহ তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। উত্তাপ তাকে শরীরী সুখের দিকে ঠেলে দেয়। আশ্লেষে ডুবে যেতে যেতে সমস্ত কিছু ভুলে যায় সেই নারী। খেলা শুরু হয়ে যায় তখন।

'.......মনে হচ্ছে যেন একটা সাপ আমাকে তার পিচ্ছিল শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে। আমি চিৎকার করতে চাই। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সরীসৃপটা আমার শরীরে খেলা করতে শুরু করেছে। আমার লজ্জার সমস্ত পাপড়ি খুলে নিয়ে আমাকে আবরণহীন করে ফেলেছে। সেই অজগর হিসহিস শব্দে বিষ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার শরীরে। আমাকে ছোবল মারছে। আঃ! আবার ছোবল এসে পড়লো আমার ঠোঁটে। আমি ছাড়াতে পারছি না এই ভয়ঙ্কর সাপটাকে। আবার ছোবল! হিস-হিস শব্দ ঘুরছে আমার চারদিকে। ছোবলের পর ছোবল।'

......এ কি! আর তো কোন যন্ত্রণা নেই! প্রতিটি ছোবল আমার শরীর আর মনের ভেতরে উত্তপ্ত সুখ নিয়ে আসছে। আঃ! সুখ! আমার শরীরটাও যে পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। আমি কোন অতল গহ্বরে নেমে যাচ্ছি। আগুন আগুন সুখের মধ্য দিয়ে আমি সাপিনী হয়ে যাচ্ছি। আমিও ছোবল মারলাম। সুখ! আমি ফের ছোবল মারি। আগুনের গহ্বরে আমার সুখ চলতে থাকে। কর্দমাক্ত নোংরা সুখের মধ্য দিয়ে আমি পৌলমী, ক্রমশঃ অতলে নেমে যাই। সময়ের হিসাব থাকে না।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। হাজার বছরের ঘুম চোখে নিয়ে পৌলমীর নগ্ন শরীরটা বিছানায় পড়ে আছে। ডাক্তার দীপঙ্কর উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিদ্রামগ্ন। মাঝখানে এক অদৃশ্য প্রাচীর। দু'জনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।......ঢং-ঢং-ঢং......রাত তিনটে বাজলো। জানান দিলো দেয়াল ঘড়ি। সময়ের যাত্রাপথ তখন ভোরবেলার দিকে।

বোধিসত্ত্ব সকালে বাজার করতে বেরিয়েছিলো। ও লক্ষ্য করেছে, মূল বাজার থেকে সবজিওয়ালারা বাইরে রাস্তার ফুটপাতে নেমে পড়েছে। বাজার ক্রমশঃ ফুটপাত ধরে বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ সব্জি নিয়ে সরাসরি এখানে বিক্রি করতে চলে আসছে।

বোধিসত্ত্বও এখন আর বাজারের ভেতরে ঢোকে না। ফুটপাত থেকেই সব্জি কিনে নেয়। মাছও এখন ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে।

অ্যাই বুধ! বুধ!

বিকাশের গলা। বোধিসত্ত্ব ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো, বিকাশের হাতেও বাজারের ব্যাগ।

কিরে! তোর বাজার হয়ে গেলো নাকি?

বলতে গেলে প্রায় শেষ। এবার একটু মাছের দোকানে ঢুঁ মারবো।

বিকাশ ততক্ষণে বোধিসত্ত্বর কাছে এগিয়ে এসেছে।

আরে আর বলিস না। বাবা বাড়ি নেই। অগত্যা আমাকেই বেরোতে হলো। তোকে তো দেখতেই পাইনি ক'দিন! কোথাও গিয়েছিলি না কি?

না, না। বাড়িতেই ছিলাম।

লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত নাকি?

ওই আর কি! কাগজ-কলম নিয়ে বসছি, এই পর্যন্তই। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

চল্। ওই দোকানটায় বসে একটু চা খাই।

বিকাশই চায়ের অর্ডার দিলো। চা-য়ে চুমুক দিয়ে কথাটা পাড়লো বিকাশই।

বুধ, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

কি কথা?

বিকাশের কথা বলার ভঙ্গি দেখে একটু অবাকই হয়ে গেলো বোধিসত্ত্ব।

পিনাকী নাকি খুন হয়ে গেছে? কথাটা কি সত্যি?

বোধিসত্ত্ব চুপ করে রইলো। এই তো ক'দিন আগে মানিক খুন হলো। খুনিরা আরো একটা কচি ছেলেকে সেদিন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলো। সেদিন বিকাশের মনে তেমন কোনো ভাবান্তর সে দেখেনি। কিন্তু আজ বিকাশ খুব বিমর্ষ। বিকাশদের পুরো পরিবারটাই কংগ্রেসের সমর্থক। বিকাশ নিজে সক্রিয় রাজনীতি করে না বটে, কিন্তু সে কংগ্রেস দলের একনিষ্ঠ সমর্থক। উনিশশো সত্তর-বাহাত্তর সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই খুনোখুনির রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের হয়েই সে সওয়াল করে

গেছে। তাই দীপু, সজল কিংবা বোধিসত্ত্ব—কেউই বিকাশের সঙ্গে পারতপক্ষে রাজনৈতিক আলোচনা করে না। স্কুলজীবনের বন্ধু হিসেবে আর সব ব্যাপারেই বিকাশ বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে আছে। শুধুমাত্র রাজনীতিটুকু বাদে। সেই বিকাশের মনে আজ ভাবান্তর! অবাক হবারই কথা!

চুপ করে ছিলো বোধিসত্ত্ব। পিনাকী নেই—এই কথা মনে এলেই বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠছে। অতল শূন্যতা এসে ওকে তখন গ্রাস করতে চাইছে। কথা আসছে না। গুমরে গুমরে উঠতে চাইছে দুঃখের ঢেউ।

কি রে, চুপ করে রইলি কেন? কথাটা তা হলে সত্যি। তুই সবই জানিস! —বিকাশ এবার জোরের সঙ্গেই বললো।

তুই যতটুকু জানিস, আমি ততটুকুই শুনেছি। সবটাই শোনা কথা।

তুই কি শুনেছিস?

পিনাকী রায়গঞ্জে যাদের বাড়িতে ছিলো, সেখানে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। পিনাকীদের বাড়িতে এই খবরই এসেছে।

এক পরত কালো ছায়া নামলো বিকাশের চোখেমুখে। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুরে ট্রাম লাইনের ওপর চলে এসেছে। দু'জনের কেউই কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না। বোধিসত্ত্ব এবার বিকাশের দিকে তাকালো। বিকাশের চোখ-মুখ থমথম করছে। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারছিলো, বিকাশ কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। কথাগুলো বুঝি গলায় আটকে আছে। প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে বিকাশ।

কি হ[illegible] তোর?

পিনাকী[illegible] শেষ পর্যন্ত ওরা খুন করলো! ও! আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে! ওরা ভালো ভালো ছেলেগুলোকেই বেছে বেছে খুন করছে। অ্যান্টিসোশালগুলো দিব্যি ভোল পাল্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বোধিসত্ত্ব চুপচাপ। বিকাশ আজ কি বলতে চায়, সেটাই ও বুঝতে চাইছিলো।

পিনাকীর মতো দিলদরিয়া ছেলে লাখে একটাও মিলবে না।—বিকাশের বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছিলো যেন অতি কষ্টে।

একটু দম নিয়ে ও ফের বললো, কি করে ভুলবো, আমি বিকাশরঞ্জন রায়চৌধুরী, জয়পুরিয়া কলেজ থেকে অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স নিয়ে বি কমে ভালো রেজাল্ট করলাম কার জন্য? সেও ওই পিনাকী। ভিন্ন রাজনীতিতে বিশ্বাস করি বলে ও কখনোই বন্ধুত্বের হাত তো গুটিয়ে নেয়নি! দিনের পর দিন বাড়ি এসে অ্যাকাউন্টেন্সি বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তখনই বুঝেছিলাম, ওর সঙ্গে আমার মেরিটের ফারাক কতটা। সেই আমি এই দেশে একটা ভালো চাকরি করে সুখে থাকবো, আর পিনাকীর মতো ছেলে খুন

হয়ে যাবে!

বোধিসত্ত্ব দেখলো, বিকাশের চোখে জল।

......'অস্বীকার করি কি করে, যে সবার মনেই পিনাকী প্রভাব ছড়িয়েছে। এই আমি বোধিসত্ত্ব, ভুলতে পারছি ওঁর কথা? চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে দীপুর। সজল ক্রমশঃ আগুন হয়ে উঠছে। বিকাশের মতো ছেলেও আজ কষ্টে দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি কী বলবো? আমার কিছু বলবার নেই। আমি চুপ করে আছি। কিন্তু আমি কি শুধু এভাবে চুপ করেই থাকবো? কি করবো আমি?'.......

বুধ, আমি বাড়ি যাচ্ছি। কিছুতেই মন ভালো লাগছে না। পেটের ভেতর কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিলো। তোকে বলে শান্তি পেলাম।

বিকাশ আর দাঁড়ালো না। চলে গেলো।

...'কিন্তু আমি কোথায় যাবো? রেবতী মাস্টারমশাই বারবার আমাকে শুধু একই কথা বলে যাচ্ছেন। কিছু একটা তোমাকে করতেই হবে বুধ।

আমি কি-ই বা করতে পারি? আমি তো চাই, বুকের ভেতরে আগুন জ্বলতে থাক দাউ-দাউ করে। সেই আগুনে পুড়তে পুড়তে আমার কলম চলতে থাকুক। আর পৌলমী?

হ্যাঁ পৌলমী, আমার বুকের ভেতরের সেই আগুন তুমি বারেবারে উসকে দিচ্ছো। তুমি আমার মনের আনাচকানাচ জুড়ে এভাবে ছড়িয়ে পড়লে? কেন বল তো? আমি তো এক হতভাগা। কি পেলে আমার মধ্যে?'

......আমার ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের টুকরোগুলো জোড়া লেগে যাচ্ছে তোমার কাছে এসে।

'...পৌলমীর এ-সব কথা আমাকে নিরন্তর ভাবনায় ফেলে দিচ্ছে। আমি ওঁকে নিয়েই প্রত্যেকটা দিন, আর দিনশেষের সন্ধে-রাত্রি কাটিয়ে দিচ্ছি। ওর ডাক উপেক্ষা করতে পারি না আমি।'

'...তুমি কবে আসবে বুধ? এসো একদিন আমার কাছে। আমাদের বাড়িতে। চিঠিতে কি সব কথা লেখা যায়! কথার পাহাড় জমে আছে আমার বুকের মধ্যিখানটায়। তোমাকে সেসব কথা না বলা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

আরো একটা অসহ্য রাত পেরিয়ে এলো পৌলমী। মধ্য রাত থেকে ভোর হয়ে যায়। পৌলমীর ঘুম আসে না। মাথা দপ্-দপ্ করে যন্ত্রণায়। সারা শরীর জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে। সে শুধুই বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে।

ভোরবেলা এলে চারপাশটা বেশ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। পৌলমীর শরীরমন থেকে আগুন

আগুন যন্ত্রণা গলে যেতে থাকে। ভোরের ছোঁয়া যেন মায়ের হাতের স্পর্শ। তাঁর চোখ বুজে আসে। এতক্ষণ পর সে ক্লান্তি বোধ করে। পৌলমী ঘুমোয়। পৌলমী শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে।

পৌলমী যখন প্রগাঢ় ঘুমে ঢলে পড়ে, ডাক্তার দীপঙ্করের তখন ঘুম ভাঙে। প্রতিটি সকালের অভ্যেসে সে জেনে গেছে, পৌলমী এখন ঘুমে কাদা। ওকে ডাকাডাকি করার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া ওঁকে ডেকে তোলার কোনো দরকারই নেই এখন। কাজের মাসি এসে কলিং বেল টিপলো। ডাক্তার দরজা খুলে দেয়।

বৌদিমণি ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ। আমি বাথরুমে ঢুকছি। তুমি ঘরটর পরিষ্কার করে আমার টিফিনটা করে দিও। বাজারটাজার করতে হবে আজ?

না বোধ হয়।—বলে কাজের মাসি ফ্রিজ খুলে দেখে নিলো।—যা মাছ আর তরিতরকারি আছে, দেড় দু'দিন চলে যাবে।

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলো ডাক্তার।

বাথরুমের কল থেকে জল পড়ার শব্দ, ঘরে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের শব্দ, কাজের মাসির ঘর ঝাঁট দেওয়ার শব্দ—এসব মিলে একটা ঐকতান চলতে থাকে। কিন্তু তা ওই পর্যন্তই। তাতে কোনো প্রাণের সাড়া নেই।

প্রাত্যহিক কাজগুলো প্রত্যেকদিন সকাল দুপুর-সন্ধে-রাত্রি জুড়ে যন্ত্রের মতো হয়ে চলে। তাতে রুটিন আছে, আছে গৎ বাঁধা জীবন। কিন্তু সেই জীবনে সুর নেই, নেই কোনো ছন্দ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার দীপঙ্কর ব্যানার্জি জামা-প্যান্ট পড়ে নিলো।

মাসি, টিফিন হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

এখানে টেবিলে দিয়ে যাও!

দিচ্ছি!

পুরু করে মাখন দিয়ে দু'পিস পাঁউরুটি, দু'টো মর্তমান কলা আর বেশ বড় কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস দুধ টেবিলে রেখে গেল কাজের মাসি।

গুছিয়ে পরিপাটি করে খাওয়ার অভ্যেস দীপঙ্করের। স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষ। খাওয়ার ব্যাপারে রুটিন মেনে চলে। প্রোটিন-ভিটামিন-ক্যালোরি-কার্বোহাইড্রেট-ফ্যাট-আয়রন সব ঠিকঠাক হওয়া চাই। এক্ষেত্রেও অনেকটা যান্ত্রিক ভাবেই চলে ডাক্তার দীপঙ্কর।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে কবজিতে আঁটতে আঁটতে ড্রেসিং টেবিলের দিকে দৌড়লো সে। দেখে নিলো আয়নায় নিজেকে। চুলে

চিরুনি বোলালো। ফের বাইরের ঘরে বেরিয়ে এসে দ্রুত মোজা-জুতো পরে নিলো। এরপর অ্যাটাচিটা হাতে নিয়েই দরজার দিকে এগলো।

মাসি, তুমি যাবার আগে বৌদিমণিকে ডেকে দিয়ে যেও।

আচ্ছা।

দীপঙ্কর বেরিয়ে গেল। কাজের মাসি কিচেনে ঢুকে পড়লো। থালা-বাটি-গ্লাসের ঠুংঠাং শব্দ উঠছিলো সেখানে।

.......বালিকা বয়েস থেকে যে স্বপ্নগুলো সাজিয়ে তুলেছিলো পৌলমী, তারই ভাঙা টুকরোগুলো ভোরবেলার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সে ফের আস্ত রূপ দিতে চেষ্টা করে। বোধিসত্ত্ব ওঁর সামনে এসে দাঁড়ায়।

লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি পরে পৌলমী বোধিসত্ত্বের হাত ধরে ছুটতে থাকে সমুদ্রপাড়ের তটরেখা ধরে। ছুট-ছুট-ছুট-ছুট..........কোথাও উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, কোথাও নরম ঘাসের জমি, কোথাও ঝাউবনের স্বল্প ছায়া.......বহু বছর ধরে ছুটতে ছুটতে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় এসে পৌঁছে গেল ওঁরা। ওঁরা থমকে গেল। আকাশ ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠছিলো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। শোঁ-শোঁ সমুদ্র গর্জন শুনতে পাচ্ছে পৌলমী। এবার অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। পৌলমীর মনে কোনো ভয় ছিলো না। সে আর কিছুতেই ভয় পায় না। পৌলমী জানে, যন্ত্রণাকর অন্ধকার রাতে সে নির্ভয়ে সাপের মতো সরীসৃপ হয়ে যেতে পারে।

....গাঢ় অন্ধকার ...সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। দূরে বাতিঘর দেখা যাচ্ছিলো। বাতিঘর থেকে জোরালো আলো আছড়ে পড়ছিলো সমুদ্রে। বিপজ্জনক ডুবো পাহাড় এড়িয়ে কিভাবে ঠিকঠাক পথে পাড়ি দেবে জাহাজ, তারই নিশানা দেখাচ্ছিলো সেই বাতিঘর।

'বুধ. শুনছো?

বলো।

তুমি আছো?

হুঁ আছি।

আমাকে সেই স্বপ্নের রাস্তা দেখিয়ে দিও।

ওই বাতিঘরের আলো দেখে দু'জনকে একইসঙ্গে রাস্তা খুঁজে নিতে হবে।'

'...অন্ধকার ফিকে হয়ে যায়। নিমেষের মধ্যে আলো ঝলমল করে উঠলো চরাচর। মা সামনে এসে দাঁড়ায়।

পৌলমী।

মা!

ভয় পাসনে।

পাইনি।

মা কপালে হাত বুলিয়ে দেন। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিলো পৌলমীর।

কতদিন আদর কর না তুমি আমাকে। আমি যে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি মা!

সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে জোর রাখিস।

মা কপালে হাত বুলিয়ে দেন। চুলে বিলি কেটে দেন। পিঠে হাত বোলান। এত আদর! বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়।'

কেউ ডাকছিলো ওঁকে। দিদিমণি! ও দিদিমণি! ওঠো। অনেক বেলা হয়ে গেছে। উঠে পড়ো!

স্বপ্নঘুমের রাজ্য থেকে এক ঝটকায় ফিরে এলো পৌলমী। বিছানায় উঠে বসলো।

কাজের মাসি ডাকছে।

বৌদিমণি, কাজকম্মো গুছিয়ে দিয়ে গেলুম। উটে পড়ো। বেলা অনেক হলো। আমি যাচ্চি। দরজাটা লক্ করে দাও।

কাজের মাসি চলে গেলো। তন্দ্রায়-আধো জাগরণের মধ্যে বিছানা থেকে উঠে পৌলমী দরজা লক্ করে দিয়ে ক্লান্ত টলোমলো পায়ে ফিরে এলো বিছানায়। পোশাকের ঠিক নেই। ফের উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজলো সে। সারা শরীরে অবসাদ-ব্যথা। চিন্তাসূত্রগুলো আলগা হয়ে গেছে ওঁর। ও কিছু ভাবতে চাইছিলো না। ফের অস্পষ্ট স্বপ্নের জগতে চলে যাচ্ছিলো পৌলমী।

...এক আধো-অন্ধকার ভাসমান জগৎ। কখনো চেতনায়, কখনো অচেতনে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে পৌলমী নামে এক নারী। সীমাহীন দুরন্ত জলরাশি। তমসাঘন ঘোর কৃষ্ণ উত্তাল সেই সামুদ্রিক প্রবাহে সে শুধুই ভেসে চলেছে। না, সে ডুবছে না।

'...কোথায় যাচ্ছি আমি! এ-কোথায়ই বা আছি আমি!' অবাক জিজ্ঞাসায় বিমূঢ় পৌলমী নিজেকে দেখতে চেষ্টা করছিলো। শরীরে তাঁর কোনো পোশাকের আবরণ ছিলো না। ভেসে যেতে যেতে নিজেকে দেখে সেই নারী নিজেই অবাক। পাথরে খোদাই সুগঠিত এক নারীমূর্তি যেন।

'এ কি আমি? আমি কি এতটাই সুন্দর। কিন্তু রাতভর অসুখী সঙ্গমে আমার কোনো সৌন্দর্য ছিলো না। আমি একটা নোংরা সরীসৃপ।'

'না পৌলমী, তুমি মোটেই তা নও। তুমি সুন্দর। তোমার সুন্দর এই শরীর থেকে আমি সৌন্দর্য ছেনে বের করবো। তোমার মনের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকা গোছা গোছা সেই সব স্বপ্নকে আমি বাইরের পৃথিবীতে উড়িয়ে দেবো সকলের জন্য। তোমার

মধ্যেই আমি আমার আকাঙ্খাকে খুঁজে পেলাম।'

'বুধ, তুমি আছো আমার সঙ্গে!'

'হ্যাঁ, দেখো, নিজেকে খুব হালকা লাগছে না?'

'হ্যাঁ গো, খুব হালকা লাগছে! আমি কি জলকন্যা হয়ে গেলাম!'

'তাই হবে হয়তো! দেখেছো, তুমি মোটেই নোংরা হয়ে যাওনি। তা হলে এমন পালকের মতো হালকা হয়ে যেতে পারতে না। কিন্তু ওহে জলকন্যা, তোমার জলপুরুষটি কে?'

'আর কে হতে পারে? তুমি ছাড়া?'—

টুং টাং জলতরঙ্গের শব্দ ভেসে এলো বহুদূর থেকে। ওরা দু'জনেই সামনের দিকে তাকালো।

ওরা দেখলো, বাতিঘর থেকে তির্যক আলোর সমান্তরাল রেখা প্রগাঢ় সমুদ্রজলের ওপর দিয়ে সোজাসুজি চলে গেছে। ওরা দু'জন সেই আলোকসঙ্কেত ধরে জলপথ বরাবর চলতে শুরু করলো, ভেসে ভেসে।

পালকের মতো হালকা শরীর নিয়ে ভাসতে ভাসতে পৌলমী ফের টুংটাং জলতরঙ্গের শব্দ শুনতে পেলো। আবার জলতরঙ্গের শব্দ—টুংটাং-টুংটাং।

ক্রমাগত জলতরঙ্গের শব্দ পৌলমীকে তাঁর অচেতন জগৎ থেকে ক্রমশঃ সরিয়ে আনছিলো। আবার সেই শব্দ—টুংটাং-টুংটাং। তাঁর মস্তিষ্কের ঘুমিয়ে পড়া কোষগুলো নড়াচড়া করতে আরম্ভ করেছে। জেগে উঠছে সে। চেতনার বন্ধ কপাটগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে তাঁর। কয়েকটা মুহূর্তের ব্যাপার হলেও অবচেতনের দূর জগৎ থেকে যেন বহু যুগ পেরিয়ে চেতনার চেনা জগতে পা রাখছিলো পৌলমী।

টুংটাং-টুংটাং।

এবার ঘুম ভেঙে গেলো ওঁর। পৌলমী বুঝতে পারলো এবার, নাগাড়ে কলিং বেল বেজে যাচ্ছে টুংটাং শব্দে।

উঠে বসলো পৌলমী। বিছানায় লুটিয়ে থাকা শাড়িটা সারা শরীরে জড়িয়ে নিলো। খাট থেকে নেমে অবসাদ মাখানো শরীর নিয়ে ড্রইংরুমে চলে এলো। দরজার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে একটু ধাতস্থ হয়েই দরজা খুলে দিলো সে।

কিন্তু এ কাকে দেখছে পৌলমী! অবাক হবারই কথা। এত ডাকাডাকি, এত চিঠি লেখা---কোন জানান না দিয়েই স্বপ্নে নয়, পৌলমীদের ফ্ল্যাটের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী।

বুধ! তুমি! এসো, এসো!

ঘুমোচ্ছিলে? ডিস্টার্ব করলাম।

হুঁ, আগে ভেতরে এসো। তোমার কথার উত্তর পরে দেওয়া যাবে।

বোধিসত্ত্ব ভেতরে ঢুকলো। পৌলমী দরজা বন্ধ করে দিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় বসলো। বললো, বসো বুধ। তুমি এলে। কি সুখ যে হচ্ছে আমার, কেমন করে বোঝাই সেটা।

কোনো উত্তর দিলো না বুধ। সামান্য হেসে সোফায় বসলো।

বুধ পৌলমীকে দেখছিলো। সপ্রশ্নে দেখছিলো তাঁদের ফ্ল্যাটের চারপাশ, অন্যান্য সমস্ত কিছু।

কি দেখছো?

সবকিছুই। ঘুম থেকে তুললাম। তাই না? চোখ-মুখ জুড়ে ঘুম ঘুম ভাব।

হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলাম।

এতক্ষণ! বেলা পৌনে এগারোটা বাজে। বাড়ির কর্ত্রী যদি এতক্ষণ ঘুমোয়, সংসার তো লাটে উঠবে।

এ-বাড়িতে সংসার বলে কিছু নেই।

তোমার কথার ধরন পাল্টালো না।

আমার জীবন-যাপন যেমন ছিলো, যত দিন যাচ্ছে, তা আরো ভয়ানক হচ্ছে। কথাবার্তা আর কি করে পাল্টাবে বলো। যাক গে! ছাড়ো। আর ঝগড়া নয়। কালকে রাত থেকে মনটা ভেঙে পড়তে চাইছে। রাতে ঘুমোতে পারিনি। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি।

কেন ঘুম হয়নি?

কোন রাতেই হয় না।

বুধ আর কোনো প্রশ্ন করলো না। সে পৌলমীর আপাদমস্তক দেখছিলো। আজ পৌলমীকে বিধ্বস্ত লাগছে। কোনো প্রাণ নেই এ-বাড়িতে। পৌলমীর চোখের কোণে কালি পড়েছে। বিমর্ষতা ওর সর্বাঙ্গ জুড়ে। বোধিসত্ত্ব ভাবছিলো, 'পৌলমীর মধ্যে কি শুধুই বিমর্ষতা! না না! তা মোটেই নয়। 'সাগরদ্বীপে যে পৌলমীকে আমি দেখেছিলাম, ছাইচাপা আগুনের মতো অবসাদ আর ক্লান্তির আড়াল থেকে সেই পৌলমী বারবার উঁকি দিচ্ছে।

দুর্নিবার টানে আমি আজ এখানে চলে এলাম। পৌলমী, তোমাকে আমি আদৌ পেতে চাই কি? চাইলে কেমন করেই বা চাই, তা আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার আর চলছে না। তাই চলে এলাম।'......

বুধ, তুমি আবার সেই ভাবনায় ডুবে গেলে। তাই তো?

হুঁ, কথাটা মিথ্যে নয়।

স্বীকার করলে ভাগ্যিস। হঠাৎ পৌলমী সচেতন হয়ে উঠলো। তুমি বোসো বুধ। ঘুম চোখে বসে আছি এতক্ষণ ধরে। ফ্রেশ হয়ে আসি।

কোনরকমে শরীরে কাপড় জড়িয়ে ছিলো পৌলমী। তাই নিয়ে ক্লান্ত ভারী পায়ে ভেতরের ঘরে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লো সে।

বোধিসত্ত্ব শাওয়ারের জলের শব্দ শুনতে পেলো।

শাওয়ারের জলের শব্দ পৌলমীর কাছে সমুদ্রবাতাস হয়ে গেল। একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ আর লক্ষ লক্ষ জলকণার নিবিড় মাখামাখিতে তাঁর ক্লান্ত মস্তিষ্ক শীতল হয়ে যাচ্ছিল। পৌলমী ডুবে যাচ্ছে। অবসাদের বেড়া ডিঙিয়ে আরো গভীর অজানা কোনো এক জগতে চলে যাচ্ছে সে। .....'বুধ আজ আমার কাছে এসেছে। আমার যে কি দারুণ সুখ হচ্ছে! কাকে বোঝাই! না। কাউকে বোঝানোর দরকার নেই। বুধ বুঝতে পারলেই যথেষ্ট।'

বোধিসত্ত্ব সোফা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলো। ওর তো কিছু করার নেই। এই প্রথম সে এ-বাড়িতে এসেছে। এ-বাড়ির সাথে তার কোনো পরিচয়ই নেই। তবু বোধিসত্ত্ব এটুকু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছে, এখানে একেবারেই প্রাণের সাড়া নেই। এখানে বহুক্ষণ থাকলে বোধহয় মানুষের সহজাত অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যাবে। এ-রকমই হাজারটা চিন্তা বোধিসত্ত্বর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। শুধুই চুপচাপ পায়চারি করছিলো সে। শাওয়ারের একটানা ঝিরঝির শব্দ ওর কানে আসছিলো তখনো।

.

...সমুদ্রবাতাসের সঙ্গে জলকণার মেলবন্ধন হচ্ছিলো যেন পৌলমীর অনাবৃত শরীরে। এই তো নারী শরীর। চমৎকার করেই গড়ে তুলেছেন সৃষ্টিকর্তা। সুন্দরের কথা মনে হলেই প্রকৃতির ফুলফল পাখ-পাখালি-পাহাড়সমুদ্রনদীপ্রপাতের সঙ্গে নারীর মুখ, আর তাঁর শরীরখানিও এসে যায়। যেখানে প্রেম, যেখানে ভালোবাসা পাহাড়ী ঝর্ণা হয়ে শরীরের দু'কূল ছাপিয়ে মনের তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে দেয়। অন্ধকারকুটিল রাতের চিহ্ন শরীর থেকে মুছে ফেলে নদীবিধৌত উর্বরা মাটির গন্ধ খুঁজে ফিরছিলো সেই নারী, যে নারীর নাম পৌলমী।

'......বুধ, আমি তোমার কাছে কী নিয়ে দাঁড়াতে পারি? জানি না, আমি বুঝেও উঠতে পারি না, তোমাকে আমি কী দিতে চাই। যদি বলো, কি পেতে চাই আমি তোমার কাছে? তবে বলবো, তোমার সবটাই পেতে চাই।'

বোধিসত্ত্ব বাইরের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো তখনো। সময় চলে যাচ্ছে। চিন্তাস্রোত ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিলো ওর মনের পরতে পরতে। বোধিসত্ত্বও বুঝি এখন সমুদ্রের শোঁ-

শোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। পৌলমীর বুকের ওঠাপড়া কি টের পাচ্ছে বোধিসত্ত্ব?

আঁধারমাখানো শরীর ধুয়ে ফেলে আদ্যন্ত নগ্ন পৌলমী নিজের মধ্যে তখনো বর্ষাকালের উর্বরা মাটির সোঁদা গন্ধ খুঁজছিলো।

...বহু সময় পার হয়ে গেল। অনন্তকাল বোধহয়। মন যখন সময়ের হিসেব রাখে না, তখনই বোধহয় সেই নারী নিজেকে খুঁজে পায়। উর্বরা মাটির সোঁদা গন্ধ ধরতে পারে। জলধারায় সে তখনই পবিত্র হয়ে যায়।

অনন্তকাল পেরিয়ে বহু যুগের ওপার থেকে পৌলমী ফিরে এলো এখানে। যেখানে বোধিসত্ত্ব অপেক্ষা করছিলো।

চোখ খুললো পৌলমী। '...আমি আছি বুধ। আমি তোমাতেই আছি। মনুর বিধি ভেঙে আজ আমি সব তোমাকে দিয়ে দিতে চাই। বিশ্বাস করো বুধ! তবেই আমার শান্তি। না হলে আমার শরীরটাকে—না, না। আজ আমি অন্য কথা ভাববো না। আমার শরীর থেকে সমস্ত ক্লেদ মুছে ফেলে তোমার কাছেই আমি দাঁড়াবো।'

...এক যুগ পেরিয়ে যাবার পরে বোধিসত্ত্বর সামনে এসে দাঁড়ালো পৌলমী।

আকাশ ছুঁয়ে যাওয়া নগ্নতায় আচ্ছন্ন পৌলমী শেষ পর্যন্ত এখন বোধিসত্ত্বর সামনে দাঁড়িয়ে। বোধিসত্ত্বর মুখোমুখি।

আমার আর কোনো দ্বিধা নেই বুধ। তোমার কাছে আমার কোনো লজ্জা নেই। তুমি আমার ঘরে প্রথম এলেও তুমি আমার সদরে-অন্দরে আছো সবসময়।

বোধিসত্ত্বর বুকের মধ্যে জলপ্রপাত। এ কোন পৌলমী? দেলাক্রোয়া, না কি রেনোয়ার ক্যানভাস থেকে উঠে আসা নারী শরীরের কারুকাজ! না কি পাথরের শরীরে রদ্যাঁর ছেনি-হাতুড়ির নিপুণ কারুকৃতিতে গড়ে ওঠা ভাস্কর্য! পৌলমী, তুমি আমার প্রেম, তুমি আমার কাছে সুন্দর আর পবিত্র সুখের প্রতিমূর্তি। তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম।

বিমর্ষ-বিষণ্ণ এই ঘরে এখন লক্ষ তারা ঝিকমিক করে উঠলো। বোধিসত্ত্বর বুকের মধ্যে জলপ্রপাতের শব্দ তুমুল হয়ে তুললো ঝড়।

ঝড় শুরু হয়ে গেছে। আবরণহীন দুই নরনারী উদ্দাম হয়ে উঠেছিলো।

সীমানাহীন সুখের গভীরতায় হারিয়ে যেতে যেতে তীব্র আশ্লেষে-চুম্বনে মাতাল দু'জনের শরীর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

জলপ্রপাতের লাগামছাড়া শব্দ বোধিসত্ত্বর বুকে, ঘূর্ণিঝড়ের একটানা আওয়াজ পৌলমীর মাথায়। গহীন শরীরে অকৃপণ সুখের মহুল-বাতাস, ছাতিমের ঘ্রাণ,

দু'জনেরই।

আমি তোমাকেই চাই!

আমিও চাই তোমাকে! অনেক যুগের পরে, দ্বিধামুক্তির কণ্ঠস্বর দু'জনের মধ্যেই।

শরীরের মধ্যে শরীর, আর মনের মধ্যে মন ডুবে গেল শেষ পর্যন্ত।.....

বুম্-বুম্ করে বোমার শব্দ। চায়ের দোকানে বসে যারা চা খাচ্ছিলো, তারা চমকে গেল। বোধিসত্ত্ব খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিলো। ও মাথা তুললো। একজন মন্তব্য ছুঁড়লো, সাতসকালে আবার পেটোবাজি শুরু হয়ে গেছে।

আওয়াজটা গঙ্গার ধারের দিকেই হলো মনে হয়।

বোধিসত্ত্বর ভালো লাগছিলো না। খবরের কাগজটা রেখে ও উঠে পড়লো। উঠে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

রাস্তার মোড়ে সনাতনের পানবিড়ির দোকানের সামনে আসামাত্রই বোধিসত্ত্ব দেখলো, চ্যাংড়া ছেলেগুলো ছুটে যাচ্ছে গঙ্গার আহিরীটোলা ঘাটের দিকে।

এই বুধ! বুধ!— সজলের গলা। ঘাড় ফিরিয়ে বোধিসত্ত্ব দেখলো সজল হাত তুলে ডাকছে। বোধিসত্ত্ব এগিয়ে গেল ওর দিকে।

কি হয়েছে?

রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাকসিডেন্ট!

ঝুপড়িগুলোর পাশে ডাঁই করা ভাঙা বাক্সপ্যাঁটরার ভেতর দুটো বোমা রেখে দিয়েছিলো কারা যেন। ঝুপড়ির দু'টো বাচ্চা ছেলে বোমাদু'টো বের করে বলের মতো লোফালুফি করছিলো।

সর্বনাশ!

ব্যস! বার্স্ট করেছে। দু'টো বাচ্চাই স্পট ডেড। হাত-পা উড়ে গিয়েছে। বীভৎস অবস্থা। একটা বাচ্চার দিদি ওর ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে খানিকটা দূরে বসে ছিলো। সেও বেশ উন্ডেড হয়েছে। মেয়েটা ছোট ভাইকে বাঁচাতে একদম বুকে চেপে ধরে আড়াল করে উপুড় হয়ে পড়েছিলো। তাই বাচ্চাটার একেবারেই কিছু হয়নি। মেয়েটার পিঠটা ঝলসে গেছে।

ওঃ! কি ভয়ানক! তুই কোথায় যাচ্ছিস?

শ্রীগোপাল মেডিক্যাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করবো। তোর যদি অসুবিধে না থাকে, তবে একটু স্পটে যা। মাস্টারমশাই এইমাত্র গেলেন ওখানে।

অসুবিধে আবার কি! যাচ্ছি আমি।

ঠিক আছে।—বলেই সজল ছুটলো।

আহিরীটোলা ঘাটের কাছে রেললাইনের পাশে ঝুপড়িগুলোর ওখানে তখন লোকে লোকারণ্য। তিন চারজন মহিলা বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। একটা গোডাউনের বিশাল মেটে রঙের দেয়ালে ছিটকে আসা রক্তের দাগ, মাটিতে ছিঁড়ে যাওয়া বাচ্চার হাত, ঝলসানো কালো চামড়ার ছোট ছোট শরীর দু'টো পড়ে আছে। বোধিসত্ত্বর গা গুলিয়ে উঠলো।

হাউ হাউ করে নারীপুরুষের কান্না, নানা জনের ভীত সন্ত্রস্ত মন্তব্য, ভিড় সরাবার জন্য কয়েকজনের ব্যর্থ চেষ্টা, এরই মধ্যে এপাশ-ওপাশ থেকে ছুটে আসছে আরো কৌতূহলী লোকজন।

সবার মধ্যে থেকেও সকলের থেকে আলাদা রেবতী মাস্টারমশাইকে দেখতে পেলো বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব এগিয়ে গেল। গোটা দশ বারো ছেলে মাস্টারমশাইয়ের পাশেপাশেই রয়েছে। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারছিলো, মনে মনে উত্তেজিত হলেও রেবতী মাস্টারমশাই ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলাচ্ছিলেন।

কিরে, সজল কি গেছে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য?

হ্যাঁ স্যার।

এরই মধ্যে ফার্স্ট এইডের বাক্স নিয়ে দু'টো ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হলো।

স্যার, একজন ডাক্তার এসেছেন।

ঠিক আছে। ওদিকে দেখ। টুম্পার মায়ের কাছে বাচ্চাগুলো আছে। এই যে ডাক্তার, এদিকে আসুন!

ভিড় ঠেলে রেবতী চ্যাটার্জি ছুটলেন সামনের দিকে। ওদিককার ঝুপড়িগুলো অক্ষত ছিলো। বোধিসত্ত্বও একটু জোরে পা চালিয়ে রেবতীবাবুর পেছন পেছন গেলো। রেবতীবাবু ডাকলেন, টুম্পার মা! কোথায় গেলে? এই যে, ডাক্তার এসে গেছে। কই রে গোবিন্দ! ডাক্তারি বাক্সটা আনলি?

ঝুপড়ি থেকে এক মাঝবয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। কোলে দু'টো বাচ্চা। দু'টো বাচ্চাই অল্পবিস্তর জখম। কাটা জায়গাগুলো দিয়ে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

ডাক্তার এলো দাদা?

হ্যাঁ। এই যে ডাক্তার! এদের একটু ব্যাণ্ডেজ ট্যাণ্ডেজ করতে হবে। গোবিন্দ, এখানে থাক। আমি ওদিকটায় যাই। থাকোমণি কই! আজকে তো সবার কাজকম্মো-রান্নাবান্নার বারোটা। খাবারদাবার ব্যবস্থা করতে হবে। থাকো! ও থাকো! বড্ড ফাঁকিবাজ মেয়েটা।

এই দেখলাম, এই নেই।

না স্যার। থাকোমণি নান্টু আর গোপালকে নিয়ে চাল-ডাল-আটা কালেকশন করা
বেরিয়েছে।

বাঃ। ভারী কাজের মেয়ে। সাধে কি ওর ওপর আমার এত ভরসা!

রেবতীবাবু সামনের দিকে এগোতেই একেবারে বোধিসত্ত্বর মুখোমুখি।

আরে বুধ! এসে গেছো!

হ্যাঁ স্যার, সজল বললো, আপনারা সবাই এখানে আছেন'

কিন্তু সজলটা গেল কই?

আপনিই তো অ্যাম্বুলেন্সের জন্য পাঠালেন!

ওহো, তাই তো! সব ভুলে যাচ্ছি। বোধিসত্ত্ব, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। দরকা
হবে তোমাকে। পালিয়ে যেও না।

না স্যার। আমি আছি।

হ্যাঁ, আমি জানি। তুমি আছো। দেখছো তো, এইসব মানুষগুলোকে ছেড়ে যাবে
কোথায়?

'...সত্যিই তো! এই সব মানুষগুলোই বা যাবে কোথায়? যদি রেবতী চ্যাটার্জিদে
মতো মানুষগুলো না থাকে? আমি অনেক তর্ক করেছি পিনাকীর সঙ্গে। বিকাশে
সঙ্গে। এমনকি রেবতী স্যারের সঙ্গেও। কিন্তু এমন সব দিনে রেবতী স্যারকে আমি
দেখলাম, তখন আর তর্ক বেরোয় না মাথা থেকে। আমার মাথা আনত হয়ে যায়
আমি কথা খুঁজে পাই না। রেবতী স্যারের রাজনীতি আমি এখনো সেভাবে বুঝতে
চেষ্টা করিনি। কিন্তু মানুষটার মানসিকতা, গরিবগুর্বো মানুষগুলোর ওপর এমন
পিতৃসুলভ আচরণ, তা তো আমি অস্বীকার করতে পারি না'।

চমক ভাঙলো বোধিসত্ত্বর—

স্যার, কুড়িয়ে বাড়িয়ে পনেরো পাউন্ড পাঁউরুটি জোগাড় হলো।

ফ্যামিলি ক'টা আছে?

আঠারোটা ঘর।

একেবারে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর মা-বাবার হাতে ভাগটাগ করে দিয়ে দে এগুলো

'...আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী, এ-সব দেখি আর ভাবি শুধু, এইসব মানুষগুলো
তো আমার চারপাশে আছে। আমার কাহিনীর কুশীলবরা। কিই বা সম্পদ আছে রেবতী
স্যারের? কিন্তু কেমন কল্পতরুর মতো বিলোচ্ছেন সব কিছু। আর্তজনের জন্য খাবার
ওষুধ, উৎসাহী যুবক, সবই তাঁর কাছে হাজির। এমন মানুষটি তো মস্তোবড় সম্পদশালী
কি নেই তাঁর?'

সাইরেনের শব্দ। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। -

এসে গেছে স্যার!

ব্যাপার।

তা হলে গৌরীকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যা।

গৌরীর মা-বাবাও তো যাচ্ছে।

ওর মা যাক। বাবা এখানে থাক। না হলে গৌরীর ভা

অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো গৌরী নামে মেয়েটাকে। পিঠটা

লাল টকটকে বীভৎস হয়ে গেছে। বোধিসত্ত্ব রক্তের ওপর শুয়ে থাকা

দেখেছিলো। আজ দেখলো ছিন্নভিন্ন শরীরের দুই মৃত শিশুকে। দু'টো ক মুড়ে সেই শরীর দু'টোকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো।

দুই মায়ের উথালপাথাল আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। ওরই মধ্যে রেবতী স্যারের গলা পাওয়া গেলো।

আরে ও গোবিন্দের মা, থাকোর মা! বউ দু'টোকে একটু সরিয়ে নিয়ে যাও। অ্যাম্বুলেন্সটা বেরোতে পারবে না যে!

দাদা গো! আমার দুধের বাছারে কে মারলো দাদা! আমার আর যে কেউ রইলো না গো দাদা!—কাঁদতে কাঁদতে দুই সন্তানহারা নারী আছড়ে পড়লো রেবতী স্যারের পায়ের কাছে।

আমরা আছি। আমাদের মতো বুড়ো ছেলেগুলো তো আছে! বোধিসত্ত্ব দেখলো, রেবতী স্যারের চোখে জল। গলা ধরে গেছে। প্রসঙ্গ পাল্টালেন রেবতীবাবু।

সজল, দেখো তো, থাকোমণি চাল-ডাল কেমন জোগাড় করলো। আর সন্তোষ ডেকরেটর থেকে আমার নাম ক'রে একটা বড় হাঁড়ি, কড়াই, ডেকচি হাতা-খুন্তি উনুন যা লাগে নিয়ে এসো। আজকের দিনটা খিচুড়িই খাওয়াতে হবে।

কান্নাকাটি হৈ হট্টগোল, দৌড়োদৌড়ি এর মধ্যেই একের পর এক কাজ হয়ে যাচ্ছিলো। এরই ফাঁকে রেবতী স্যার ধুতির খুঁট দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছলেন।

বোধিসত্ত্ব এ-সবই দেখছিলো। ও জানেও না, ওর গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে কখন থেকে।

রেবতী স্যার ওর কাছে চলে এসেছিলেন। কাছে এসে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, বুধ, দেখছো, এই সমাজে এই সব দুঃখী অসহায় মানুষগুলোর পাশাপাশি তুমি হাঁটছো। ওদের কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কেউ নেই আমরা ছাড়া। তাই নয় কি?

'...হ্যাঁ, সে কথা কি করে অস্বীকার করবে বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী!'

এই দেখলাম,

নয়

‘জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই।
তাহার পরিবর্তন হইয়াই থাকে। যুদ্ধের নিহত
হইলে মোসলমানদিগের স্বর্গলাভ হয়।’

—*সূরা আল এমরান*

সাতাত্তর সাল। ষোলই মার্চ। সারা দেশে নির্বাচন হলো। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল হেরে গেলো নির্বাচনে। একুশে মার্চ সারা দেশ থেকে জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া হলো। দেশ জুড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যেতে লাগলো। চব্বিশে মার্চ মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে জনতা দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। চাপা গুঞ্জন চলতে লাগলো সব জায়গাতেই। খবরের কাগজে, রেডিওতে এই খবর ছড়াতে লাগলো সারা দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল শহর, জেলা সদর শহর ও গঞ্জ এলাকাগুলিতে ফিসফাস আলোচনা শুরু হয়ে গেলো। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সকাল বিকেল ঠারেঠোরে কথাবার্তা চলতে লাগলো চায়ের দোকানে, হাটে-বাজারে, স্টেশন প্লাটফর্মে, সব জায়গাতেই। চর সুলতানপুর, মেদগাছি, মালোপাড়া —এ সব জেলে গ্রামগুলিতে তার তেমন একটা প্রভাব পড়লো না। এমনিতেই জেলেদের জীবনে নিত্য অভাব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার হেরফেরে তাদের কীই বা আসে যায়।

দিন যখন পাশ ফিরে শোয়, সন্ধিক্ষণের শেষ আলোটুকু মুছে যেতে যেতে রাত্রি আসে নৈঃশব্দ্য নিয়ে। রাত্রি যখন পাশ ফেরে, সূর্য ওঠে। দিন আসে। জাগরণে থাকে মানুষ। তাই দিনকে বোঝা যায়। কিন্তু রাত্রি থাকে রহস্য জড়িয়ে নিয়ে। কারণ, মানুষ রাত্রির সঙ্গে থেকেও থাকে না। চলে যায় ঘুমের দেশে। চর সুলতানপুর, মালোপাড়া, মেদগাছির মাঝিরা নদীর বুকে জ্যোৎস্না ধোওয়া রাত্রিকে দেখেছে। আঁধার রাতের সঙ্গেও সহবাস করতে হয় তাঁদের। রাত্রি তাই তাঁদের কাছে তত অধরা কিংবা রহস্যময় নয়। কারণ তাঁরা রাতেও মাছ ধরে। ওই যে দূরে আলো জ্বলছে, ওই আলোটা সারা রাত জ্বলবে। নদীর উত্তর পারে পূব দিক ঘেঁষে রসুলপুরের মাঠ। দিনের বেলা দেখা যাবে, মাঠ জুড়ে সাদা কাশফুলের বন্যা। তার ঠিক ওপারেই সুন্দরপুর। রসুলপুরের মাঠের পর থেকে ফসলী জমির শুরু। ওই আলোটা হলো ডিপ টিউবওয়েলের কন্ট্রোল রুমের ইলেকট্রিকের আলো। সন্ধে হলেই আলোটা জ্বলে ওঠে। আজও তাই।

চৈত্রের শেষ হতে চললো। দুপুর রোদের তেজ এখন বেশ। রাতে নদীর বুকে

ফুরফুরে বাতাস। এই ফুরফুরে বাতাস বুক ভরে নিতে পারাটাও ভাগ্যের ব্যাপার। এই পোড়া দেশে শান্তিমতো অক্সিজেন নেওয়া অতই সহজ নাকি! রসুলপুরের মাঠের সামনে নদীতে এই মুহূর্তে যে লোকটা ডিঙি নৌকোয় চড়ে স্রোত ঠেলে পশ্চিমে এগিয়ে আসছিলো, তার কাছে গত কয়েক বছর প্রাণ ভরে অক্সিজেন নেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়েছিলো।

সেই আলোটাকে পেছনে ফেলে রেখে অন্ধকার নদীর বুকে ছোট ডিঙি নৌকোটা চর সুলতানপুরের দিকে এগোচ্ছিলো। নৌকোয় একজনই ছিলো। সে-ই দাঁড় বাইছিলো, যতটা নিঃশব্দে চলা যায় সেভাবেই। চৈত্রের রাত্রি। অন্ধকার হলেও অভিজ্ঞ মাঝির চোখ এড়ানো কঠিন। কারণ কুয়াশা নেই। ডিঙি নৌকোটা প্রথমেই নদীর দক্ষিণ পারে চলে এলো। পাড়ের ছায়ায় ছায়ায় সেই ছায়ামূর্তি ডিঙি নিয়ে এগোতে লাগলো। কোথাও কোথাও ডাঙা ভাঙনের পর হা করে ঝুলে রয়েছে। খাড়া হয়ে আছে। তারই নিচ দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় বিপজ্জনকভাবে ডিঙিটা এগিয়ে চললো। এক-দুই-তিন করে চল্লিশ মিনিটের মাথায় ভাগীরথীর বুকে নৌকায় জেগে থাকা মাঝিদের এড়িয়ে ডিঙি এসে ভিড়লো চর সুলতানপুরের ঘাটে। ডিঙিটা পারে বেঁধে ছায়ামূর্তি ওপরে উঠে দ্রুত এগিয়ে অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়ার নিচে খানিকক্ষণ দাঁড়ালো। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে ধীর পায়ে, সন্তর্পণে রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললো। শিকারী বিড়ালের মতো শব্দহীনতা এই আগন্তুক রপ্ত করেছে ভালোই। শুকনো পাতায়ও পা পড়লো না। গাছের-গভীর ছায়ায় ছায়ায় সে পৌঁছে গেলো ভৈরব দাসের মাটির বাড়ির সামনে। মধ্য নদীতে জাউল্যারা জেগে থাকলেও ঘরের নিবিড় আশ্রয়ে এরা শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। এখন ক'টা হতে পারে? রাত দশটা! গ্রামে রাত্রি তো আগেই নামে। তবে যারা স্টেশন বাজারে সন্ধ্যায় মাছ বিক্রি করতে যায়, তাদের ফিরতে ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়। মালতী ফিরেছে একটু আগে। খেয়ে দেয়ে সবে শুয়েছে। তন্দ্রার ঘোর নেমে এসেছে ওর চোখে। ভৈরব মাঝির দিনও নাই, রাতও নাই। সবই সমান। রাত কেটে যায় তাঁর আধো তন্দ্রায়, কিংবা আধো জাগরণে। এই জীবন যদি খেলার মাঠ হয়, ভৈরব মাঝির খেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে বহুদিন। মাঝি এখন মাঠের বাইরে দাগের এধারে বসে আছে। উঠে চলে গেলেই হয়। কিন্তু তবু বসে আছে। কেন যে সে বসে আছে তা সে নিজেও জানে না। চলে গেলেই বা কি হবে, এ-ব্যাপারে তাঁর কোন মতামত নাই। আছি তো আছি। নাই তো নাই। কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

ও পরেশ! পরেশ! পরেশকে ভৈরব সব সময়ই ডাকে। ডাকতে ডাকতে এমন হয়ে গেছে, নিজের অজান্তে পেটের ভেতর থেকে ডাকটা বেরিয়ে আসে। কি ভাবে

যে বেরিয়ে আসে, তা বুঝতে পারে না। কিন্তু কানে শুনতে পায়।

ও পরেশ! পরেশ! পরেশ বাড়ি আছস?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কি সে ছেলেকে ডাকছে? ভৈরব মাঝি অবাক হয়। চটকা ভেঙে যায়।

পরেশ! ও পরেশ! তন্দ্রার-ঘোরে মালতীর কানেও এ ডাক পৌঁছে যায়।

পরেশ! ঘুমাইয়া পড়ছস!

দরজায় মৃদু টোকা পড়ে।

কে? মালতী ধড়ফড় করে উঠে বসে। কে? কে ডাহে!

পরেশ নাই? বাইরে থেকে ফিসফিস করে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

কেডা আপনে? দাদারে নিয়া মস্করা করেন? এবার মালতী চিৎকার করে বললো।

এবার বাইরের আগন্তুক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সে এবার অনুচ্চকণ্ঠে বললো, ভৈরব জ্যাঠা! জাইগ্যা আসেন তো! আমি গোপাল রাজবংশী। পলাইয়া পলাইয়া আইসি। দরজাডা খোলেন। বাইরে থাকলে বিপদ হইবার পারে।

গোপাল রাজবংশী! মালতী সাঙ্ঘাতিকভাবে কেঁপে উঠলো নামটা শুনে। বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলো মেয়েটা। খানিকক্ষণ চুপচাপ। ভৈরব মাঝি জিজ্ঞেস করল, কী হইসে রে মালতী? কেডা ডাহে?

আজ থেকে ছ'বছর আগে মিসা-র আসামী গোপাল রাজবংশী ধরা পড়েও পুলিস ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। লেভেল ক্রসিং থেকেই ও নাকি চলন্ত ট্রেনের কাঠের সিঁড়ি ধরে নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। দুঃসাহসী এই ছেলেটি তখনই জঙ্গী কৃষকনেতা হয়ে উঠেছিলো। মালতী তখন সদ্য বেড়ে ওঠা এক লাজুকলতা। তখন থেকেই সে গোপাল রাজবংশীর ভক্ত। আজকে সেই গোপাল রাজবংশী ওদেরই ঘরের দরজার ওপারে! কিন্তু এ যদি গোপাল রাজবংশী না হয়! দাদারেও ত ডাইক্যা নিয়া গিয়া মারছিলো! গোপালদা কি জানে না, আমার দাদারে মাইরা ফ্যালাইসে! মালতী কী করবে! মালতী বুঝে উঠতে পারছে না। ততক্ষণে ভৈরব মাঝি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কেডা ডাহে?

জ্যাঠা, আমি গোপাল। তাড়াতাড়ি দরজা খোলেন। কেউ দেইখ্যা ফ্যালাইলে মুশকিল।

ভৈরব মাঝি এতক্ষ[illegible]ছে। গলা চিনতে পেরেছে।

মালতী, জাগস নি?

হ।

দরজা খোল। হাচাই, আমাগো গোপাইল্যা।

মালতী লাফ দিয়ে দরজা খুলে দিলো। সারা মুখ গোঁফ দাড়িতে ভর্তি পাজামা-পাঞ্জাবি পরা গোপাল রাজবংশী ঘরে ঢুকেই দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিলো।

লম্ফডা জ্বালা মালতী।

পরেশ কই জ্যাঠামশয়?

পরেশ নাই বাপ! পরেশরে ক্যারা জানি মাইর‍্যা ফ্যালাইসে। আমার যে কি কষ্ট বাপ! কারে কই। ভৈরব মাঝি এতদিনে আপনজন খুঁজে পেয়েছে।

কন কী! পরেইশ্যারে মাইর‍্যা ফ্যালাইসে। ক্যারা মারলো?

জানি না! মালতী এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো।

গোপাল নির্বাক, হতভম্ব হয়ে গেলো। কি সর্বনাশ! তাজা পোলাডা! মাস তিনেক আগে রাণাঘাট স্টেশনে হঠাৎ করে ওর সঙ্গে দেখা হলো। গ্রামের কথা জানতে চেয়েছিলো সেদিন গোপাল। অরে খুন করলো! আমারে করলে যুক্তি ছিলো। আমি মিসার আসামী। পুলিস ভ্যান থিকা পলাইসি। কিন্তু অয়! রাজনীতির মইধ্যে ত অয় যায় নাই! তবে?

এই তবে-র উত্তর কে দেবে? গোপাল কি কোনদিন জানতে পারবে, সেদিনের রাণাঘাট স্টেশনে গোপালের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই পরেশের কাল হয়েছিলো!

মালতী ততক্ষণে লম্ফ জ্বালিয়েছে। লম্ফের আলোয় সে গোপালদাদাকে দেখছিলো। মালতী ভাবছিলো, গোপালদাদারে ত আর জাউল্যার পোলা মনেই হয় না! এক্কেবারে বাবু হয়য়্যা গ্যাসে। গোপালও দেখলো, মালতী এখন যুবতী। চোখেমুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ। দুঃখ-শোকের নানা অভিজ্ঞতায় সেই বালিকা মালতী আমূল বদলে গেছে। কিন্তু পরেশ! দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে রইল আত্মগোপনে থাকা পোড় খাওয়া এই বামপন্থী যুবক। যে চট্ করে শোকে বিহ্বল হয় না।

তারপর অনেক রাত পর্যন্ত তিন জনে কথা হলো। অনেক কথা। গোপাল এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দু'জনাকে বুঝিয়ে বললো। বললো, দিন পাল্টাইতাসে। এমুন দিন আর থাকবো না। গোপালের কথায় যে যাদু আছে! নইলে বৃদ্ধ, শোকগ্রস্ত ভৈরব মাঝির চোখে ওইরকম আলো খেলে যায়! মালতীর মনের মধ্যে তো আরো আগুন জ্বলে উঠলো। সেই রাতে প্রবল ঝড় উঠলো। চৈত্রশেষের প্রথম কালবৈশাখী। সঙ্গে বৃষ্টি। পাড় ভেঙে পড়ার ঝপাং ঝপাং শব্দ ওরা শুনতে পাচ্ছিলো ঘরে বসেই। ঝড় একটু কমলে দমকা বাতাসের মধ্যেই গোপাল রাজবংশী ভোর হবার আগেই বাইরে বেরিয়ে পড়লো। গোপালের মতো ছেলেরা কোন কিছুকেই ভয় করে না। মৃত্যু চলে ওদের পায়ে পায়ে। ঝোড়ো বাতাস ওদের ফুসফুসে গিয়ে আরো ঝড় তোলে।

নদীতীরের জাউল্যাদের মনেও ঝড় ওঠে।

এর পর থেকেই মালতী ক্রমশ অগ্নিবর্ণা নারীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। সেই আগুনের উত্তাপে ওম পেতে শুরু করে ভাগীরথীর দুই তীরের জেলেরা। কী মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলো গোপাল রাজবংশী? কে জানে! বৃদ্ধ ভৈরব মাঝিরও এখন চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে যায়। —অরা আমার পোলাডারে মারসে। অগ ছাড়ুম না!

এর পরেও গোপাল আরো কয়েকবার গ্রামে এলো। নদীতে জেলে নৌকোগুলোই এখন ওর সুরক্ষা কবচ। গোপাল রাজবংশী রাতে চর সুলতানপুরে আসে। গ্রামের বৃদ্ধ আর যোয়ানদের নিয়ে আলোচনায় বসে। জেলেরা জানতে পারে, দিল্লির সরকার পাল্টে গেছে। এ-রাজ্যেও ভোট হবে বর্ষার শুরুতেই। পরেশ দাস যাদের হাতে মরেছে, এই ভোটেই তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। চর সুলতানপুর, মেদগাছি, মালোপাড়া, মেথিডাঙার মানুষদের সে এভাবেই জাগিয়ে তুলতে থাকে। একদিন বৃন্দাবন মালো জিজ্ঞেস করলো, তুমি ত অ্যাহন গেরামে থাকতে পার?

না জ্যাঠা। আমার মাথায় অ্যাহনো মিসা-র মামলা ঝুলতাসে। আমি আইসি জানলে কংগ্রেস আমারে ছাড়বো না। এহনো পুলিস অগ হাতে। গুলি কইর‍্যা মাইরা দিবো।

তাইলে?

সবুর, জ্যাঠা, সবুর, অ্যাতদিন কুত্তার লাহান পলাইয়া পলাইয়া থাকলাম, শ্যাষকালে কি ভুল করুম? আর তোমাগো যে বানের জলে নামাইয়া দিছি। লগে লগে আমারে থাকতে হইবো না?

হ। হাচা কথাই।

তাইলে! বোঝো!

বৈশাখ মাস চলে এলো। আরো একটা নতুন বছর। গাছে গাছে আমগুলো ক্রমশঃ পুরুষ্টু হয়ে উঠছে। এবার কাঁঠালেরও ফলন ভালো। গ্রামের বাইরে চষা জমির আলে একটা বিরাট জামগাছ আছে। প্রচুর জাম হয়। গ্রামের বাচ্চা ছেলেদের ভিড় লেগে থাকে এই জামগাছের নিচে। নদীপাড়ের কিছু জমিতে সামান্য কিছু তিলের চাষ হয়। সেই তিল তোলা হচ্ছে। পাটের জন্য জমিতে লাঙল পড়বে। বৈশাখের শেষে আউশের বীজ পড়তে লাগলো জমিতে। ততদিনে পাটের বীজ লাগানো হয়ে গেছে।

ভোট আসছে। এ-খবরটা এতদিনে চাউর হয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে। স্টেশনে, হাটে-বাজারে অনুচ্চ আলোচনা। দীর্ঘ রাজনৈতিক গুমোট, রক্তমাখা দিনগুলো পেরিয়ে সবে পরিবেশ সামান্য সুস্থ হয়েছে। কিন্তু এতদিনকার নিরবচ্ছিন্ন আঘাত আর রক্তপাতের

দগদগে ঘা-গুলো দারুণভাবে ফুটে উঠেছে এখন। খবরের কাগজগুলোতে শ্বাসরুদ্ধ অত্যাচার, পুলিসী হত্যাকাণ্ডের কাহিনীগুলো লেখা হচ্ছে। গোপাল রাজবংশীর মারফৎ সে খবর পৌঁছে যাচ্ছে জেলে গ্রামগুলোর ঘরে ঘরে। এই পরিবর্তনের, নতুন খবরের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিলো মালতী, মানিক, সৃষ্টিধর ও ভৈরব মাঝির ওপর। কিছু কাজ করার প্রবণতা এদের মধ্যে বরাবরই ছিলো। এটা ঠিকই, সৃষ্টিধর যতই রাজনৈতিক কাজে নিজেকে যুক্ত করে ফেললো, সাংসারিক ব্যাপারে তার অবহেলা আরো বেড়ে গেলো ততটাই। অঞ্জলি তাই খানিকটা লাগামছাড়া হয়ে গেলো। লক্ষ্মীমণি কতদিক সামলাবে! মায়ের সতর্ক দৃষ্টির ফাঁক-ফোকর দিয়ে অঞ্জলি বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়। ও চাইছিলো একটা আশ্রয়, খুঁটি। যা উঠতি বয়েসের মেয়েরা বাবার কাছেই পায়। বাবার স্নেহের ছায়া ওর খুবই দরকার ছিলো। বিশেষ করে অঞ্জলির মতো মেয়ের। যে মেয়ের হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্য বেশি। ওর শরীর তো নয়! যেন আগুন। অঞ্জলি রাতে বিছানায় ছটফট করে, দাপায়, এক অনাকাঙ্খিত আকৃতিতে। মানিকের কাছে কোন সাড়া না পেয়ে ওর উদ্দাম আকাঙ্খা যেন আরো বেড়ে গেলো।

সেদিন ও ইচ্ছে করেই হাঁটতে হাঁটতে স্কুল মাঠের দিকে গেলো। তখন বিকেল চারটে হবে। দেখলো, মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। সেখানে বিলাস ছিলো না। অঞ্জলি হাঁটতে হাঁটতে উল্টোপথে রওনা দিলো ওদের গ্রামের দিকে। পাকা রাস্তা থেকে ডানদিকে যে রাস্তাটা মুখজ্যেপাড়ার দিকে চলে গেছে, ও দেখলো, বিলাস সেই মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই অঞ্জলির বুকে কাঁপুনি উঠে গেলো। পা আর চলে না। কিন্তু বিলাস অঞ্জলিকে দেখে দৌড়ে এলো।

কোথায় গিয়েছিলে?

অঞ্জলি কোন জবাব দিলো না।

কেমন আছো?

ভালো।

সেদিন আসতে বললাম। এলে না!

এই কথারও কোন জবাব অঞ্জলি দিলো না। আসলে অঞ্জলি নিজেকে সামলাচ্ছিলো। সাঙ্ঘাতিক দোটানায় অঞ্জলি নিজের মনের ভারসাম্য রাখতে পারছিলো না। বিলাসকে দেখলেই ওর এক ধরনের ঘেন্না আসে। আবার নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের যেমন কৌতূহল আর তীব্র আকর্ষণ থাকে, ও সেই আকর্ষণও অনুভব করে।

অঞ্জলি চর সুলতানপুরের দিকে হাঁটতে লাগলো। চুপচাপ। কিন্তু ওর মনের মধ্যে ঝড় বইছিলো। বিলাসও এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে ওর পাশাপাশি হাঁটছিলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে এগিয়ে আসছিলো। ডুবে যাওয়া সূর্যের তির্যক আলো পশ্চিম

আকাশের পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ভেতর দিয়ে মাঝ আকাশে আসতে চাইছিলো। দু'জন একসময় হাঁটতে হাঁটতে পৌছে গেলো নদীর ঘাটে। সেই অশ্বত্থ গাছটাকে ডাইনে রেখে সোজাই চললো অঞ্জলি। বিলাস দু'চারটে কথা বলছিলো।

আমি তোমাকে পছন্দ করি।

অঞ্জলি শিঁউড়ে উঠলো। কথা বললো না। অঞ্জলি এটা লক্ষ্য করেছে, বিলাস ওকে তুমি করে বলছে। মান দিচ্ছে।

তোমার সাথে অনেক কথা আছে অঞ্জলি। তুমি যদি শুনতে চাও, আমি কাল বিকেলে এখানে আসবো।

কি কথা?

অঞ্জলি যখন ওর বড় বড় চোখ দু'টো তুলে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো, একেবারে মেতে গেলো বিলাস।

অনেক কথা অঞ্জলি। অনেক কথা! রাতদিন যে আমি তোমার কথাই ভাবি।

অঞ্জলির নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছিলো। হঠাৎ ওর মনে পড়লো, গোরুটা মাঠে বাঁধা আছে। আমি যাই—বলে অঞ্জলি ছুট লাগালো। বিলাস চেঁচিয়ে বললো, আমি কাল আসবো! অঞ্জলি কোন উত্তর দিলো না।

ভোটের বাজার গরম হয়ে উঠেছে। পোস্টার পড়েছে দেয়ালে দেয়ালে। স্টেশনে, টিকিটঘরে, স্কুলবাড়ির পাঁচিলে। স্কুলমাঠে সেদিন কংগ্রেসের সভা হলো। লরি করে, জিপে করে নানা জায়গা থেকে লোক এসেছিলো। কৌতূহলবশতঃ মানিক একবার গিয়েছিলো মাঠে। স্টেশন বাজার আর বড়বাজারের অনেক মহাজন, আর আড়ৎদাররা ঘোরাঘুরি করছে ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। তাদের ছেলেরা মোটরবাইকের মাথায় তিন রঙা পতাকা লাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটছিলো।

এদিকে গোপাল রাজবংশী আর কৃষকনেতা আব্বাসউদ্দিন গ্রামে গ্রামে গিয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক করছে, সভা করছে। মালতী, মানিক, সৃষ্টিধর দাস—এদের সঙ্গে রাখছে গোপাল। দিল্লিতে কংগ্রেসকে হারিয়ে জনতা সরকার এসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও খুনি আর গুন্ডাদের রাজত্ব শেষ করতে হবে। এতদিন যাঁরা পাড়া থেকে, গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, গোপাল রাজবংশীর মতো সেইসব বামপন্থীরা এভাবেই গোপনে বা প্রকাশ্যে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছে। যাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসের খুনিদের হাতে প্রিয়জনকে হারিয়েছে, ভৈরব দাস অথবা মালতীর মতো বুকের মধ্যে আগুন নিয়ে তাঁরাও গোপনে ভোটের কাজ করছে। বারোই জুন ভোট। তার পাঁচ দিন আগে, অর্থাৎ মহরমের দু'দিন আগে স্টেশন বাজারে একটা দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটলো। যা

গত ক'বছরে ভাবাও যেতো না।

একদিন গ্রামে সভায় দাঁড়িয়ে মালতী দাস দাবি জানিয়েছিলো, আমি নিজেই মাছ ধরুম। নৌকা চালামু। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে তা আর হয়নি। মালতীকে নদীর বুকে নৌকা চালাতে হয়নি। সে মাছবাজারে জেলেদের থেকে মাছ কিনে নিয়ে মাছ বেচছে। শুধু তাই নয়, এই ক'দিনে সে মাছপট্টির ছোটোখাটো মহাজন হয়ে গেছে। যদি দেশে আজ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটতো, তবে মাছপট্টির আড়ৎদাররা এই ছোটলোকের মেয়েটাকে শান্তিতে ব্যবসা করতেই দিতো না। পরিস্থিতি ঘুরে গেছে। তাই কেউ জেলেদের আর ঘাঁটায়নি।

শনিবার। আজ হাটবার। আজকে তাই বাজার জমজমাট। গোরুর গাড়ি থেকে বস্তা বস্তা চাল নামছে আড়তের সামনে। এই চালের একটা বড় অংশ চোরাপথে বাংলাদেশে চলে যাবে। সব্জি বাজারে গ্রাম থেকে বহু সব্জি হাটে নিয়ে এসেছে চাষীরা। মাছের বাজারও সরগরম। বড় দোকানদারের বড় মাছ, ছোট দোকানদারের ছোট মাছ। ইলিশ, চিতল, রুই, পাবদা, তোপসে—এসব মাছের কাছে বাবুদের ভিড়। এদিকে কুচো, ল্যাটা, চিংড়ি, পুঁটি, ভোলা মাছের কাছে ওজনদার লোকেরা আসে না। এখানে গরিবগুর্বোদের আনাগোনা। কুচোকাচা পচা মাছও পড়ে থাকে না। আরো গরিব যাঁরা, তাঁরা খায়। বেচাকেনারও একটা সুরতাল-ছন্দ আছে। একটু লক্ষ্য করলেই সেটা ধরা যায়।

আসুন বাবু! একেবারে কাঁচা সোনা। আহারে! মুক্তোর দানা। সরপুঁটি। কিলো তিরিশ। খেলে একবার, ভুলবেন না আর। ভট্‌চাযিদা! একবার ইদিগে দাদা। লাফাচ্ছে রুই! জ্যান্ত রুই। খেলেই রক্ত। কিলো পঁচিশ টাকা!

মাছবাজারে একটি নারীকণ্ঠও শোনা যাচ্ছে—চৌধুরী মশয়, মালতীর মাছটা অ্যাকবার দেইখ্যা যান। মালতীর ইলশা হইলো গিয়া রুপার দানা। ভিবে দিলেই গইল্যা যাইবো। ইলশা মাছের পাতুরি করবেন! না পোস্ত দিয়া ভাঁপা? আহেন তবে এহানে।

সাতগাছিয়া থেকে আরো দূরে মালতীপুর থেকে সাইকেল চালিয়ে এক ঝাঁকা বাগদা চিংড়ি আর ভোলা মাছ নিয়ে এলো বাঞ্ছারাম মালো। মাছ এনে নামালো মালতী দাসের দোকানের সামনে। বাঞ্ছারাম মাছের ঝাঁকা নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই মালতী টঙটঙে গলায় চিৎকার করলো--

ঝাঁকা আমি নিলাম! বাঞ্ছারামও চায় মাছ মালতীই কিনুক। মালতী অন্যান্য দোকানদারের মতো ওজনে মারে না। দেনাপাওনাও পরিষ্কার। আজ খুব ভোরে বাঞ্ছারাম নৌকো নিয়ে নদীতে গিয়েছিলো। কিন্তু জালে মাছ পড়ছিলো না। অনেক বেলায় এক ঝাঁকা বাগদা পাওয়া গেলো। আর কিছু ভোলা।

আর এক মাছওয়ালা কেষ্ট বিশ্বাস দোকান ছেড়ে উঠে এলো।

বাঞ্ছা, বাগদা কত কইর‍্যা দিবি?

বিক্রি হয়য়্যা গেছে।

কে নিলো?

মালতী নিছে।

কত কইরা বেচলি?

দরদাম হয় নাই।

দরদাম ছাড়া মাছ বেচলি? ক্যান? আমরা কি ফ্যালনা!

মালতী তখন খদ্দেরকে ইলিশ মাছ ওজন করে দিচ্ছিলো। ও ওর দোকান থেকেই চ্যাচালো।

বিশ্বাস মশয়! ওই মাছ কিনছি আমি! ঝামেলা কইরেন না!

মালতীর প্রচ্ছন্ন হুমকিতে কেষ্ট বিশ্বাস দমে গেলো। কেন না, গত ক'মাসে মালতীর তেজের নানা চেহারা দেখা গেছে। কেষ্ট বিশ্বাস এক পা দু'পা করে চলে গেলেও একটু গজরাচ্ছিলো।

পেটাই চেহারা হয়ে গেছে মালতী দাসের। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে ও পুরো নাম বলে, মালতী রানী দাস। মুগুরের মতো চেহারা। ভারী বুক। পেটে বাড়তি মেদ নেই। বনমোরগের মতো কেশর দুলিয়ে হাঁটে। পঞ্চাশ-একশো কিলোর মাছের ঝাঁকা যখন তখন তোলে। নামায়। মাথায় নেয়। কাঁধে নেয়। শাড়ির আঁচল দিয়ে বুক ঢেকে আঁচলের কোনাটুকু কোমরে শক্ত করে গুঁজে নিয়ে দোকানদারি করতে বসে মালতী। হাতে, শাড়িতে, গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধ। খদ্দেরের সঙ্গে হাসি মুখ, মিষ্টি কথা। কিন্তু ফালতু কথা শুনলে মিষ্টি গলা ঝাঁঝালো হয়ে যায়। সেই যে শ্মশানে দাদার চিতার আগুনের লকলকে শিখা থেকে মালতী নিজের বুকের মধ্যিখানটায় যে আগুন জ্বালিয়েছিলো, তা নিয়তই জ্বলছে। মাছপট্টির পুরনো মহাজনরা মালতীর এই উত্থানে ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হচ্ছিলো। বাঞ্ছারামের মাছ পাইকিরি দরে বেশিরভাগ মালতীই কেনে। বাঞ্ছারামের জালে মাছ ওঠে ভালো। ওর পয়া আছে। অন্যান্য মহাজনরা তাই হরবখত ওকে খোঁচা দেয়।

বাঞ্ছারামের মহাজন কে?

মালতী রানী দাস।

কি বাঞ্ছা! তুমি এত মালতীরানীর পেছনে লেগে থাকো কেন হে?

তোমার মতলব তো সুবিধের নয়!

একথা মালতীর কানে গিয়েছিলো। ক্ষেপে গিয়েছিলো মালতী।

কোন হারামির বাচ্চা বাজে কথা কয়! সামনে আইয়্যা কউক! দুরমুশ কইর‍্যা দিমু অ্যাক্কেবারে!

মালতীর এই মূর্তি দেখে আদি রসাত্মক টিটকিরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এমনিতেই।

বাজারে কুলি কামিনদের মদ খাবার ঠেক হলো ডোমপাড়ায়। ওই পাড়াটা বলতে গেলে চোলাই মদের আড়ৎ। স্টেশন রোড আর বাজারের মস্তান, ছিঁচকে চোর, গুন্ডা, ওয়াগন ব্রেকার, আর ফেরেববাজদের নেতা হলো লক্কা ডোমের ছেলে। নাম খানা বেশ জব্বর। রাজকুমার ডোম। ডাক নাম রাজা। আজ কালীপুজো, কাল শেতলাপুজো, পরশু বড়ঠাকুরের পুজো—রোজ চাঁদা তোলার বাহানা লেগেই আছে। পুজোপার্বন লাগলেই ওদের মদমাংস খাবার ধুম পড়ে যায়। রাজা আর তার দলবল ছাপানো বিল নিয়ে দোকানে দোকানে হানা দেয়। কাউকে দশ, কাউকে পঁচিশ, কাউকে একান্ন—চাঁদা লেগেই আছে।

কত ট্যাকা কাটলে হে!

একান্ন ট্যাকা।

শেতলা পুজোয় একান্ন ট্যাকা! অ্যাত দেওয়া যাবেনি বাপু!

শেল্লা পুজোর জন্য বচ্ছরে একবার আসি। পটলবাবু ট্যাকাটা দিতে হবে।

শেতলা পুজো একবার, কালীপুজো একবার, বড় ঠাকুরের পুজো একবার—এ করে তো বছরে ডজন দুয়েক পুজো লেগেই আছে। এত ট্যাকা দিতি পারবো না।

ওসব গজল্লা ছাড়ুন! রাজার এক টিঙটিঙে চেহারার চামচা হম্বিতম্বি জুড়ে দেয়। ব্যবসা তো আপনার রমরমা চলছে দাদা। একশো লিখিনি, আপনার বাপের ভাগ্যি।

বাপ তুলবে না বলছি!

আবে চোপ শালা! দোকান তোড় করে দেবো!

তবে রে!

মার শালাকে।

লাশ ফেলে দেবো।

শালা ভেজাল মাল বেচে।

এভাবেই চিল্লামিল্লি, অশান্তি, মারামারি, দোকান ভাঙচুর হয়। খানিকক্ষণ পরে মোটর বাইকে করে আসে ধানকল মালিকের ছেলে মদনলাল। সে আবার এখানকার যুব কংগ্রেসের নেতা। সে এসে রাজাকে ডেকে ধমকায়। ফের যদি মারামারি করবি, শালা লক-আপে পুরে দেবো। পটলবাবু, চাঁদাটা দিয়ে দিন। ছেলেপুলেরা একটু পুজোপাব্বন করবে। এদের তো একটু দেখতেই হবে! —নরম সুরে এইভাবেই হুমকি দেওয়া হয়। তেলকল, ধানকল মালিকের ছেলেরা, বাজারের আড়ৎদারদের ছেলেরা হাটের দিন

মোটর বাইক নিয়ে এসে চক্কর মারে। রাজার তোলা টাকা ওদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়। রাজার যত রেলা, এই এদের জন্য। হাটের চোলাই মদের ঠেক থেকে এখানকার পুলিসও টাকা নিয়ে যায়। এই ডোমের ছেলে রাজা আর তার ল্যাংবোটরা সেদিন মালতীর মাছের দোকানে একান্ন টাকার একটা বিল কেটে ছুঁড়ে দিলো। মালতী বিলটা ছুঁলোও না।

ও দিদি, বিলটা ল্যান! শেল্লা পুজোর চাঁদা।

বিল্ল ফিল্ল লাগবো না। একটা ট্যাকা দিতাছি মা শীতলার নামে। নিয়া যাও।

কি বলেন দিদি! একান্ন টাকার বিল কেটেছি!

অ্যাকান্ন ট্যাকা!

ইয়েস ডিডি। পেস্টিজ ফাইট। বড় বাজারে টিরিশ হাজার ট্যাকা বাজেট! আমাডের চল্লিশ। গিব রুপিজ ডিডি। মাই ডিয়ার ডিডি।

আরে বাংলায় কথা ক! একলগে অ্যাকান্ন ট্যাহা বাপের জম্মে দ্যাখছস নি! অ্যাকটা ট্যাহা নিয়া ভাগ দেহিনি অ্যাহন!

দিদি, ট্যাকাটা দিতে হবে।

ট্যাকাডা দিতে অবে!—মালতী ভেংচে ওঠে। যা যাঃ। ব্যাচাকিনার সময় দোকানের সামনে থিকা যা অ্যাহন।

গরম দেখাবে না!

তুই কী করবি র‍্যা!

তুমি যদি মেয়েছেলে না হতে, দেখিয়ে দিতাম।

কী, কি কইলি! কার বাবার কয়ডা মাথা আছে দেহি! মালতী চোখ লাল করে উঠে দাঁড়ালো।

ডিডি, ডোন্ট অ্যাংরি। গিব ফিপ্‌টি ওয়ান পিসফুল।

এই ব্যাটায় আবার কি ফ্যাচাং ফ্যাচাং করে!

ওদের একজন মালতীর দোকান থেকে একটা ইলিশ মাছ তুলে নিলো।

ইডাই তোর চাঁদা।

তবে রে! বলে মালতী লাফ দিয়ে দোকান থেকে নেমে ছেলেটার টুঁটি টিপে ধরল।

বাপের জমিদারি পাইসো! মগের মুল্লুক! বটি দিয়া কোপাইয়া মাছবাজারে ফ্যালাইয়া রাখুম! শালা হারামির বাচ্চা!

একটু বড় নেতা যারা, যারা দেশের খবর রাখে, তারা এই বদলানো পরিস্থিতির আঁচ পাচ্ছিলো। কিন্তু ওদের চ্যালারা তো আর সে খবর রাখে না! তাই রাজকুমার ডোম একটা মস্ত বড় ফাউল করে ফেললো।

তবে রে শালী! বলে সে মালতীর চুল টেনে ধরলো। বহু মানুষ এটা দেখলো। কিন্তু কেউ এগলো না। রাজকুমারের রাজত্বে তেমন বুকের পাটাওয়ালা লোক না পাওয়া গেলেও নিরীহ শান্তশিষ্ট বাঞ্ছারাম কিন্তু ফুঁসে উঠলো। অঘটন বলতেই হবে। শেষে কিনা বাঞ্ছারাম! জাউল্যার পোলা বাঞ্ছারামই খেপলো শেষ পর্যন্ত!

মাইয়া মাইনষের গায়ে হাত! হাত ভাইঙ্গা ফ্যালামু! বাঞ্ছারাম দু'হাতে রাজাকে ধরে হাত পাঁচেক দূরে ছুঁড়ে দিলো।

ডোমের পোলাডা আর অ্যাং-ব্যাং-চ্যাঙগুলান মালতীর গায়ে হাত তুলসে। অরা মাইয়া মাইনষের গায়ে হাত তুলসে। কথাটা বোঁ বোঁ করে হাটের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। কথাটা ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে, গলি-ঘুঁপচিতে ঢুকে পড়লো। মানিক ছুটে এলো। সৃষ্টিধর, বৃন্দাবন, গোপেশ্বররা ছুটে এলো। এই কথাটা সারা বাজারের মানুষকে মাছপট্টিতে ছুটিয়ে নিয়ে এলো। রাজা তখন সবে উঠে বসেছে। মানিক ছুটে এসে ওকে সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলো। শুরু হয়ে গেলো মানিকের সঙ্গে রাজার ধস্তাধস্তি। চকিতে রাজা কোমর থেকে ছুরি বের করে মানিকেব কব্জিতে বসিয়ে দিলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। মালতী দৌড়ে এসে রাজার হাত মুচড়ে ধরলো। ছুরিটা হাত থেকে পড়ে গেলো। গোপেশ্বর ততক্ষণে ছুরিটা হাতে তুলে নিয়েছে। রাজার ওপর এদিকে পাবলিকের রাম প্যাঁদানি শুরু হয়ে গেছে। ওর দুই সাকরেদকে বাঞ্ছারাম দুই বগলে চেপ্টে ধরে রেখেছিলো। ওরা চিঁ চিঁ করে বলছে, ছাঁড় ছাঁড়, ছেঁড়ে দে আমাদের। আর ইংরেজি বলা সেই বাবুর দু'চার চড়চাপড় খেয়ে প্যান্টুলুন খুলে যাবার মতো অবস্থা। তার কাঁপুনি এসে গিয়েছে। মালতী ওর সামনে তর্জনি তুলে জোর ধমক দিলো, অ্যাই অ্যাং ব্যাং! চুপ কইরা দাঁড়া! নাইলে তর বাপের নতুন কইরা বিয়া দেখাইয়া দিমু।

ও ডিডি! ও মাই গড! গড়েস কালীর ডিব্যি ডিডি! আই অ্যাম গোয়িং ডিডি। সরি ডিডি।

অ্যাই ব্যাটা! আর চান্দা নিবি?

নো। নো। আই এসকেপ। নেভার কামিং ডিডি। আমাকে ছেড়ে ড্যান। ওরে বাবা! ডেঞ্জারাস! ডিডি অ্যাকেবারে গড়েস কালী।

যা ভাগ!

এতগুলো মানুষের এক ধরনের ভয় আর আত্মরক্ষার ইচ্ছা ক'টা ছেলেকে শয়তান বানিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ওরা তো জানে না, গোপাল রাজবংশী এসে গেছে! ছোটলোক জেলেরা ক্রমশঃ তেতে উঠছে। ঠিকঠাক সময়ে পলতেতে আগুন পড়লেই সেটা

যে জ্বলে উঠবে! মালতী আজ সেই আগুনের কাজ করলো। বাঞ্ছারামের মতো নির্বিরোধী মানুষও অন্যায়কে গুঁড়িয়ে দিলো। মানিক ঝাঁপ দিলো ছুরির মুখে। আর এতদিনকার ভীতু মানুষগুলো প্রবল সাহসী হয়ে উঠলো। অঘটন বৈকি! ততক্ষণে ক্রুদ্ধ জনতা চার মস্তানকে পুলিস ফাঁড়িতে জমা দিয়ে এসেছে। পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা সামলে হাটের দোকানদাররা তাদের মালপত্র নিয়ে ফের বেচাকেনায় বসেছিলো। কিন্তু বেচাকেনা কমই হলো। গন্ডগোল দেখে পাইকাররা আগেই স্টেশন প্লাটফর্মে চলে গিয়েছিলো। এর মধ্যে একটা ডাউন ট্রেন এসে পড়ায় অনেকেই সেটায় করে চলে গেছে। ওরা সব অন্য জায়গার মানুষ। বিদেশ বিঁভুইয়ে মস্তান গুন্ডাদের সঙ্গে ওরা তাই ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

ওদিকে শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল হলের কমপাউন্ডার দীনেশ মানিকের হাত ওয়াশ করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিলো। ডাক্তারখানায় একটা কাঠের টুলে মালতী বসে আছে। সঙ্গে আরো কয়েকজন দোকানদার। মেডিকেটেড তুলো দিয়ে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে পেশাদারি দক্ষতায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেললো দীনেশ।

হয়য়্যা গ্যাছে?

আরে দাঁড়াও! একটা টেডভ্যাক ইঞ্জেকশন দিয়ে দি! সেপ্‌টিক হলে আরেক কীর্ত্তি হবে।

আবার ইঞ্জিশন?

হ্যাঁ হ্যাঁ! ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়াই ভালো।

ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর মালতী কাউন্টারে চলে এসেছে।

আর কি ওষুধ লাগবো? কয় পয়সা অইলো?

আঠাশ টাকা চার আনা।

মালতী ওর কোমরে বাঁধা টাকার থলিটা বের করলো। মানিক সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বললো, তুই ট্যাহা দিবি ক্যান? আমি দিতাছি।

চুপ কর দেহি। আমার লেইগ্যা মারামারি কইর‍্যা মর। আর আমারে হগগলে দোষী করুক! অত্ত সোজা, না!

না, না! পয়সা তুই দিবি না। মানিকও কোমর থেকে পয়সার থলিটা বের করে। মালতী ওর হাত চেপে ধরে। দু'জনের মধ্যে কে ওষুধের টাকা দেবে তাই নিয়ে তর্ক বেঁধে যায়। শেষ পর্যন্ত ডিসপেনসারির মালিক বললো, কারুর থেকেই আমি পয়সা নেবো না!

গ্রামে গ্রামে রটি গেলো এই বার্তা, হাটে দুরমুশ হয়ে গেছে মস্তানবাহিনী। গত দু'বছরে যাদে টিকি ছোঁয়া যেতো না। তারা কাত হয়ে গেছে। সেদিন থেকে হিরো বনে গেলো মালতী, বাঞ্ছারাম আর মানিক।

জেলেদের মধ্যে যখন জয়ের আনন্দ, শুধু ঘুম নেই অঞ্জলির চোখে। —মানিকদারে যে আমি চাই। মানিকদা আমার কথা বুঝলোই না। মানিকদার কত নাম হয়য়্যা গেলো। মানিক আর মালতীর নামটা একবারে উঠলেই অঞ্জলি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ও ক্রমশঃ আরো মরীয়া হয়ে উঠলো। ও মানসিক যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় গোপাল রাজবংশী এলো। হাটের সব ঘটনা শুনলো। ওর কপালে চিন্তার ছাপ। বিধানসভা ভোটের আর চারদিন বাকি। আজকের ঘটনা ওরা মুখ বুজে মেনে নেবে না। দাঁত বসাবেই। গোপাল গ্রামের সবাইকে নিয়ে সেই রাতেই আলোচনায় বসলো। গতকালই বাড়ি বাড়ি ভোটার স্লিপ দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো। গোপাল বুঝিয়ে বললো, —মাথা ঠাণ্ডা রাখতে অইবো। অরা আমাগো ঠুকরাইতে আইবোই। আমরা কায়দা করুম। —কী কায়দা? অবস্থা বুইঝ্যাই ব্যবস্থা করতে অইবো।

দশ

'প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া ওঠে না, অপকার গণনা করে না, অধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে; সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে। প্রেম কখনও শেষ হয় না।'

—করিন্থিয়, বাইবেল

মানিক যেদিন খুন হয়েছিলো, সেদিনই প্রথম রেবতীস্যারকে রাস্তায় নামতে দেখেছিলো বোধিসত্ত্ব। সেদিন রেবতীস্যার যতটা সক্রিয় ছিলেন, সজল কিংবা অন্যান্যরা ততটা নয়। বোধিসত্ত্ব চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করছিলো, সেদিনকার ভিড়ে সজলের বয়সী আর যারা রেবতীস্যারের পাশে বা কাছাকাছি ছিলো কিছুটা নিশ্চুপ, আজ গঙ্গার ধারের ঝুপড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরে তাদেরই দেখা যাচ্ছে। তবে দু'টো ঘটনা ঘটে যাবার পরে এদের কাজকর্মের গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটেছে। এইসব ছেলেগুলো আজকে আর নিজেদের আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে না। বরং ঝুপড়িবাসী অসহায় মানুষগুলোকে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।

এই গুণগত পরিবর্তনের কারণটা বুঝতে বোধিসত্ত্বর মতো বুদ্ধিমান ছেলের অসুবিধে হয় নি। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়ে গেছে গত দু'বছরের মধ্যেই। গত ষোলই মার্চের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেস দল ক্ষমতা হারাবার পর থেকেই কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় মস্তানদের দাপট কমতে শুরু করেছে। যে সব মানুষ এতদিন মুখ বুজে ছিলো, তাঁরা মুখ না খুললেও সরকার পরিবর্তনে তাঁদের আনন্দ চেপে রাখছিলো না। একুশে মার্চ জরুরী অবস্থা উঠে গেলো দেশ থেকে। চব্বিশে মার্চ দেশে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় এলো।

বোধিসত্ত্ব বুঝতেও পারছিলো, দেশজোড়া এই পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রেবতীস্যার ও সজলদের রাজনৈতিক কাজকর্ম আর ততটা গোপন থাকছে না। তবে ওঁরা যে সতর্কভাবেই পা ফেলছে, কতগুলো ঘটনায় তা বোধিসত্ত্বর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো। সামাজিক কাজকর্মের আড়ালেই রেবতীবাবুরা যে তাঁদের রাজনৈতিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটাও বোঝা গেলো একদিন।

সেদিন বিকেলে বোধিসত্ত্ব একটু কফি হাউসে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

সেন্ট্রাল এভিনিউমুখি হাঁটছিলো। একটা ঝোলা ব্যাগ ছিলো ওঁর কাঁধে। জগৎ মুখার্জি পার্কের কাছে কে একজন পেছন থেকে ওঁর ব্যাগ ধরে টান দিলো। বোধিসত্ত্ব পেছন ফিরে দেখলো সজল হাসছে। সঙ্গে আরো কয়েকটি ছেলে।

কি রে কোথায় যাচ্ছিস?

একটু কফি হাউসে যাবো।

যাবিই! না গেলে কি খুব অসুবিধে হবে?

না, তা কেন! তবে মাঝে মাঝে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারি। এই আর কি!

তোর লেখক, কবি, সম্পাদক বন্ধুদের সঙ্গে তো! তা আজ নাই বা গেলি!

কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

কাজ তেমন কিছু নয়। আড্ডাই মারবো। চল না আমাদের সঙ্গে! তোর আড্ডার স্বাদ না হয় একটু বদলালো।

বোধিসত্ত্ব হাসলো। বললো, আড্ডা আড্ডাই। তা যেমনই হোক। স্বাদের ভ্যারাইটি খোঁজাই আমার নেশা। না হলে আর গ্রামে-গঞ্জে, মেলায়-টেলায় যাই কেন?

ব্যস! তা হলে তো আর কোন কথাই নেই। চল আমাদের সঙ্গে।

দু'দিন ধরে বোধিসত্ত্বর মনটা বড্ড বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিছুতেই কোনো কিছু ভালো লাগছিলো না। কোনো একটা ঘটনা ঘটলে বোধিসত্ত্বর মনে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। চট্ করে সেই ব্যাপারটা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। গঙ্গার পাড়ে ঝুপড়ির ঘটনা তার মনের মধ্যে তেমনি প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলো।

হাজারো চিন্তায় বোধিসত্ত্ব যখন ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, তখন সে কোন বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। মনের মধ্যে দোলাচল শুরু হয়ে যায়। এই মুহূর্তে সজলের কথা শুনে সে হ্যাঁ বা না কোনো উত্তরই দিলো না। আসলে বোধিসত্ত্ব এখন কোনরকম সিদ্ধান্তে আসতে চাইছিলো না। সে রকম কোনো চেষ্টাও ছিলো না তার মনে। কিন্তু সে সজলদের সঙ্গেই হাঁটতে শুরু করে দিলো।

সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে বি কে পাল এভিনিউ আর গ্রে স্ট্রিট ছুঁয়ে ওরা শোভাবাজার স্ট্রিট ধরে মিনিট দশেকের মধ্যেই গঙ্গার পাড়ে আহিরীটোলা ঘাটের কাছে চলে এলো। গঙ্গার পাড়ে রেললাইনের পাশে পুরনো আমলের রঙ ওঠা বাড়িগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট বিরাট বাড়িগুলোর ভেতরে কোথাও সিমেন্ট বা প্লাস্টিকের গোডাউন করা হয়েছে। কোথাও রয়েছে হোসিয়ারি কারখানা, প্লাস্টিকের খেলনা, স্নো-পাউডারের কৌটো তৈরির কারখানা। সুতো, ইলেকট্রিক তার, চুন-বালির গোডাউনও রয়েছে। এসবের ভেতর একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো ওরা। আধো অন্ধকার।

অনেকটা দূরত্বে একটা করে একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। সেই আলো গলির পুরোটা জায়গায় পৌঁছোচ্ছে না।

বোধিসত্ত্ব কোনদিন এ-সব গোডাউন এলাকার ভেতরে ঢোকেনি। সজল সেটা বুঝতে পেরে বললো, কিরে বুধ, এ-সব জায়গায় তো কোনদিন আসিসনি!

হুঁ। কিছুই এখনো দেখা হয়ে উঠলো না।

গলিটা শেষ হয়েই একটা বেশ বড়সড় বস্তি এলাকা। চায়ের দোকান, তেলেভাজার দোকান, পানবিড়ির দোকান, মুদি দোকান, লন্ড্রী, হৈ-হৈ কাণ্ড। লোকজন-বাচ্চাকাচ্চার চেঁচামেচি, কর্পোরেশনের জলের কলে বালতি-কলসী নিয়ে বৌ-মেয়েদের লাইন—হঠাৎই এ-সবের মুখে এসে পড়লো ওরা।

গলির ভেতর যত অন্ধকার লাগছিলো, এখানে ততটা নয় মোটেই। সবে বিকেল গড়িয়ে দিন সন্ধের পথে হাঁটা শুরু করেছে। বস্তির মুখে চায়ের দোকানে জনা সাতেক ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলো। সজলকে দেখে তারা হই-হই করে উঠলো।

এই তো সজলদা এসে গেছে।

কেন! কি হলো?

মাস্টারমশাই খুঁজছিলেন। সবাইকে নিয়ে সজল এবার সামনের গলি ধরে বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়লো। বস্তির গলি ধরে যেতে যেতে প্রায় প্রত্যেক ঘরের লোকজনের সঙ্গেই সজল কথা বলছিলো।

কি মাসিমা, কি করছেন? স্বপন মাঠ থেকে ফিরেছে?

না বাবা, আসেনি এখনো।

সজল বোধিসত্ত্বকে বললো, বুঝলি বুধ, মাসিমার মেজো ছেলে স্বপন ফুটবলটা ভালো খেলে। ওকে একটা ফুটবল কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দিয়েছি আমরা।

আরে পান্নাকাকু! চললেন কোথায়? মিটিং তো এক্ষুনি শুরু হবে।

আসছি ভাই। ঘরের জন্য একটু দোকান-সদাই করতে হবে।

কি বাবা সজল! ঝুপড়ির সেই মেয়েটার খবর কি? যারে হাসপাতালে ভর্তি কল্লে?—একটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজন মাঝবয়সী মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

ভালোই আছে কাকিমা। সপ্তাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

বস্তির প্রত্যেক ঘরের কেউ না কেউ সজলের সঙ্গে কথা বলছিলো। বোধিসত্ত্ব বুঝতেই পারছিলো, সজলদের সঙ্গে এইসব বস্তিবাসী মানুষের গভীর সম্পর্ক একদিনে গড়ে ওঠেনি। ভেতরে ভেতরে তা দানা বেঁধেছে অনেকদিন ধরে।

বস্তি শেষ হয়ে একটা ছোট রাস্তা পেরিয়ে কর্পোরেশনের স্কুল। স্কুলের সামনে বেশ কিছু মানুষের জটলা। স্কুল গেটের সামনে 'নাগরিক কমিটি'র একটা ব্যানার

লাগানো।

ছেলেগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। সজল বোধিসত্ত্বকে নিয়ে স্কুল চত্বরের ভেতরে ঢুকলো। চত্বরে ত্রিপল পেতে লোকজনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাদাগাদি ভিড় করে বহু লোক বসে আছে। পেছন দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকেই। রেবতীস্যার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—

'রাজনৈতিক দলে অ্যান্টিসোশ্যাল ঢোকালে তার ভয়ঙ্কর ফলাফল পড়ে সমাজের ওপর। তার ছবি তো আমরা সত্তর সাল থেকেই দেখছি। ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ঘা লাগলে ওরা বিবেকের তোয়াক্কা করে না। আমরা দেখেছি, মানিকের মতো বাচ্চা ছেলেকে ওরা নির্মমভাবে খুন করেছে! কোনো দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যদি উচ্ছৃঙ্খল, হঠকারী, যুক্তিহীন উগ্রতা, হিংস্র, নির্বোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ থাকে, শাসকশ্রেণী তার পুরো সুযোগ নেবেই। বিপ্লবের জন্য যে বোমা-বন্দুকের ব্যবহার হবার কথা, তা যখন সমাজবিরোধীদের হাতে পড়ে, সে তো যত্রতত্র পড়ে থাকবেই। আর তাতে মারা পড়বে গরিব বস্তিবাসী, ঝুপড়িবাসী মানুষ আর তাঁদেরই বাচ্চারা। এমনই ঘটনা গত পরশুদিন ঘটেছে। দু'টি বাচ্চা ছেলে মারা গেছে। একটি মেয়ে বড় রকমের জখম হয়েছে। এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লবের জন্য তৈরি বোমা যত্রতত্র মুড়ি-মুড়কির মতো পড়ে থাকছে।'

একটু থেমে রেবতীস্যার ফের বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, এবার আমি কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিই। গত পরশুদিন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় যে পরিবারগুলো তাঁদের শিশুদের হারিয়েছে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমরা তাঁদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে জনগণের কাছে হাজির হয়েছিলাম। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও জামা-কাপড়, বেবি ফুড, চালডালআটা যা জোগাড় করতে পেরেছে আমাদের ছেলেরা, এই সভা থেকেই আমরা সেগুলো তাঁদের দিয়ে দেবো।

তখন সজল মাইক্রোফোনের সামনে এগিয়ে গেলো। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে লিস্ট ধরে কতগুলো নাম পড়ে বললো, যাদের নাম ডাকা হলো, তাঁরা একটু কাছে চলে আসবেন।

বোধিসত্ত্ব এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এবার তার নজরে পড়েছে। রেবতীস্যার যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তার পেছনেই সংগ্রহ করা জিনিসপত্র সাজানো ছিলো। সজলের সঙ্গের ছেলেগুলো সব ওখানটায় চলে গেছে। ওই তো থাকোমণি! ওই মেয়েটা বোমা বিস্ফোরণের দিন খুব খাটছিলো। চাল-ডাল তুলে খিচুড়ি রেঁধে সকলকে খাইয়েছিলো।

আধঘণ্টার মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত বারোটি পরিবারকে টাকা আর ত্রাণসামগ্রী দিয়ে দেবার পর সভা শেষ হলো। রেবতীস্যার বোধিসত্ত্বকে দেখে কাছে ডাকলেন।—বুধ, এসেছো! খুব ভালো লাগলো তুমি আসাতে।

আপনাদের এ-সব আয়োজন তো দারুণ ব্যাপার! আমি তো ভাবতেই পারছি না, এটুকু সময়ের মধ্যে এতকিছু করে ফেলেছেন।

সভা শেষ হয়ে যাওয়ায় স্কুল চত্বর ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। এরই মধ্যে দু'টো ছেলে এসে হাজির।

স্যার!

কি হলো?

বাচ্চা দু'টোর লাশ পোস্টমর্টেম হয়ে পাড়ায় এসেছে।

তোরা ওখান থেকে শ্মশানে নিয়ে যা। আমি খানিকক্ষণের মধ্যেই চলে যাব।

ছেলেদু'টো চলে গেলো। রেবতীবাবু বললেন, চলো বুধ। সজল, চলো।

আবার সেই বস্তি। বস্তি পেরিয়ে এবার ওরা অন্য রাস্তা ধরলো। সরু গলি। তবে তত সরু নয়। সেটা পেরোতেই গঙ্গাপারের খোলা আকাশ।

প্রবহমান নদী ডানপাশে। বাঁ দিকে কংক্রীটের কলকাতা। কিছুটা নির্জন এই রাস্তা ধরে রেবতীবাবু, সজল আর বোধিসত্ত্ব নিমতলা শ্মশানের দিকে যাচ্ছিলো। গত বেশ কয়েক বছরের ভয়ঙ্কর খুনখারাপির দিনগুলোতে গঙ্গার পাড়ে হাঁটাচলাই দায় হয়ে গিয়েছিলো। বোমা ছোঁড়াছুড়ি, মেয়েদের গলার হার, কানের দুল ছিনতাই, ট্রাকের ড্রাইভারকে মেরেধরে টাকা আদায় করা, এ-সব ছিলো, রোজকার ঘটনা। কিন্তু দিল্লিতে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা এখানকার গুন্ডা বদমাইসগুলো একটু থমকে দাঁড়িয়েছে।

তিনজনই চুপচাপ হাঁটছিলো। নদীও নীরবে বয়ে যাচ্ছিলো। নীরবতার ভাষা কথা বলে চলছিলো তিনজনের মধ্যে। তিন জনের চিন্তায় হয়তো ফারাক ছিলো অনেক, কিন্তু তা ছিলো একই সূত্রে গাঁথা। ওপারে হাওড়ার সালকিয়াতে কারখানাগুলোর চিমনি থেকে সাদা-কালো ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছিলো মেঘের রাজ্যে। গঙ্গার দু'পারেই বিদ্যুতের আলোর ছড়াছড়ি। মাথার ওপরে দেখা যাচ্ছে দ্বাদশীর চাঁদ। এই রকম সময়ে হয়তো প্রকৃতিই শুধু কথা বলে। অনুভূতিশীল মানুষের কাজ তা শুধুই উপলব্ধি করা। মনের গহীনেই তাঁর যত কথার অনুরণন।

হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা নিমতলা শ্মশানের কাছে চলে এসেছে। শান বাঁধানো পাড়ে বট-অশ্বত্থ গাছের নিচে পাথর অথবা শিবলিঙ্গ বসিয়ে গাদাগুচ্ছ ঠাকুর দেবতার ভিড়। এ-সব ছাপিয়ে বোধিসত্ত্বর চোখ চলে যাচ্ছিলো নদীর জলে। ছোট ছোট ঢেউয়ের

মাথায় দ্বাদশীর লক্ষ লক্ষ চাঁদের খেলা। ওপারের ঘরবাড়ি-রাস্তা-কারখানার আলোর ছায়া পড়েছে গঙ্গায়। এইসব দেখতে দেখতে বোধিসত্ত্বর মন বহুদূরে চলে যাচ্ছিলো। রেবতীবাবুর ডাকে তাঁর সম্বিৎ ফিরলো।

বুধ, কি ভাবছো? এই তো এসে গেছি। ওই তো সব দাঁড়িয়ে আছে।

মাস্টারমশাই এসে গেছেন, মাস্টারমশাই এসে গেছেন- --বলে দু'একজন এগিয়ে এলো।

কই গো, আর সব কোথায়?

এই তো মাস্টারমশাই। আসুন! এদিক দিয়ে। চিতা সাজানো হয়ে গেছে!

রেবতীস্যারের পেছন পেছন সজল আর বোধিসত্ত্ব শ্মশানের ভেতরে ঢুকলো। বহু মানুষ এসেছে। বাচ্চাবুড়ো, বালিকা বৃদ্ধ, বাচ্চা কোলে মা বৌ—শ্মশান লোকে লোকারণ্য। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো তিনজন মহিলা।

রেবতীবাবু, সজল, বোধিসত্ত্ব, গোবিন্দ, থাকোমণি—এমন আরো অনেকে, বস্তিবাসী, ঝুপড়িবাসী বহু নাবীপুরুষ ছিন্নবিচ্ছিন্ন দু'টি শিশুদেহের সাজানো চিতার সামনে দাঁড়িয়ে। শ্মশান পুরোহিতের পারলৌকিক আচারের কাজ শেষ।

আগুন জ্বলে উঠলো চিতায়। মেয়েরা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। রেবতীস্যারের চোয়াল কঠিন। বোধিসত্ত্ব দেখছিলো, চোখ বন্ধ করে তাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছিলো তাঁর গাল বেয়ে।

উনি নিজেকে সামলাচ্ছিলেন। উনি তাঁর রাগ উসকে নিচ্ছিলেন, সংহত করছিলেন তাঁর ক্ষুব্ধ অহংকে।.........দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে এবার চিতার কাঠে।

ওরে আমার সোনা রে! এভাবে তোরে আগুনে পুড়িয়ে দিলো রে! কি দোষ করেছিলি রে তুই! কেন তোকে মরতে হলো রে বাবা!

কান্না আর অশ্রু বাধা মানতে চায় না। বোধিসত্ত্বর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা। সজল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। থাকোমণি সন্তানহারা দুই মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে আকুল।

চিতার দাউ দাউ আগুন সবগুলো মানুষের বুকের মধ্যে তাপ ছড়িয়ে দিতে দিতে আকাশে উঠে যাচ্ছিলো। দু'টো চিতার আগুনের শিখাগুলো দাপাদাপি করছিলো বোধিসত্ত্বর চোখের সামনে। তাঁর সামনে থেকে মুছে যাচ্ছিলো সব কিছু। বহু দূরে চলে যাচ্ছিলো রেবতী স্যার, থাকোমণি, সজল, আর কয়েকশো দুঃখী শোকমগ্ন অসহায় মানুষ। তাঁর চোখের সামনে সকলকে আগুন---যে আগুন খেয়ে নিচ্ছিলো সমস্ত সময়কে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী তাঁর নিজের অগ্নিময় প্রান্তরের বুকে আত্মীয়পরিজন সমাজ সংসারবিহীন একা দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, একেবারে একা।

'...আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী, আমি যে কখন আমার আমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবার কাছ থেকে ক্রোশ ক্রোশ দূরত্বে চলে যাই, তা আমি নিজেই জানি না। আমি আকাশে উড়ে যাই, সমুদ্রতলে নেমে যাই, গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলি। আমি ঠিক তখনই একা হয়ে যাই। সেই একা আমি কি চায় তা কি আমি সবসময় বুঝতে পারি? পারি না। তাই উদাস হয়ে বসে থাকি, অথবা হাঁটতে থাকি সময়ের পাহাড় ডিঙিয়ে।

চলমান সময় থেকে হারিয়ে গিয়ে আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী অসীম শূন্যতায় ঝাঁপ দিলাম। এই খাঁ-খাঁ শূন্যতায় আমার কেবলই মনে হয়, আমি কে? এই প্রশ্ন আমার মনে উঁকিঝুঁকি মারছে সেই বালক বয়স থেকে। আজও তার রেশ চলেছে।

আমার জন্মের সময় থেকেই আমাব মৃত্যুর দিনক্ষণ ঠিক হয়ে আছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি দণ্ড, পল, প্রহর পার হয়, আর আমার মৃত্যুর দিনটি এগিয়ে আসতে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার অর্থ তো বেঁচে থাকার বয়স কমে যাওয়া। আমি সেই মৃত্যুর দিনটির অপেক্ষা করে আছি, সেদিন হয়তো আমার আজন্মলালিত জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি পেয়ে যাবো—আমি কে? আমি এলাম কোথা থেকে? যাবই বা কোথায়?

...........এ-সবের মধ্যেও আমার অন্তর্দাহ থেমে নেই। সমাজ সংসার আর এই চলমান পৃথিবী আমাকে ব্যস্ত করে রাখে, মানিকের মৃত্যু. রেবতীস্যারের কথা, সজলের নীরব প্রতিজ্ঞা, দীপুর, আগুনঝরা আবেগ, পিনাকীর পাগল করে দেওয়া মৃত্যুহীন প্রাণ—এসব আমি ভুলি কি করে?

আমি তো অহরহ দেখতেই পাচ্ছি সেই মানুষগুলোকে, যাঁরা সত্যিই অসহায়. মানুষের প্রাপ্য অধিকার তাঁরা পায়নি। বস্তিতে অথবা ঝুপড়িতে প্রায় পশুর মতো তাঁদের জীবনযাপন। তাঁদের নিরপরাধ শিশুরা এভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে অকালমৃত্যুতে ঢলে পড়ে। ওই যে কচি কচি হাত-পা গুলো চিতার আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে চিরতরে, সেইসব শিশুসন্তানের কথা আমার মনের দখল নিয়ে নেয়। আমি তাদের ভুলতে পারি না।

শিশুসন্তানের কথায় ফের পৌলমী, তুমি চলে এলে অমার সমস্ত আকাশ জুড়ে।

...পৌলমী, তোমার চিঠি পেয়েছি। প্রতিবারের চিঠির থেকে এবারে তোমার চিঠিব ভাষা আলাদা। আমি বুঝতে পারছি পৌলমী, আমি তোমার ঝকঝকে সুন্দর মুখ দেখতে পাচ্ছি। তোমার বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছে। তোমাকে যদি আমি সুখী করতে পারি, সে যে আমার কত সুখ, কত আনন্দ, তা তোমাকে কেমন করে বোঝাবো! হ্যাঁ. তুমি তো বলোই, তোমাকে আমার কিছু বোঝানোর দরকার নেই। আমার মন নাকি তুমি পড়ে ফেলেছো। তা হলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তোমার হাসিমুখ দেখলে আমি কত খুশি হই।

...হ্যাঁ, তুমি সন্তানের কথা বলেছো। তুমি যা লিখেছো, আমি একবার, দু'বার, তিনবার পড়লাম। চমকে দিয়েছো তুমি আমাকে। তুমি নাকি মা হতে চলেছো! তারপর

যা লিখেছো, তা পড়তে গিয়ে আমার চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। অক্ষরগুলো সব জড়িয়ে যাচ্ছে। কি লিখেছো তুমি? কি বলছো তুমি!.........

পৌলমী, তুমি আমার মনের সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছো। সেই সমস্তের মধ্যে রয়েছে স্বপ্ন আর বাস্তবের সাগরসঙ্গম। সেখানে আমি বারে বারে ডুব দিই। সেই অবগাহনে কলুষহীন এই প্রেমের জন্ম। তাই তুমি কথা বললে আমার সমস্ত আকাশ গান গেয়ে ওঠে। যে আকাশে রয়েছে অর্ধেক স্বপ্ন আর অর্ধেক জীবন। কিন্তু আজ চিঠিতে যে খবর তুমি আমায় দিয়েছো, সত্যি কথা বলতে কি, তা মেনে নেবার সাহস আমার নেই। কিন্তু তোমার কথা আমি তো অবিশ্বাস করতে পারি না। পৌলমী, তুমি আমার কাছে বিশ্বস্ততার শেষ কথা। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। সমস্ত দ্বিধার

গণ্ডী পেরিয়ে তোমাকে আমি ভালোবাসি—এ-কথা বলতে আমার আজ কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। সমাজ-সংসারের বেড়া ভেঙে আর মনের যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে পুড়তেই একদিন নিখাদ সোনার মতো এমন ভালোবাসার জন্ম হলো।'....

তখনো চিতা জ্বলছিলো। কেঁপে কেঁপে আকাশে উঠে যাওয়া চিতার আগুনে লাল হয়ে উঠেছিলো এত মানুষের মুখ। মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেওয়া যায় যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু এ-মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না। দুই আপাপবিদ্ধ শিশুর মৃত্যু এতগুলো মানুষকে বোবা করে দিয়েছে। চোখের আগুন চিতার আগুনের সঙ্গে মিশে গেছে। মেয়েরা তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

ছোট ছোট শরীর দু'টো ছাই হয়ে গেছে বোধহয় বহুক্ষণ আগেই। তবুও চিতা জ্বলছিলো মানুষগুলোর মনের আগুনকে উসকে দেবার জন্যই। আরো রাতের দিকে যাচ্ছিলো সময়। নদী বয়ে যাচ্ছিলো একই ভাবে। বোধিসত্ত্ব ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে নদীর ঘাটের দিকে পা বাড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে দেখলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাধি মন্দির। হ্যাঁ, বিশ্বকবির চিতাভস্ম তো রয়েছে এই নিমতলা শ্মশানঘাটের মাটির নিচেই।

বোধিসত্ত্ব সমাধি মন্দিরের চাতালে উঠে এলো। কবির সমাধিমন্দিরের মুখোমুখি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তাঁর মাথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর চিন্তার পর্দায় হাজির হচ্ছিলো টুকরো টুকরো ছবি। সে-সব ছবি ভেসে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার চলে আসছে।...রবীন্দ্র জয়ন্তীতে মঞ্চে মানিক বসুর কবিতা আবৃত্তি ....মানিকের রক্তাক্ত মৃতদেহে ...পিনাকীর উজ্জ্বল মুখ ...পিনাকীর রিভলবার হাতে ছুটে যাওয়া ...সাগরদ্বীপে লালপেড়ে শাড়ি, কপালে সিঁদুর পৌলমী ...রেবতী মাস্টারমশাইয়ের কথা ...দীপুর অভিমানী চোখ ...সজলের আত্মবিশ্বাসী চাহনি ...ঝুপড়ির পাশে দু'টি শিশুর রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন শরীর ...শ্মশান ...চিতার আগুন ...পৌলমীর সমর্পিত শরীর ...সুখস্মৃতি ...যন্ত্রণা

...আর একটি অনাগত শিশুর মুখ ...বোধিসত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সমাধিমন্দিরের দিকে নিবিষ্ট তাকিয়ে তখনো। বোধিসত্ত্ব মনে মনে উচ্চারণ করে; 'কিশোর মানিক বসুর কবিঠাকুর, আর আমার' রবিঠাকুর, আমার কলমে তোমার আঙুল ছুঁয়ে রেখো। এঁদের নিয়ে জীবনকাব্য যেন লিখতে পারি।'

সস্নেহ একটা হাতের ছোঁয়া এসে পড়লো বোধিসত্ত্বর পিঠে। বোধিসত্ত্ব ফিরে তাকালো। পেছনে রেবতী মাস্টারমশাই। সজলরাও দাঁড়িয়ে আছে।

বুধ, সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি রওনা দিয়েছে। চলো, বাড়ির দিকে যাওয়া যাক।

চলুন।

রাতে বাড়ি ফিরে স্নান করে নিলো বোধিসত্ত্ব। খেয়ে দেয়ে নিজের শোবার ঘরে গেলো। ও জানে, আজকে কিছুতেই ঘুম আসবে না। টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে তাই সে চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে রইলো। শুধুমাত্র টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছিলো রাত্রির কলকাতা। অনেকক্ষণ বাদে সে ড্রয়ার খুলে বের করলো আজ সকালে পাওয়া পৌলমীর চিঠিটা।

চিঠির প্রথম অংশটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় এসে তাঁর চোখ থেমে গেলো। সকাল থেকে বারবার সে এই জায়গাটা পড়েছে। বারবার।

'...বুধ, সেই যে তুমি আমার কাছে এলে, সে দিনটার কথা আমি তো আর ভুলতে পারি না! সে আমার জীবনের অপূর্ব সুখের কাহিনী। আমার স্বপ্নের রাজপুত্র হয়ে তুমি পঙ্খীরাজ ঘোড়া ছুটিয়েছিলে আমার অন্ধকার ঘুমের দেশে। অন্ধকার ঘুচে গিয়েছিলো, লক্ষ আলোর ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছিলো আমার মনে, আমার বুকের মধ্যিখানটায়। আমি আর কিছু চাই না বুধ, আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। সুখের সমুদ্রে ডুব দিয়ে তোমাকে আমি খুঁজে নিয়েছি। তোমার চিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমাব শরীর। বুধ, আমি মা হতে চলেছি। আমার সেই মা হওয়া তোমারই জন্য। এখন আমি প্রতিদিন দুঃখ সইতে পারবো ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। আমি রইলাম তোমার কাছে। তোমার কলম যাদুকাঠি হয়ে জীবনের মহাকাব্য রচনা করুক।—ইতি তোমারই পৌলমী।'

বোধিসত্ত্বর চোখ স্থির হয়ে আছে চিঠির ওপর। সে চিঠির প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি বর্ণ থেকে যেন পৌলমীর কথাকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে চাইছে। বহু-বহুক্ষণ সেই চিঠি সামনে নিয়ে বসে রইলো বোধিসত্ত্ব।

রাত্রির প্রহর পার হয়ে যাচ্ছিলো। ঢং-ঢং করে দু'টো বাজলো। বোধিসত্ত্ব চিঠিটা ভাঁজ করে পাশেই রেখে দিলো। লেখার প্যাডটা টেনে নিয়ে সে এবার লিখতে শুরু করলো।

এগারো

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধবল গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ।'

— *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত, শল্যপর্ব*

উনিশশো সাতাত্তর সালের নয়ই জুন। বিধানসভার ভোট হতে আর মাঝখানে মাত্র দু'দিন। সকাল থেকেই থমথমে পরিবেশ। স্টেশন বাজারে খবর এসে গেছে, সেদিন যে ক'টা মস্তানকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো, তাদের সবাইকে ওদের নেতারা ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

পরিবেশের সাথে সাথে আকাশটাও আজ থমথমে। সকাল থেকেই কালো আর বাদামী রঙের মেঘ সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। দুপুরে ঝেঁপে বৃষ্টি হলো এক পশলা। বর্ষার বৃষ্টি। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। জল বেড়ে গেছে নদীতে। বেড়েছে স্রোত। নদীর বুকে ঘন জলের ঘূর্ণি পাক দিয়ে উঠছে। বাঁশবাগান পুরো চলে গেছে নদীর গ্রাসে। পাশের মাঠটার অর্ধেকের বেশিটাই চলে গেছে। এর পরেই অঞ্জলিদের, মানিকদের, গোপেশ্বর দাস —এদের বাড়িগুলো এসে যাবে। শুধু মাঝখানে মনসাতলা আর একটা দশ হাতের রাস্তা। নদীর সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে অঞ্জলিও ফুঁসছে। দুপুরবেলা ভাত খাবার সময় বৃষ্টি হচ্ছিলো। মধ্যদুপুর যখন বিকেলের দিকে চলতে শুরু করলো, তখন সেই ঢলঢলে যৌবন আর যন্ত্রণা নিয়ে অঞ্জলি আবার নদীর পারে চলে এলো। ঝপ-ঝপাং শব্দ করে মাটির চাঙড় ভেঙে পড়ছে। নদী রোজ ভাঙছে। রোজ! চর সুলতানপুরের প্রাণবায়ু রোজ একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। অঞ্জলি প্রত্যেকদিন গভীরভাবে লক্ষ্য রাখছে। সব কিছু মানিকদাদা আস্তে আস্তে মালতীর কাছে চলে যাচ্ছে। ও একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ওপর দাঁড়িয়ে। মানিক-বিলাস। বিলাস-মানিক। হ্যাঁ। এখনও মানিক ওকে টানে। সেদিনকার হাটে মানিক আর মালতীর কৃতিত্ব অঞ্জলির যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অসম্ভব এবং এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ ওকে আজ পারঘাটার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলো। আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ওই যে, ফের পাড় ভেঙে পড়লো—ঝপাং! কান খাড়া করে সেই শব্দ শুনলো মালতী। ঈশানকোণে কালো মেঘ আরো জমাট হচ্ছিলো। সৃষ্টিধরের মেয়ে চোখ তুলে আকাশের

দিকে চাইলো। বৃষ্টির ফোটাগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে। নদীর বুকে ফোটাগুলো যখন পড়ছে, মনে হচ্ছে, নদীর জল যেন ফুটছে। অস্ফুটে অঞ্জলি বললো, দুয্যোগ আইতাসে! গাঙ আরো ভাঙবো। কি অইবো তারপর? হে ভগমান!

ঈশানকোণের কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশ জুড়ে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এলো নদীপাড়, গাছ-গাছালি আর ঝোপঝাড়ের ওপর। অশ্বত্থ গাছের নিচে ছায়া আরো ঘন হয়ে আসে। মানিকদের নৌকো ঘাটে এসে ভিড়লো। নদীর ভয়ানক চেহারা। ঢেউ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নৌকো আর কিছুতেই পাড়ে ভেড়ানো যায় না। অনেক কেরামতির পর নৌকো বাঁধা হলো। মানিক নামলো নৌকো থেকে। মানিকের বাবা নৌকোর গলুই থেকে মাছের ঝুড়িটা দিলো, মানিক সেটা ডাঙায় নামিয়ে রাখলো।

জাল-দড়িদড়া সব একে একে ডাঙায় রেখে মানিকের বাবাও নৌকা থেকে নেমে এলো।

কড়-কড়াৎ—। সারা আকাশ ছিঁড়ে খুঁড়ে বিজলী চমকালো।

গতিক ভালো ঠ্যাকতাসে না রে মাইনকা! মানিকের বাবার গলা পাওয়া গেলো।

হ। কি হইবো কে জানে!

হ। তাই ত দেহি।

অঞ্জলি তখনো দাঁড়িয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচে। কালো মেঘ সারা আকাশ ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার পাশে ফণীমনসার ঝোপগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, একদল ঘরছাড়া মানুষ জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

তুই আইজ বাড়ি যা! আমি বাজার যাই! বলে মানিকের বাপ মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সেই বৃষ্টিতেই হাঁটা দিলো। জেলেদের জীবনে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি সবই সমান।

ভাগীরথীর ঢেউ ঘন কালো হয়ে আছড়ে পড়তেই থাকে। ফের বাজ পড়লো। আকাশ ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। বিজলীর চমক লাগে অঞ্জলির শরীরে। শরীর না আগুন! অঞ্জলির শরীরে কি বাতাস লাগলো! মানিক যখন দড়িদড়া—জাল, জালকাঠি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলো, তখনই অঞ্জলি অশ্বত্থ গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো।

অ্যাই!

কে!

আমি! অঞ্জলি!

কি করস এহানে?

কিসু না।

অঞ্জলি বড় বড় পা ফেলে মানিকের কাছাকাছি চলে এলো।

বিষ্টি পড়তাসে। তুই গাঙপাড়ে কী করস?

গাঙ দেহি। ঢেউ দেহি। পাড় ভাইঙ্গা যায়। হেই শব্দ হুনি।

সর্বনাশী গাঙ, দেখতে মজা লাগে, না!

লাগেই ত। দুয্যোগ আইতাসে। যেইদিন পরেশদাদা মরসে, হেইদিন থিকা সর্বনাশ লাগসে। গাঙ ত আরো ভাঙবো। গাঙ আমাগো খেদাইবো।

মানিক কেঁপে উঠলো অজানা আশঙ্কায়। কড়-কড়াৎ, কড়-কড়াৎ—অনবরত বিদ্যুৎ চমকে মাঠঘাট, পথ, নদী সাদা আলোয় ভরে যায়। মাঝনদীতে উথাল পাথাল ঢেউ নজরে আসে। বিশাল কালো কালো ঢেউ। কি ভয়ঙ্কর চেহারা! ভাগীরথী মাতাল হয়ে উঠেছে। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় অঞ্জলি। কড়-কড়-কড়—কড়াৎ —আকাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে আবার বাজ পড়লো। শব্দে দুলে উঠলো মাটি। বাঁকের মুখে নদী খেয়ে নেয় মাটি—ঝপাং। অঞ্জলি আচমকা মানিককে চেপে ধরলো দুর্যোগের এই ধাক্কা সামলাতে। বৃষ্টি নামলো আরো জোরে। ছুট-ছুট-ছুট—মনসাতলার বড় ঝাঁকড়া বকুলগাছটার নিচে এসে দু'জন দাঁড়ালো। আকাশ থেকে নেমে আসা বিদ্যুতের আলোয় দু'জনের শরীর আলোকিত হয়ে ওঠে বারবার। থৈ-থৈ জল দু'জনার শরীরে। তাঁতের শাড়িখানা অঞ্জলির শরীরের সঙ্গে একাকার। দূরে নদীপাড়ে মাটির চাঙড় ভাঙে। হে ভগমান! কী হইবো! নদী তো আমাগো বাড়ির কাছে চইল্যা যাইতাছে। ফিসফিসিয়ে উঠলো অঞ্জলি। অঞ্জলির চুল, কপাল, নাক, মুখ বেয়ে বৃষ্টিজলের ধারা নামতে থাকে। মানিকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো অঞ্জলি। কাঁপছে দু'জনেই। মানিক অঞ্জলিকে দেখলো। দেখে ভয় পেয়ে গেলো। বললো, বাড়ি চল্।

না। বিষ্টি কমুক!

কমবো না। বাড়ি চল্।

না। যামু না!

ক্যান যাবি না?

বিস্মিত মানিকের সামনে থর-থর কাঁপে অঞ্জলি। কি এক যন্ত্রণায়! তরাসে অঞ্জলি দু'হাতে মানিকের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে।

না! আমি যামু না! বলেই অঞ্জলি তীব্র আবেগে মানিককে জড়িয়ে ধরলো। মানিকের সামনে মেলে ধরলো ওর মুখ, ঠোঁট। মানিক আরো ভয় পেয়ে গেলো। অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো।

ছাড়! বাড়ি চল্! বলে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানিক সেই বৃষ্টিপিছল পথে প্রায় দৌড়োতে শুরু করেছে।

তুই বাড়ি যা অঞ্জু! বিষ্টি আরো জোরে নামবো! মানিক আর পিছন ফিরেও তাকালো

না।

সেই অঝোর ধারাবর্ষণের সঙ্গে অঞ্জলির চোখের জল একাকার হয়ে গেলো। কান্নার গমকে ফুলে উঠতে লাগলো ওর সেই শরীরটা। এক ভীষণ যন্ত্রণায় ভেঙে চুর চুর হয়ে যাচ্ছিলো অঞ্জলি। স্খলিত পা ফেলে পিছল পথে ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায় অঞ্জলি বাড়ির পথ ধরলো। জলভাসি পৃথিবীতে প্রত্যাখ্যাতা অঞ্জলি আশ্রয় চাইছিলো একটু। এক সময় ও ওদের বাড়ির দাওয়ায় উঠে এলো। হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ওর মা দরজার সামনে চিন্তিতমুখে দাড়িয়েছিলো। ও দাওয়ায় ওঠামাত্রই সৃষ্টিধর মাঝি ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে ফেটে পড়লো।

কই গেছিলি হারামজাদি! সোমত্ত মাইয়া হইছস, লজ্জা-শরমের মাথা খাইছস নাহি! বাবার গর্জনে অঞ্জলি চুরমার স্বপ্নের জগৎ থেকে আরো বাস্তবে পা রাখলো। যে বাবা ওর দিকে কোনদিন সস্নেহে তাকিয়েও দেখেনি, আজ সেই বাবা সোমত্ত মেয়েকে ধমকাচ্ছে। অভিমানে অঞ্জলির চোখ ফেটে জল এসে গেলো। কি ভীষণ কষ্ট অঞ্জলির! কে বুঝবে? মা? হয়তো মা-ই একটু বোঝে। মা এগিয়ে এসে মেয়েকে ধরে নিয়ে গেলো।

কিসু হইছে? কই গেছিলি? কান্দস ক্যান?

কিচ্ছু হয় নাই। মনসাতলায় গেসিলাম। বিষ্টি ধরে না দেইখ্যা ভিজতে ভিজতে বাড়িত্ আইয়া পড়লাম।

নে, কাপড় ছাড় দেহিনি এইবার! চিন্তায় মরি তর লোইগ্যা।

সেই রাতে কারুরই ঘুম হয় না। নদীর ঘুম নেই। সে গর্জন করতে করতে বারবার আছড়ে পড়ছে পাড়ে। অঞ্জলি জেগে থাকে চুরমার যন্ত্রণা নিয়ে। মানিকের ঘুম নেই। ভাবে, অঞ্জলিরে একা বিষ্টির মধ্যে ফ্যালাইয়া আইলাম! কামডা ঠিক হয় নাই। অয় কী চায়? অয় রোজ জ্বালায় ক্যান আমারে? অয় আমারে টানে? কিন্তু কাছে আইলে আমি য্যান কেমুন হইয়া যাই। কাইল অরে জিগামু, অঞ্জলি, তুই কিয়ের লেইগ্যা এমুন করস? কী চাস তুই? .....মুখুজ্যেপাড়ায় বিলাসের চোখে ঘুম নেই। অঞ্জলি, অঞ্জলি, অঞ্জলি! ও আমাকে পাগল করে দেবে! ...সৃষ্টিধর জাগে, রাইক্ষসী গাঙ এইবার আমার বাড়ি নিবোই। তর দয়ামায়া নাই রে মা? ....মানিকের বাপ জাগে, বর্ষায় মাছ আইবো ভালো। দুইডা পহা হইবো এইবার। কিন্তু যেইভাবে গাঙ ভাঙতাসে, আমাগো গেরাম কি আর থাকবো! ....বৃদ্ধ ভৈরব মাঝি বিড়বিড় করে তন্দ্রার ঘোরে বলে, আমার পরেইশ্যারে! আর যে পারি না! .....জাগে মালতী। গোপালদায় কইছিলো, গোপন কথা আছে। কই! আইলো না তো!

আর এদের সবার জন্য, অশিক্ষিত, মূর্খ, অসহায় জাউল্যাদের জন্য জেগে থাকে

একটি মানুষ। সে গোপাল রাজবংশী। মধ্যরাতে যখন বৃষ্টি ধরে এলো, মরণকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে ছোট সেই ডিঙিটা নিয়ে, নিকষ কালো উত্তাল নদীর বুকে যেন ভেসে উঠলো গোপাল। খানিক পরেই ভৈরব মাঝির ঘরে টোকা পড়লো, ঠক-ঠক-ঠক। তড়াক করে উঠে পড়লো মালতী।

কে? গোপালদা?

হ্যাঁ।

দরজা খুলে সেই তেজী মেয়েটা গোপাল রাজবংশীর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ভয় পাস নাই ত?

অ্যাক্কেবারে না।

সাবাশ! ভয় পাইলেই মরতে হইবো। আবার কায়দা না জানলে, সাহস থাকলেও মরতে হইবো। চল! ভৈরব জেঠারে কইয়া যা।

বাবা!

অ্যাঁ! কেডা?

আমি মালতী। গোপালদায় আইসে। আমি যাইতাসি।

আইচ্ছা।

এইভাবে চর সুলতানপুরের অনেক ঘরে সেই রাত্রিবেলায় টোকা পড়লো। নিবিড় বর্ষণের পর সমাহিত রাত্রিতে সবার চোখে প্রবল ঘুম নেমেছে এখন। ঘুমন্ত গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় জনা বিশেক মানুষ লাঠি হাতে পাহারা দিতে নামলো। সামনে সদা জাগরুক একটা মানুষ। সে হলো গোপাল রাজবংশী।

রাত এখন একটা। অম্বিকা কালনা থেকে এস টি কে কে রোড ধরে একটা ছাই রঙের অ্যাম্বাসাডর বাঁধাগাছির মোড়ে এসে বাঁ দিকে ঘুরলো। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিলো। বৃষ্টি থেমেছে। গাড়িটা দ্রুত ছুটে এসে রেলগেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। লেভেল ক্রসিং পার হলো না। গাড়ির তিনটে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মোট ছ'জন মানুষ। অন্ধকারে তাদের ছায়া ছায়া অবয়বগুলো দেখা যাচ্ছিলো। ওরা হেঁটে রেললাইন পার হয়ে সোজা নদীপারের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। নিশাচর শ্বাপদ জন্তুর মতো ওদের চলা। একটা শিসের আওয়াজ শোনা গেলো। এই ছ'জনের একজন মুখে আঙুল দিয়ে একই রকম ভাবে ফের শিস দিলো। তখনই বাঁদিকের রাস্তা থেকে পাকা রাস্তায় উঠে এলো আরো দুটো ছায়ামূর্তি। এই দু'জন আগে আগে চললো পথ দেখিয়ে নিয়ে। রাস্তার ওপর ঘন বাঁশঝাড় কাত হয়ে আছে। বৃষ্টিভেজা রাত্রির এই ঘন অন্ধকারে অনবরত শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক। পাশাপাশি ঝিঁঝি-র একটানা সুর। বাঁশঝাড়টা

পেরিয়ে আবার উন্মুক্ত আকাশ। অন্ধকার হলেও এখন দূর থেকে এদের দেখা যাবে। একজনের কথা শোনা গেলো।

ওই মেছুনি মাগীটার ঘর কোন দিকটায়?

গঙ্গার একেবারে পার ঘেঁষে।

অ্যাঁই! চেম্বারগুলো চেক করে নে।

ওদের প্রত্যেকের কোমর থেকে হাতে উঠে এলো রিভলবার, নয়তো পাইপগান। ওগুলো হাতে নিয়েই ওরা এগোতে লাগলো।

আগে ওকে ঘর থেকে তুলে নদীর ধারে নিয়ে যাবো। শালীকে আগে খাবলা করে নিয়ে পেটে দু'খানা বুলেট ভরে দেবো।

মাগী বেশ তড়পাচ্ছে ক'দিন ধরে।

যেই লোকদুটো আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের একজনের মনে হলো, দেড়শো-দুশো হাত দূরে একটা মানুষ বোধহয় সাঁ করে রাস্তার ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে গেলো নিমেষে।

কে যেন গেলো মনে হলো?

কোথায়?

সামনে।

কচু। কেউ যায়নি।

কি জানি! মনে হলো। বলে প্রথম লোকটা চোখ দু'টো একটু রগড়ে নিলো।

গুরু! ভয় পেলে নাকি?

আরে ছাড় ওস্তাদ!

চর সুলতানপুরে ঢোকার মুখে পাকা রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিলো মানিক। নিশাচর দলটা বাঁশঝাড় পেরিয়ে যখন উন্মুক্ত রাস্তায় পড়লো, ওদের অবয়বগুলো মানিক তখনই দেখতে পেয়েছিলো। তবু একটু অপেক্ষা করছিলো আরো নিশ্চিত হবার জন্য। ওদের কয়েকজনের হাতে কিছু একটা আছে, এটা বুঝে নিয়েই মানিক চট করে রাস্তার এপারে এসে গোপাল রাজবংশীর কাছে চলে এলো। এখানে দশ জনের মূল দলটা রয়েছে।

গোপালদা। কি করুম?

অগ হাতে অস্ত্র আছে দেহা গেলো?

হ।

শোন। আমার যদি ভুল না হয়, তাইলে অরা আগে যাইবো মালতীগ বাড়ি। তাড়া করলে অ্যাহনই তাড়া করন যায়। কিন্তু অ্যাকডারে ধরতে লাগবো। পরেইশ্যারে কেডা

খুন করসে, হেইডা জানতে অইবো। মালতী!

কন।

তুই মনসাতলায় থাক। ছিষ্টিদা, রমেশ, হরিপদরা মিলা আটজন থাউক এহানে।

চুপ, চুপ! অরা বোধায় আইয়া পড়সে!

এই রাস্তায় ঢুকল?

না। গাঙের দিহে গেলো।

আমি ঠিকই ধরসি। মালতীরে অরা টার্গেট করসে। আটজন এহানে থাউক। আমি মানিকরে নিয়া মালতীগ বাড়ির পিছনডায় যাইতাছি। আমরা যহন অগ তাড়া করুম, সবগুলানরে ছাইড়্যা দিবি। শ্যামের দিহের একখান বা দুইখানরে আটকাইবার পারবি তো?

হ, হ। পারুম।

ব্যস! তাইলেই হইবো। খুব সাবধান! কেউ য্যান না মরে। ইলেকশনের দুইদিন আগে গেরামে খুন হইলে পুলিস আর কাউরে ভোট দিতেই দিবো না।

গঙ্গার ধারে চারজন পাহারায় ছিলো। গোপাল রাজবংশী মানিককে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে চলে গেলো। গোপালের চেহারাটাই পাল্টে গেলো এখন। ক্ষিপ্রতা বেড়ে গেলো। অ্যাকশন শুরু হলো। যেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি মালতীদের দরজায় এসে টোকা দিলো, তক্ষুণি একটা আধলা ইট সেই ছায়ামূর্তির পায়েব পাতার ওপর এসে পড়লো। বাপরে—বলে বসে পড়ামাত্র আরেকটা ইট গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। দশ হাত দূরে দ্বিতীয় জন দাঁড়িয়ে ছিলো রিভলবার হাতে। পেছন থেকে লোকটার হাতের ওপর নেমে এলো প্রচণ্ড এক লাঠির ঘা। লোকটার হাত থেকে রিভলবারটা ছিটকে পড়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। আবার চুপচাপ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওরা দু'জন দ্রুত নদীর তীরে ওদের দলের কাছে চলে গেলো।

ওস্তাদ! সবাই জেগে আছে। জেনে গেছে! মনে হচ্ছে সব ওঁত পেতে বসে আছে। ইট ছুঁড়ছে। লাঠি মেরে চেম্বার ফেলে দিয়েছে!

বলিস কি!

কথাটা শেষও হয়নি। পুরো দলটার ওপর বড় বড় ঢিল পড়তে শুরু করলো। আটজনই অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ে এসে পাকা রাস্তায় উঠে ছুট—ছুট! তাড়া করতে করতে মানিক অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। গোপাল রাজবংশী ডাকলো, মাইন্‌কা! আর যাইস না। ভোটের আগে এই পর্যন্ত। বাকিডা ভোটের পরে।

ওরা ছিলো পেশাদার খুনির দল। টার্গেট যেহেতু আড়ালে, আগেয়াস্ত্র সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আন্দাজে উল্টোপাল্টা গুলি না ছুঁড়ে পিছুলে পালিয়ে যাবার কৌশল নিলো

ওরা। মালতীর দলবল দলের শেষে একজনকে সহজেই আটকে দিয়েছিলো। কিন্তু এরা ছিলো আনাড়ি। আনকোরা। একটু সুযোগ বুঝেই যুযুৎসুর প্যাঁচে মালতীদের তিনচারজনকে কাবু করে দিয়ে সে ব্যাটাও অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গেলো।

রাত তিনটে নাগাদ সেই ছাইরঙা অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা লেভেল ক্রসিং থেকে ফের উল্টোপথে ছুটলো। সাঙ্ঘাতিক একদল খুনি আগন্তুকের বিরুদ্ধে চর সুলতানপুরের আনাড়ি অশিক্ষিত জাউল্যারা সফল এবং নিঃশব্দ প্রতিরোধ রচনা করলো গোপাল রাজবংশীর নেতৃত্বে। অ্যাম্বাসাডরে বসে থাকা আগন্তুকরা বুঝতে পারছিলো, সবকিছু আর আগের মতো নেই।

বারোই জুন। উনিশশো সাতাত্তর সাল। আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট। ভোটের দিন এখানে কোন গন্ডগোল হলো না। বহুদিন বাদে বামপন্থী কর্মীরা রাস্তায় নেমে ভোটের কাজ করছে। যাঁরা গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, তাদের অনেকেই গ্রামে ফিরে এসেছে। চর সুলতানপুর, মেদগাছি, মালোপাড়া, মেথিডাঙ্গার মানুষ বহু বছর পরে নির্ভয়ে আবার ভোট দিলো। আজকের দিনটায় ছিলো উৎসবের মেজাজ। স্টেশন রোডে, বড় বাজারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দু'পক্ষেরই ঝাণ্ডা উড়ছিলো যত্রতত্র। দিন পাল্টাচ্ছিলো এভাবেই প্রত্যেকদিন। খোলা হাওয়া লাগছিলো সবারই গায়ে।

সারাদিন রোদ্দুর আর মেঘের সঙ্গে চোর-পুলিস খেলা চলার পর বিকেলে বাদল মেঘ ঘন হয়ে এলো। সারাদিন নানা দলের ফ্ল্যাগ নিয়ে রিকশা, সাইকেল, মোটর বাইক আর জিপের ছোটাছুটি চলছিলো। ভোটপর্ব শেষ হবার পর সেটাও কমে এলো। সন্ধে হবার অনেক আগেই সন্ধে নামলো সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যাবার জন্য।

অঞ্জলি আজ বারে বারে রাস্তায় গিয়ে ভোটের হট্টগোল দেখছিলো। এর ফাঁকেও অঞ্জলি মা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে রান্নার কাজে হাত লাগিয়েছে। মাটির ঘর লেপেছে। বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে দাওয়া ভালো করে ঝাঁট দিয়েছে। টিপকল থেকে কয়েকবার কলসী করে জল নিয়ে এসেছে। অঞ্জলিকে দেখে মনে হচ্ছিলো, ওর মন থেকে সব ঝড় কেটে গেছে। ও নিশ্চিন্ত। বিকেলবেলা ও লক্ষ্মীমণিকে বললো, মা, আমি একটু আইতাসি।

বিষ্টি নামবো। কই যাবি অ্যাহন?

ভোট দিয়া সব বাড়ি ফিরতাসে। একটু দেহি গিয়া। —বলেই অঞ্জলি ছুটলো পাকা রাস্তার দিকে। পাকা রাস্তায় উঠে ও শাড়িটা ঠিকঠাক করে নিলো। তারপর হাঁটতে লাগলো সোজা। মন্থর পা ফেলে আপাদমাথা নির্ভাবনায় হেঁটে যাচ্ছিলো অঞ্জলি। গ্রামের মানুষ তখন ভোট দিয়ে ফিরছিলো স্কুলবাড়ি থেকে।

কই যাস অঞ্জলি?

যাই একটু দোকান সদাই করতে। চোখ বুজে মিথ্যে কথা বলতে পারে অঞ্জলি। ভালোই পারে। এভাবে চলতে চলতে মুখুজ্যেপাড়ার মুখে অঞ্জলির হাঁটার গতি আরো মন্থর হয়ে এলো। বিলাস বোধহয় ধরেই নিয়েছিলো, অঞ্জলি আজ এখানে আসবেই। ও হঠাৎ রাস্তার ওপরে উঠে এলো।

কি অঞ্জলি, এলে শেষ পর্যন্ত!

কী কথা আসে কইতাসিলেন?

অনেক কথা! এক্ষুণি কি বলা যায়! তুমি দারুণ সুন্দর অঞ্জলি। তোমাকে আমি পছন্দ করি।

লজ্জার মাথা খেয়ে সঙ্কোচে মরে যেতে যেতেও অঞ্জলি বললো, কাইল বিকালে নদীর ঘাটে আইসেন। কথাটা বলতে বলতে বুকটা কেঁপে উঠলো অঞ্জলির। আবার ঝড় উঠলো মনের মধ্যে। আর দাঁড়ালো না ও। প্রায় দৌড়োতে শুরু করলো গ্রামের দিকে। বিলাসের মুখে তখন জয়ের হাসি।

বিকেলবেলা থেকে আকাশে যে মেঘ জড়ো হয়েছিলো, সন্ধের পর থেকেই মুষলধারে সে জল ঢালতে শুরু করলো। ভাগীরথী উন্মত্তের মতো ছুটছে। পাড় ভেঙে চলেছে চর সুলতানপুর গ্রামের সব জায়গাতেই। অঞ্জলি ঘরে বসে কান পেতে শুনছিলো মাটির বড় বড় চাঙড় ভেঙে পড়ার শব্দ। শব্দগুলো খুব কাছে চলে এসেছে। অঞ্জলিদের, মানিকদের বাড়ির খুব কাছে চলে এসেছে নদী। অঞ্জলি সেই সর্বনাশের ডাক শুনলো অনেক রাত পর্যন্ত। অঞ্জলিই একমাত্র মনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে পারছিলো, ভয়ঙ্কর সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসছে। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। এই বোধ ওকে নিশ্চিত ঘুমের জগতে নিয়ে গেলো। অঞ্জলি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো, নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে ও। শোলার মতো হালকা হয়ে গেছে ওর শরীরটা। ও খেলছে। ও ডুবছে না।

ঘোর বর্ষার রাত্রি পেরিয়ে আর একটা দিন যেমন আসে, তা তেমনি করেই এলো। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ভালো নয় নদীপাড়ের মানুষগুলোর মনের অবস্থা। আজ থেকে ভোটের গণনা শুরু হবে। তার জন্য দুশ্চিন্তা আছে। কি হয় কে জানে? আরেক সর্বনাশ শিয়রের কাছে এসে ধাক্কা মারছে। ক্ষুধার্ত নদী প্রত্যেকদিন বিঘে বিঘে ডাঙা জমি গিলে খেয়ে নিচ্ছে। ভৈরব মাঝি বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ভাগীরথীর তাণ্ডব। নদীর প্রত্যেকটা আঘাত টলিয়ে দিচ্ছিলো ডাঙাজমিকে। ভৈরব মাঝি বুঝতে পারছিলো, এই আশ্রয়টুকুও যাবে এবার। তারপর! তারপর কী হবে? বৃদ্ধ মাঝি মেয়েকে ডাকলো।

অ মালতী!

কও বাবা।

গাঙ ত বাড়ির উঠানে আইয়া পড়লো।

তাই ত দেহি।

মালতীও এসে দাঁড়ালো বাবার পাশে। বাবার পিঠে হাত রাখলো। নদীর অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তা হবারই কথা। তবু মালতী বাবাকে অভয় দেয়, অত ভাইব্যো না বাবা। কিসু অ্যাকটা ব্যবস্থা কইরা ফ্যালামু। চিন্তা কইরো না তুমি।

ভৈরব মাঝি দুঃখের হাসি হাসে। চিন্তা আর আমি করি না রে মালতী। বাড়িডা তো যাইবোই। তরে লয়য়্যা আমি এইবার যামু কই?

ভাইব্‌বো না বাবা। ঠিক অ্যাকটা ব্যবস্থা হয়য়্যা যাইবো। গেরামের অ্যাত মানুষ আসে। গোপালদায় আসে। বিপদ ত আমাগো একার না! হগ্‌গলের যা গতি অইবো আমাগোও তাই অইবো। চলো। ঘরে চলো। বলে মালতী ভৈরব মাঝির হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলো। ভৈরব মাঝি চোখ বুজে আবার অতীতে ফিরে গেলো। —অ্যাক্কেবারে হরিমতী। হরিমতী ঠিক এইরকম কইর‍্যা আমারে ভুলাইতো। মাঝির চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল নেমে গালটা ভিজিয়ে দিলো। মালতী শাড়ির আঁচল দিয়ে সস্নেহে সেই চোখের জল মুছিয়ে দিলো। বৃষ্টি নামালো আবার ঝমঝম করে।

বৃষ্টি যখন থামলো, তখন মেঘে মেঘে আধো অন্ধকার। অঞ্জলি মনসাতলায় যাবার নাম করে ঘর থেকে বেরলো। সৃষ্টিধর আজ দুপুরেই নৌকা পাড়ে ভিড়িয়ে দিয়েছে। ভালো মাছ উঠেছে আজকে। সরপুটি পেয়েছে প্রচুর। ইলিশ উঠেছে সৃষ্টিধরের জালে আট-আটখানা। দুপুরে ভাত খেয়ে জিরিয়ে নিয়েই সে মাঝের ঝাঁকা নিয়ে মাছবাজারে চলে গেছে। অঞ্জলিকে বেরোতে দেখে লক্ষ্মীমণি শুধু বললো, দুয্‌যোগে বাইর হইস না মা!

গাঙটা একবার দ্যাখন ত লাগবো! কিভাবে ভাঙতাসে! আমাগো বাড়ি ত যাইবো এইবার!

লক্ষ্মীমণি মনে মনে তাই ভাবছিলো। এইবারই শ্যাষ। আর থাকন লাগবো না এই বাড়িতে।

অঞ্জলি ছুটতে ছুটতে মনসাতলা পেরিয়ে সোজা চলে এলো পারঘাটায়। সেই অশ্বত্থ গাছের নিচে। ও অপেক্ষা করতে লাগলো বিলাসের জন্য। বৃষ্টির প্রকৃতি বুঝে সব মাঝিই নৌকা পারে বেঁধে দিচ্ছে। এত বর্ষায় রাতে কেউই নদীর বুকে থাকবে না। মালতী দেখলো, গোপেশ্বর মাঝি এলো। এলো বৃন্দাবন মালো। খানিকক্ষণ বাদে মানিক আর মানিকের বাপ নৌকা বেঁধে ওপরে উঠে এলো। অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় চুপচাপ

ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো অঞ্জলি। মানিককে দেখে আজকে অঞ্জলি কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। একেবারে শান্ত হয়ে রইলো।

সবাই চলে যাবার পর পারঘাটা নীরব হয়ে গেছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছিলো। অঞ্জলি সেই নিস্তব্ধতায় কান খাড়া করে ছিলো। বিলাসের অপেক্ষায়। অশ্বত্থপাতা থেকে টপটপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিলো ভেজা মাটিতে। সেই জলে ভিজে যাচ্ছিলো অঞ্জলি। নদীতে সার দিয়ে মাছ ধরা নৌকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে সেগুলো। নদীর বুকে ঘন কালো জলে বাতাসের ওঠাপড়া চলছিলো। সন্ধ্যা নামছিলো চরাচরে। অঞ্জলি রাস্তার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, বিলাস্ আসছে। বিলাসকে দেখামাত্রই অঞ্জলি ওর দিনভর ধরে রাখা শান্তভাব হারাতে শুরু করলো। ফের ঝড় উঠলো ওর মনে। সেই ঝড় ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হয়ে যেতে থাকলো। বৃষ্টির তেজ ধীরে ধীরে বাড়ছে এখন। অঞ্জলি অশ্বত্থ গাছের ছায়া থেকেই ডাকলো, অ্যাঁই!

চমকে গেলো বিলাস, কে?

আমি। বলে অঞ্জলি বেরিয়ে এলো গাছের ঘন ছায়া থেকে।

অঞ্জলি! এসেছো?

হুঁ।

ভিজে যাচ্ছো তো!

হুঁ। কি কথা আসে, কইতাসিলেন হেইদিন! কন।

বিলাসের এতদিনের আবেগ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো। অঞ্জলি, তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি রাজি থাকলে তোমাকে আমি বিয়ে করবো। বিশ্বাস করো অঞ্জলি, দিন রাত শুধু তোমার কথাই ভাবি।

সত্যি! তিন সত্যি করেন। অঞ্জলি কাঁদছিলো। কেউ যে ওকে আজও ভালোবাসার কথা বলেনি!

সত্যি, সত্যি, সত্যি! আমি সত্যিই তোমায় পছন্দ করি। তুমি ভিজে গেলে অঞ্জলি।

চলেন। একটা নৌকার ছইয়ের নিচে যাই। বিষ্টি লাগবো না। অঞ্জলি উৎফুল্ল।

বিলাস নদীর দিকে দৌড়োয়। পিছন পিছন অঞ্জলি। নিচে নেমে বিলাস লাফ দিয়ে একটা নৌকোয় উঠে পড়ে। অঞ্জলি উঁচু থেকে নিচে ঢালে-নাবালে নামতে থাকে। পিছল এঁটেল মাটি। খাড়া পাড় কেটে ঢালু করে ঘাট করা হয়েছে। পা টিপে টিপে নামে অঞ্জলি। দীঘল শরীর নিয়ে। জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে। খাঁ-খাঁ শূন্যতা নিয়ে। সর্বনাশ ভরা যৌবন নিয়ে। নদীর মতো সর্বনাশা। বৃষ্টিতে, কাদায়, পিছল পথে নামতে নামতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো, অঞ্জলি। কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো। শূন্যতা ছাড়া কিছু ছিলো না। টালমাটাল পায়ে আছড়ে পড়লো ও। গড়াতে গড়াতে ওর ভরা

শরীরটা নদীর জল ছুঁলো।

পড়লে, পড়ে গেলে! লাফ দিয়ে বিলাস পাড়ে নেমে অঞ্জলিকে হাত ধরে তুললো। মাটি-কাদায় মাখামাখি আলুথালু শরীরটা বিলাসের কাছে একটু আশ্রয় চাইছিলো। বৃষ্টির তেজ আরো বাড়ছে। অঞ্জলির ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিলো। বিলাস নদীর জল দিয়ে রক্ত ধুইয়ে দিলো। ফুলে ফুলে ফোঁপাচ্ছিলো অঞ্জলি। তারপরই ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে গেলো। সেই বৃষ্টিভেজা শরীরে দু'জনই উঠে এলো নৌকোয়, ওরা ঢুকে পড়লো ছইয়ের ভেতর।

নৌকা দুলছিলো ঢেউয়ে। বিদ্যুৎ চমকালো। সেই আলোয় অঞ্জলির ভিজে সপসপে শরীরটা বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো বিলাসের কাছে। তাই, যা হবার ছিলো না, তাই হতে থাকলো। সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেলো। পুরুষ মানুষটা গলতে শুরু করলো। আর অঞ্জলি তো নিজেকে সম্পূর্ণই ছেড়ে দিয়েছিলো। অনিবার্য আদিমতার দিকেই ছুটে চললো দু'জনে। দু'জনের শিরায় শিরায় তরল আগুনের স্রোত। সেই আগুনের, সেই স্রোতের রহস্য জানতে দু'জনেই ঝাঁপ দিলো অতলে। নৌকো দুলছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বারবার। আরো জোরে বৃষ্টি নামলো। ভরা ভাগীরথী উথাল-পাথাল হয়ে যাচ্ছিলো। বয়ে যাচ্ছিলো সময়।

ভরা গাঙ উথাল-পাথাল হয়। উত্তাল সময়টা এভাবেই বয়ে যায়। শরীর তার রহস্যের আবরণ খুলতে থাকে। আরো জল ঢালে আকাশ। দূরে শুধু একের পর এক পাড় ভাঙার শব্দ হতে থাকে। ভরা দুর্যোগ রাতের স্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিতে থাকে। চর সুলতানপুর গ্রামে শোরগোল শোনা যায়। গ্রামের বাড়িঘর গিলতে আরম্ভ করেছে নদী। হৈ-চৈ বাড়ে। গ্রামে কান্নার রোল শোনা যায়।

অঞ্জলি! অঞ্জু! কোথায় গেলি-ই-ই-ই-ই!

অবসাদের, সুখের দেয়াল ভেঙে গেলো দুই নগ্ন মানুষ-মানুষীর। ওরা কান খাড়া করে শোরগোলটা বোঝার চেষ্টা করলো। নৌকো দুলছে অনবরত।

অঞ্জলি রে-এ-এ-এ!

দূরে নারীকণ্ঠের ডাক শুনলো দু'জনেই।

মায় ডাকে আমারে! নদী ভাঙতাসে বুঝি!

হুঁ। তাই তো!

বাড়ি যাই।

বিলাস অঞ্জলির শরীরটাকে পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয়।

দূরে কে চিৎকার করে ডাকলো, অঞ্জলি! কই গেলি-ই-ই-ই-ই! তগ ঘর গাঙে

নিয়া গেলো!

অঞ্জলির বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ভগমান! একি সর্বনাশ করলা আমাগো! বলেই অঞ্জলি দৌড়ায়। খাড়া পাড়ের চড়াই ভেঙে উঠতে গিয়ে ও আবার আছাড় খেলো। কাদায় মাখামাখি হয়ে উঠলো অঞ্জলি। ঠোঁটের কষে রক্ত। উদ্‌ভ্রান্ত অঞ্জলি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ে উঠেই ছুটতে আরম্ভ করলো। পাগলের মতো। ছুট—ছুট। মনসাতলা পেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো ও। ওদের জমি নদী হয়ে গেছে। গাঙ ওদের বাড়িটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। ওর মা ঘর থেকে থালা বাসন, জামা-কাপড় বার করে আনছে। হাত লাগিয়েছে পাড়ার অনেকেই। মানিকও আছে। সৃষ্টিধর দাস এখনো বাজার থেকে ফেরেনি। মানিককে দেখে অঞ্জলির মনটা খাঁ-খাঁ করে উঠলো। আবার সেই যন্ত্রণা! হে ভগমান! কোথায় সুখ অঞ্জলির? অনুতাপের আগুন জ্বললো ওর বুকে। এইয়া আমি কী করলাম! পাপ! আমার পাপে সব নিলা ঠাকুর! ঘর বাড়ি সব! সমস্ত আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা অতিক্রম করে এক হা-হা করা শূন্যতা অঞ্জলির মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে বইতে লাগলো। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো ওর। এত বৃষ্টিতেও মাথাটা আগুন হয়ে গেলো। কেঁদে উঠলো অঞ্জলি। কিসের জন্য এই কান্না, সেই বোধের বাইরে চলে গেছে ও। মানিক এগিয়ে এলো।

কই গেছিলি?

চোখভরা টলটলে জল নিয়ে অঞ্জলি শুধু একবার অভিমানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানিকের দিকে চাইলো। কিন্তু কোন জবাব না দিয়েই অঞ্জলি ওদের ঝুলন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো দ্রুত। ধরাস ধরাস করে মাটির চাঙড় ভেঙে পড়ছে ভাগীরথীর বুকে। ওদের বাড়িটা নদীর দিকে কাত হয়ে গেলো। অঞ্জলি দেয়ালে মাথা ঠুকছে তখন।

হায় ভগমান! আমার পাপে ঘর ভাঙলো! হায় ভগমান!

তখনই চরচর করে জমি ফেটে অঞ্জলি, অঞ্জলিদের বাড়িশুদ্ধ নেমে গেলো নদীতে। অঞ্জলির মা লক্ষ্মীমণি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো—অঞ্জলি-ই-ই ই-ই! অঞ্জলিরে-এ-এ-এ-এ! ওরে আমার অঞ্জলি! গাঙ আমার অঞ্জলিরে নিয়া গেলো গো! ওগো, তোমরা কিছু কর!

ভাগীরথী হা-হা করে ছুটে এসে পাড়ে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। সেই সময় উঠোন থেকে ছুটে এসে ভয়ঙ্কর সেই নদীর বুকে ঝাঁপ দিলো একজন। সে মানিক। স্রোতের ধাক্কায় মাটি আলগা করে দিচ্ছে সর্বনাশী নদী। আবার অঞ্জলিদের ঘরটা শেষবারের মতো নদীর মধ্যে ওলটপালোট খেয়ে ডুবতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষ হায় হায় করে উঠলো। অঞ্জলির মা পাগলের মতো বুক চাপড়াতে লাগলো।

বিলাস এসে দাঁড়ালো উঠোনে। আতঙ্কে ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে। গত এক ঘণ্টার মধ্যে ও একের পর এক ঘটনার মুখে পড়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছিলো। ও নদীর আরো পাড়ে গিয়ে অঞ্জলিকে দেখার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু নদীর কাদামাখা ঘোলা জলে আর কিছুই দেখা গেলো না। অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার। গভীর কালো আকাশের নিচে আরো গভীর কালো লকলকে লোলজিভ নদীর বুকে ওদের দু'জনের কাউকেই দেখতে পাওয়া গেলো না। বিলাস কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দিলো না। কোন কথাও বললো না। ও ওর ভাবনার মধ্যে কিছুতেই সঙ্গতি আনতে পারছিলো না। ওর সমস্ত চিন্তাস্রোত অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিলো।

পরদিন সকালে শান্তিপুরের জেলে নৌকোর মাঝিরা রসুলপুরের চর থেকে মানিকের অচেতন দেহটা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অঞ্জলিকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না।

চারটে দিন পেরিয়ে গেলো। এবারের ভাঙনের ধাক্কা মেদগাছি বা মালোপাড়ার ওপর তেমন একটা পড়েনি। চর সুলতানপুরের চারআনা অংশই নদীগর্ভে চলে গেছে। ভাঙতে ভাঙতে চর সুলতানপুরের সেই কোনাটা শেষ হয়ে গেছে। নদী তার গতিপথের বাধা ভেঙে দিয়ে সোজা পথ করে নিয়েছে। ভাঙনও থেমে গেছে। মালতীদের বাড়ি, মানিকদের বাড়ি, অঞ্জলিদের বাড়ি আর কলাবাগানটা চলে গেলো। নদী এখন মনসাতলার পাশ দিয়ে বইছে। সহজভাবে। যাদের ঘর ভেঙেছে, তারা এখন প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে উঠেছে। মালতীরা স্কুল বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

গরিব মানুষের দুর্যোগে ভেঙে পড়ার সময় নেই। বর্ষায় ভালো মাছ ওঠে। নৌকা নিয়ে নদীতে যেতে হয়। মাছবাজারে যেতে হয় মাছ বেচতে। মানিক এখন সুস্থ। ও বাজারে যাচ্ছে। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে মানিক। মেয়ের শোক ভুলে সৃষ্টিধরও মাছ ধরতে বেরিয়েছে। বর্ষার জল জমিতে পড়ায় আমন ধানের রোঁয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। নাঙল পড়ছে জমিতে। ভোটের খবর ভালো। চারদিকে বামফ্রন্ট জিতছে। এখানেও জিতেছে প্রচুর ভোটে। এখানে সি পি আই এম প্রার্থী ছিলো। ভোটের ফলাফল আজই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি আসন পেয়েছে। পনেরো তারিখ থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো, এই রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতে চলেছে। সাতাত্তরে আঠারোই জুন পরিষ্কার হয়ে গেলো, দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন বামফ্রন্ট দখল করে নিয়েছে। এক অন্ধকার সময়ের শেষ হলো। যাঁরা গোপনে ভোটের কাজ করছিলো, আজ তারা প্রকাশ্যে স্টেশন বাজারে আবির খেললো। বাঁধভাঙা আনন্দ। শুধু স্টেশন চত্বরে আজ কোন মস্তানকেই দেখা গেলো না। অস্বাভাবিক ঘটনা বটে!

জেলেপাড়ার মানুষজন এই আনন্দে অংশ নিলেও একটা পাথরচাপা দুঃখে ওদের ভারী কষ্ট দিচ্ছিলো। মানিক আজ বিষাদে আক্রান্ত। যে মেয়েটা বেঁচে থেকে মানিককে তার পরম ভালোবাসার কণামাত্র বোঝাতে পারেনি, সেই মানিকের সমস্ত মন জুড়ে অঞ্জলি, অঞ্জলি আর অঞ্জলি। অঞ্জলির কথা উঠলেই মানিকের চোখের পাতাদু'টো ভারী হয়ে আসে। বিলাসের আর কী-ই বা করার আছে! এ কী হলো! এমন হবে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি! এক অপ্রকাশিত কাহিনী বিলাসকে কুরে কুরে খাবে এবার।

পূর্ণিমার সুডৌল চাঁদ ছিলো মাথার ওপর। তারও ওপর অনন্ত নীল আকাশ। চারদিকে গ্রামজীবন। আম, কাঁঠাল, জাম, শিরীষ, বকুলের ছায়া ছায়া মাখা জ্যোৎস্না। আষাঢ়ের মাঠে বৃষ্টিজল ধোওয়া পবিত্র মাটি। মাটি ভেজা সোঁদা গন্ধ পাগল করে দিতে চায় মানুষকে। এই রকম এক সন্ধ্যায় প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় অস্থায়ী আশ্রয়ে বসেছিলো ভৈরব মাঝি; যে মানুষটা কোন দিন দু'দণ্ড স্বস্তি পেলো না। মালতীও ছিলো সঙ্গে। মেয়েকে দেখছিলো ভৈরব মাঝি।

মালতী।

বাবা।

আর কি মা! আর ত কোন কথা আহে না! বুকডা পুইড়া যায়।

কাইল আমরা ইস্টিশন মাঠে যামু গিয়া।

আর গ্যালেই বা কি! না গ্যালেই বা কি! কী আর হইবো। কেউ আমারে সুখ দিতে পারবো না।

মালতী এসে ভৈরব মাঝির পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে—মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মাঝি এখন হামেশাই মালতীর সঙ্গে হরিমতীকে গুলিয়ে ফেলে।

মন খারাপ কইরো না মাঝি। সব ঠিক হইয়া যাইবো।

আধো অচেতনে শিশুর মতো হেসে ওঠে বৃদ্ধ। আর কি ঠিক হইবো! নিগূঢ় সব সত্যি জেনে ফেলেছে মাঝি। একমাত্র মরণ যেইদিন আমারে দুই হাতে ধরবো, হেইদিন আমার সব শান্তি।

অইসব কথা কইও না বাবা। আমি তোমার মাইয়া, পরেশদার বইন। আমি অ্যাহনো মরি নাই। আমি অ্যাহনো আসি।

হ মা, তুই ত আছসই। তর লগে লগে আসে তর মায়। চোখ বুজলেই আমি তারে দেহি।

সেই সময় গোপাল রাজবংশী ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। মালতী আশ্চর্য হয়ে গেলো। এই অসময়ে গোপাল রাজবংশী! গোপালদা?

হ। এই মাত্র কাটোয়া লোকালে কইলকাতা থিকা অইলাম। আমার নামে মিসার

মামলাডা খারিজ হয়্যা গেছে।

শুনে মালতীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আজ বিশে জুন। উনিশশো সাতাত্তর সাল। কলকাতা হাইকোর্টে মিসা সংক্রান্ত যে ক'টা মামলা উঠেছিলো, আজ সব ক'টাই খারিজ হয়ে গেছে।

গোপাল আজ প্রথম ভালো করে দেখলো মালতীকে। পূর্ণ চাঁদের আলো মালতীর পাথর কোঁদা মুখখানা ধুইয়ে দিচ্ছিলো। গোপাল রাজবংশী তাঁর কঠিন কর্তব্য শেষ করে আজ বুঝি একটু ফুরসত পেয়েছে। সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো মালতীর দিকে। নরম, মৃদু জ্যোৎস্নার সেই আলো মালতীর চোখ-মুখ-ঠোঁট কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। সেই আশ্চর্য আলো গান হয়ে গোপালের মনে রিন রিন করে বেজে উঠলো।

তাইলে, কাইল আবার ইস্টিশন মাঠে ঘর বানাইতে অইবো।

হ। এই গেরাম ত আমাগো খেদাইয়া দিলো।

হ। ভৈরব মাঝির দু'চোখে ঔদাসীন্য।

সেই পদ্মাপারের ভৈরব দাসের ভ্রমণ তবু এখনো শেষ হলো না। আরো একটু বাকি রয়ে গেছে। আর যারা তারপরেও থাকবে, তারাও এই ঝোড়ো বাতাসের বাইরে যেতে পারবে না। দুঃখ-সুখের দাঁড়ি পাল্লায়, এই জেলে মানুষগুলির জীবনে, সতত দুঃখের ভার আজও পর্যন্ত অনেক অনেক বেশি করেই থাকবে।

পদ্মা থিকা গঙ্গায় আইলাম,
আবার হাউশ কইর‍্যা নাও ভাসাইলাম।
নতুন কইর‍্যা ভালবাইস্যা,
বানাইলামও ঘর।
হায়, ভাসন আমার ভাইগো সিলো,
নদী আমায় ঘরডা নিলো।
আপন ভাবলাম যেই মাটিরে,
হেও হইলো পর।
জাউল্যাগ ত সুখ নাই রে,
দুঃখে দুঃখে কফাল পোড়ে।
ব্যালা শ্যাষে বোঝা বাড়ে,
চলন আমার থামলো না রে।
বুকের মইধ্যে জাইগ্যা রইলো
দুঃখে ভরা শুকনা বালির চর।

বারো

'ক্রুদ্ধ জলরাশি এসে বার বার আঘাত করছে
জাহাজের দু'পাশে! ঘন নীল
ক্রুদ্ধ ফেনিল জলরাশির আঘাতে আঘাতে!
সমুদ্রের পাপড়িতে লেগেছে কম্পন!
ওপর দিয়ে ছোট্ট উড়ন্ত মাছের দল
এঁকে যায় আশ্চর্য রূপোলি রেখা!
আমার নির্বাসন যাত্রা শেষ।
ফিরে চলেছি!'

—পাবলো নেরুদা

'পৌলমী, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, প্রতিদিন, প্রতি রাত। সেই যে মোহনার বালিতটে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, তারপর তো একটা দু'টো দিন নয়, অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে। সূর্য ওঠা আর সূর্য ডোবার পালা চলেছে তারপর অনেক। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করে আমি তোমার মধ্যে ডুব দিয়েছি, সে তো তুমি জানই।

হ্যাঁ, লিখছি পৌলমী। আমি লেখা শুরু করেছি। তোমাদের সবাইকে নিয়েই আমার যাত্রা শুরু হলো। তোমার কৃষ্ণসায়র চোখ থেকে আমি ছেনে তুলছি শব্দগুচ্ছ, বর্ণমালা। তোমার নীল পাহাড়ের দুই চুড়ো আমাকে উত্তেজিত করে। প্রেমের জন্ম দেয়। তোমার চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ আর তোমার লাল পেড়ে শাড়ির উড়ে যাওয়া আঁচল আমাকে শুধুই ছুটিয়ে নিয়ে চলে। আমি ছুটতেই থাকি। দ্যাখো, আমি এখনো ছুটছি।'

...পৌলমী, তুমি আমার প্রেম। তুমি আমার অনন্ত আকাঙ্খা। তোমার আঁখিতারায় যে আকাঙ্খার রামধনু আমি দেখেছিলাম, তা এখন আমার রক্তে বইছে। মোহনবাঁশি শুনতে পাচ্ছো পৌলমী?

হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

তা হলে তোমারই জিত হলো!

বুধ, তুমি তো বলেছিলে, এটা ঠিক নয়। কিন্তু আমার মন বলছিলো, এটাই ঠিক।

তুমি তো মনের দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরো। আমি ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলাম। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করছিলাম।

না, তা নয় বুধ। আমার সমস্ত শক্তি তোমাকে ঘিরেই। তুমি না থাকলে আমার কোনো শক্তি নেই।

'এ-কথার কি উত্তর দেবো আমি! এভাবেই সমস্তক্ষণ সে আমাকে টেনে রাখে। অধিকার করে নেয় অমার সবটাই।'...

বুধ!

কি? বলো?

তোমার চোখ দু'টো আজ কি দারুণ ঝকঝকে। কেন বলো তো? তুমি তাকাচ্ছো আমার দিকে, তোমার চোখে যেন আগুন ঝরছে! এত উত্তাপ, এত রঙ তুমি পেলে কোথায়?

বুঝলে পৌলমী?

বলো।

জন্ম-নাবিক আমি। সেই কবে থেকে ঘাটে-আঘাটায় এখানে সেখানে নোঙর ফেলছি। মানুষ খোঁজা চলছিলো আমার। অনেককে পেলাম। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম তোমাকে। অমনি আমার সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে পৌলমী, শুধু তুমি চলে এলে! সে ক্যানভাসে তুমি, আর তোমার লাবণ্য প্রতিমা। আর আমার বুকে তোমার নীল যমুনার জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ।

তোমার খোঁজা কি শেষ হলো বুধ?

জানি না। কিন্তু আমার সামনে এসে পড়েছো তোমরা অনেকেই। আমি যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে যে ঠিক কে, তা আমি জানি না। তবে আমি তোমাদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। তোমাদের নিয়েই আমাকে গান বাঁধতে হবে। গান গাইতে হবে।

তাই তোমার চোখে এত আগুন!

জান তো, আমি বড্ড অন্তর্মুখী। গান গাইতে গেলে সারা দুনিয়ার জড়তা আমাকে জড়িয়ে ধরে। পথ চলতে গেলে আগুন চাই। গান গাইতে গেলে আমার উত্তাপ চাই।

শুনছো পৌলমী?

হ্যাঁ! বলো।

সেখানে আমাকে উত্তাপ দিয়েছে কিশোর কবি মানিক বসু, উত্তাপ দিয়েছে পিনাকী, উত্তাপ পেলাম তোমার কাছে। বাচ্চা মেয়ে শিখা আমার বুকে আগুন জ্বালিয়েছে। ক'দিন আগে নিমতলা শ্মশানে দু'টি শিশুর ছিন্নভিন্ন শরীর আমাকে আরো রাগী করে তুলেছে। আমার বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকা এই আগুনকে সমানে উস্‌কে দিয়েছেন আমার স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক রেবতীস্যার, আর প্রিয় বন্ধু সজল, দীপু, গোরাচাঁদ, এ-রকম আরো অনেকে।

কি গো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো তুমি?

হ্যাঁ, তোমার কথাই তো আমি শুনতে ভালোবাসি।

নাজিম হিকমতের নাম শুনেছো?

হ্যাঁ, তুরস্কের কবি।

বাঃ। তুমি তো অনেক খবর রাখো!

রাখতাম। এখন আর রাখি না।

এখন থেকে আবার রাখবে। শোনো, যা বলছিলাম, নাজিম হিকমত তো শুধু একজন কবি নন! তিনি এ-বিশ্বের রূপকথা। এই কবিকে আঠারো বছর জেলে আটকে রেখে দিয়েছিলো সে দেশের সরকার।

কেন?

কারণ, তিনি না খেতে পাওয়া কারখানার শ্রমিক আর গরিব কৃষকদের জন্য কবিতা লিখতেন।

এই জন্য!

আসলে এই জন্যই। তবে একটা অন্য ছুতো অবশ্য দেখানো হয়েছিলো।

কি?

নাজিম নাকি নৌসেনাদের বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দিয়েছিলেন। তাঁকে কতটা লাঞ্ছনা দেওয়া হয়েছিলো শুনবে?

এই কবিকে?

হ্যাঁ। কবিকে একটা জাহাজের ডেকে শিকল-বাঁধা অবস্থায় দৌড় করানো হয়েছিলো ততক্ষণ, যতক্ষণ না তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

কি ভয়ানক!

ভয়ানকের আরো বাকি আছে।

কি?

এরপর নাজিমকে একটা বন্ধ শৌচাগারে আটকে রাখা হয়েছিলো, নোংরা মলে তাঁর কোমর পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিলো। ঘেন্নায়, দুর্গন্ধে গা পাক দিয়ে উঠছিলো তাঁর। সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে, ক্লান্ত শরীর নিয়ে তিনি যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবেন, এমনই ছিলো অবস্থা।—ঠিক তখনই তাঁর মনে হলো, অত্যাচারী শাসকরা নিশ্চয়ই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, কখন তিনি এই অসহ্য যন্ত্রণা আর অত্যাচারে ভেঙে পড়েন সেটা দেখতে। এ-কথা মনে হতেই তিনি যেন জ্বলে উঠলেন। তিনি নিজের শক্তিতে বিরাট হয়ে উঠলেন। উস্‌কে দিলেন নিজের গভীরের সেই নিভু নিভু প্রদীপটি। চিৎকার করে, গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলেন নাজিম হিকমত।—তাঁরই লেখা কৃষকের গান, শ্রমিকের গান, ফসলী জমি আর প্রাণচঞ্চল কারখানার গান। আর অবশ্যই প্রেমের

গান। পৌলমী, শুনছো তো আমার কথা?

শুনছি।

কবির ভেতর থেকে উঠে আসা এই তেজ তাঁকে সমস্ত অত্যাচার আর কদর্যতা থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিলো। কবি পাবলো নেরুদা এই কাহিনী শুনে অনেকদিন পরে নাজিম হিকমতকে বলেছিলেন, 'ভাই, আমরা বুঝেছি—গানই আমাদের গাইতে হবে—মানুষের গান'। বুঝলে পৌলমী, আমিও সেই মানুষের কথা লিখতে চাই। আমি মানুষেরই গান গাইবো, শুধু এ-কথাই ভাবি।

'...এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে আমি বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী, পথ চলতে থাকি। আমার সঙ্গে চলে রেবতীস্যার, মানিক, সজল, পৌলমী, আরো সবাই।

...আমি রেলগাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দু'ধারে অজস্র গ্রাম, খাল-বিল, নদী-বনাঞ্চল পেছন দিকে ছুটে চলেছে। ট্রেন চলেছে সামনে। সামনে, না কি পেছনে? তা আমি জানি না। ট্রেনের হুইসিলের শব্দ আসছে আমার কানে। আমি ফিরে চলেছি আমার গ্রামে। আমার সেই ছেলেবেলায়...

ট্রেন এসে দাঁড়ালো আমার চিরচেনা সেই প্লাটফর্মে। আমি নামলাম। সেই স্টেশন। যেখানে বকুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ছায়া দেয় রৌদ্রে, আগুন আগুন ফুল ফোটায় বসন্তে। ওই তো প্লাটফর্মের নিচে বটগাছটা। অবিকল একই আছে। বটগাছটার পাশ দিয়ে আমি চলেছি।'

সময় পিছিয়ে যায়...

...সেই বালক বোধিসত্ত্ব ভাগীরথীর তীর ধরে ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তার মোড় ঘুরলেই তেঁতুলতলা। তারপর বিরাট বাঁশবাগান। বাতাসের দোলায় দু'টো বাঁশগাছের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে চটাশ-পটাশ শব্দ উঠছিলো। এখানটায় একটু গা ছমছমে ছায়া। বাঁশবাগান পেরোলেই খোলা আকাশ আর আলোর বন্যা। পরপর তিনটে কদমের গাছ থেকে তীব্র মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছিলো বালক বোধিসত্ত্বর নাকে। ওর হাতে একটা লাঠি। বনপ্যাকাটি গাছগুলোর ওপর সে সপাং-সপাং করে লাঠি চালালো। কচি কচি ডালগুলো ভেঙে পড়লো মাটিতে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে ছুটলো গ্রামের পূর্ব প্রান্তে দীঘির দিকে। দীঘির চারপাশে তাল আর নারকেল গাছের সারি। বন মোরগের মতো কেশর দুলিয়ে হাঁটছিলো সেই বালক, তাঁর নিজের সাম্রাজ্যে।

নদীর বুকে জেলে নৌকো থেকে কোনো এক মাঝি হুঁশিয়ারি দিলো—

সামাল হো-ও-ও-ও-ও-ও-ও!

পুকুরের উঁচু পাড় থেকে ঢাল বেয়ে নিচে নামতেই ঘাসের সবুজ গালিচা বালক

সম্রাটকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। সেখানে দাঁড়িয়ে বালক বোধিসত্ত্ব দেখছিলো তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা। অদূরে বালিয়াড়ি। লাঠিটাকে ডানহাতে তরবারির মতো ধরে সন্তর্পণ পদচারণায় সে এগোচ্ছিলো বালিয়াড়ির দিকে। যেন অজানা কোন শত্রু লুকিয়ে আছে সেখানে। একগুচ্ছ চড়াই উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। চৌধুরীবাড়ির ভাঙা দালানের ঘুলঘুলি থেকে বকম্ বকম্ করে ডেকে উঠলো পায়রাগুলো। বালক সম্রাটের সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বোধহয় এখন লড়াইয়ে যাচ্ছেন। বালক বোধিসত্ত্ব উঠে পড়লো বালিয়াড়ির ঢিবির মাথায়। সেখান থেকে দেখতে পেলো এক অপূর্ব দৃশ্য—

সামনে আদিগন্ত ফসলী মাঠ। কোথাও সবুজ মেখলা ঢাকা। কোথাও ভূমিকর্ষণে ব্যস্ত মাথায় তালপাতার টোকা পরা চাষী। নিড়ানি নিয়ে জমিতে কাজ করছে কৃষক রমনী-পুরুষ।

বালিয়াড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সেই বালক নীল আকাশের দিকে মুখ তুলে গান গেয়ে উঠলো।

'...হ্যাঁ, আমি বোধিসত্ত্ব, আমি মহাকাব্য রচনা করে চলেছি। জীবনের মহাকাব্য, মানুষের গান। পৌলমী, রেবতীস্যার, পিনাকী, মানিক, সজল, শিখা, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? তোমরা কি আছো আমার সঙ্গে হ্যাঁ। আমি ফিরে এসেছি।